

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৪

প্রকাশক : ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক : অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

## ভয়ংকরের ভূমিকা

আমাকে ইসমাইল নামে ডাকতে পারেন। অনেক···অনেক বছর আগে—ঠিক কত বছর আগে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না—আমার তখন পকেটে পয়সা নেই, ডাঙায় থাকার আকর্ষণও নেই, ঠিক করলাম সমুদ্র যাত্রায় বেরোবো এবং ছুনিয়ার জলময় অঞ্চলটা ভাল করে দেখে আসব। স্বাস্থ্য মজবুত রাখার এইটাই আমার একমাত্র পদ্ধতি।

পিত্তির প্রকোপ বৃদ্ধি না পেলেই শরীর ঠিক থাকে আমার। মুখ বিস্বাদ হলে, মনের ভেতর নভেম্বরের স্যাঁৎসেঁতে ইলসেগুঁড়ি বৃষ্টির মত মেজাজ-খারাপ-করা ভারবোধ চেপে বসলেই পথ চলতে গিয়ে নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ি কফিন গুদোমের সামনে, গোরস্থানে হাজির হই যখন-তখন গোর দেওয়া দেখতে। শরীর ম্যাজমেজে ভাবটা তখন এমনভাবে কুপোকাত করে ফেলে আমাকে যে, ইচ্ছে হয় ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যাই এবং ঘুসি মেরে পথচারীদের টুপী থেঁতলে দিই।

মনের এই অবস্থা এলেই বুঝতে পারি আর দেরী নয়—সমুদ্র যাত্রার সময় হয়েছে। পিস্তল দিয়ে আত্মহননের বিকল্প হল সমুদ্র যাত্রা—আমার কাছে। প্লেটোর দর্শন পড়ে ক্যাটো খোলা তরবারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে—আমি চাই জাহাজে ঝাঁপাতে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। যাঁরা জানেন, আমার মত মানসিক অবস্থায় যাঁরা মাঝে মাঝে ভোগেন, সমুদ্র তাঁদের আকর্ষণ করে কেন—হাড়ে হাড়ে বোঝেন।

ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলো যে-ভাবে প্রবাল দিয়ে ঘেরা, ম্যানহাট্টান শহরটাও অবিকল সেই ভাবে জেটি দিয়ে ঘেরা। সমুদ্রের ফেনা নাচছে শহরের চারিদিকে—বাণিজ্য সম্ভার আসছে তরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে। ডাইনে-বাঁয়ে যে রাস্তাই ধরুন না কেন সমুদ্রে গিয়ে পড়বেন। শহরের একদম শেষে দক্ষিণ দিকে। বিশ একর জায়গা জুড়ে সেই বিরাট বাগিচা—এককালে বৃটিশ দুর্গ ছিল—বর্তমানে নাম হয়েছে ব্যাটারী। ঢেউ সেখানে মাথা কুটে মরছে। মৃদু মৃদু সমীরণে গা জুড়িয়ে যাচ্ছে এবং কাতারে কাতারে মানুষ শুধু ঢেউয়ের নাচ—দেখতে জড়ো হয়েছে।

শনি-রোববারের ছুটির দিনে গোটা শহরটাকে একচক্কর দিয়ে এলে আরো মজার জিনিস দেখতে পাবেন। দেখবেন হাজার হাজার নীরব প্রহরী শহর ঘিরে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের চোখে সমুদ্রের স্বপ্ন। কেউ হেলান দিয়ে কাঠের

গাদায়, কেউ বসে জেটির ডগায়। কেউ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে চীনের জাহাজের গলুইতে, কেউ উঠেছে আরো উঁচুতে সমুদ্রটাকে আরো ভাল করে দেখতে। এরা কিন্তু প্রত্যেকেই ডাঙার মানুষ। সারা সপ্তাহটা কাটিয়েছে অফিসের টেবিলে, দোকানের কাউণ্টারে, কল-কারখানায়। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপারটা দেখুন! হপ্তা শেষের ছুটি উপভোগ করতে কেউ সবুজ মাঠে যায় নি। কেন? শহরে কি মাঠ-বাগানের অভাব আছে? এখানে কেন? করছে কী?

দেখুন! দেখুন! আরো দেখুন! হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হচ্ছে জলের ধারে—ঝাঁপ দিতে পারলে যেন বাঁচে। ডাঙা ওদের আটকে রাখতে অক্ষম—কোনো আকর্ষণ দিয়েই ওদের বেঁধে রাখা যায় না মাটির ওপর, গাছের ছায়ায়, ঘাসের কার্পেটে। কিছুতেই না। জলের একদম কিনারায় এসে না বসলেই নয়। অলিগলি থেকে, সরু রাস্তা, বড় রাস্তা থেকে তাই ওরা পিল পিল করে আসছে…আসছে…আসছে…আসছে উত্তর-দক্ষিণ পুব-পশ্চিম থেকে! জড়ো হচ্ছে বেলাভূমিতে! কেন? জাহাজের কম্পাস-গুলোর কাঁটা না হয় চুম্বকের টানে একদিকে ঘুরে থাকে। এরাও কি সেই চুম্বকের টানেই এসেছে?

আরো আছে। ধরুন আপনি এমন একটা দেশে রয়েছেন যেখানে সরোবরের ছড়াছড়ি। যে রাস্তাই ধরুন না কেন, পনেরো আনা ক্ষেত্রেই দেখবেন জলের ধারে পৌঁছে গেছেন। পুরো ব্যাপারটা যেন জাদুকরের কারসাজি—ম্যাজিক। অত্যন্ত অন্যমনস্ক ব্যোমভোলা মানুষকেও যদি ধ্যানস্থ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং পা দুটোকে একটু সচল করে দেন—দেখবেন গুটি গুটি আপনাকে সে নিয়ে আসবে জলের ধারে—যদি সে অঞ্চলে জল কোথাও থাকে। এক্সপেরিমেণ্টটা আমেরিকান মরুভূমির মাঝে গিয়ে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় করতে পারেন—হাতে হাতে ফল পাবেন। অবশ্য মরু-অভিযাত্রীদের মধ্যে একজন দার্শনিক থাকা চাই। ধ্যান আর জলের মধ্যে বর-কনের সম্পর্ক—কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

চিত্রশিল্পী স্বপ্নিল চোখে নিসর্গ দৃশ্য আঁকতে বসলেও ঘটছে সেই একই ম্যাজিক। ছায়া সুশীতল, রোম্যান্টিক উপত্যকার ছবি আঁকছে অশেষ যত্ন নিয়ে—কিন্তু ছবির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছে কি দিয়ে? মহীরুহ আঁকছে, খোঁদলভরা গুঁড়ি আঁকছে, মুনিঋষির ছবিও আঁকছে; আঁকছে গরুবাছুর, কুঁড়ে আর চিমনীর ধোঁয়া। আঁকছে বহু দূরের গাঢ় নীল ঘন সবুজ অরণ্য, পর্বত এবং স্থাণুবৎ পাইন গাছের সারি। রাখাল বালক আছে সামনে। শুনছে পাইনের মর্মর দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু তার চোখ কোনদিকে?

কিসের দিকে না তাকালে সম্পূর্ণ হচ্ছে না ছবি? ঝর্ণা…ঝর্ণা…ম্যাজিক স্রোতস্বিনী!

যান না জুন মাসে তৃণভূমিতে। হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাবে টাইগার লিলিতে। কিন্তু তবুও মন ভরবে না আপনার। কেন? না জল নেই কোথাও! নায়গারা জলপ্রপাত যদি বালুকাপ্রপাত হত—হাজার হাজার মাইল পথ পেরিয়ে দেখতে যেতেন কি? টেনেসির সেই দরিদ্র কবির কাহিনী মনে পড়ে? হঠাৎ এক মুঠো রৌপ্য মুদ্রা পেয়ে সমুদ্র দেখতে ছুটে ছিলেন—অথচ তখন তাঁর একটা কোট কেনার একান্ত দরকার। দামাল স্বাস্থ্যবান সব ছেলেই সমুদ্র দেখবার জন্যে কেন এত ব্যাকুল হয়? কেন সমুদ্রে ভেসে পড়তে চায়? আপনার প্রথম সমুদ্র যাত্রার কথা মনে পড়ে? ডাঙা দেখা যাচ্ছে না—এই কথা শোনার পর প্রতিটি লোমকূপে রোমাঞ্চ জাগেনি? কেন পারস্যবাসীদের চোখে সমুদ্র এত পবিত্র? কেন গ্রীকরা সমুদ্রকে দেবতার আসনে বসিয়েছে? সবচেয়ে গভীর অর্থবহ হল নারসিসাস-য়ের চমকপ্রদ গল্প। ঝর্ণার প্রাণচঞ্চল চিত্রকল্পটি সে হাতের মুঠোয় ধরতে পারে নি এই দুঃখে নিজেই ডুবে মরেছিল ঝর্ণার জলে। নদী বলুন, সমুদ্র বলুন—সব কিছুর মধ্যেই রয়েছে চিরঅশান্ত সেই চিত্রকল্প—মনকে যা কিছুতেই ধীরস্থির রাখতে দেয় না। আত্মাকে যেমন মুঠোর মধ্যে ধরা যায় না—রহস্যময় এই প্রাণটাকে যেমন কিছুতেই কায়দায় আনা যায় না—এ চিত্রকল্পও তেমনি অনন্তকাল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সব ম্যাজিকের চাবিকাঠি এইখানেই।

চোখে ঝাপসা দেখলেই অথবা ফুসফুস নিয়ে বেশী বিব্রত হলেই আমি সমুদ্রে পাড়ি জমাই ঠিকই—কিন্তু জাহাজের টিকিট কেটে নয়—যাত্রী হিসেবেও নয়। কেন জানেন? যাত্রী হতে গেলে পকেটে পয়সা থাকা চাই। তাছাড়া, এরা সমুদ্র-পীড়ায় ভোগে। ঝগড়া করে, রাতে ঘুমোয় না। ফুর্তি করতে জানে না। না, মশাই না, যাত্রী হবার কোনো বাসনা আমার নেই। জাহাজ অফিসার হতেও চাই না। বড় অফিসার হয়ে সাগর পাড়ি দিতে যারা চায়, তারা যাক। আমি চাই না। অত সম্মান মাথায় নিয়ে সমুদ্র যাত্রায় আনন্দ নেই। রাঁধুনী হয়েও যেতে চাই না—যদিও ভাল রাঁধুনীর সম্মান অনেক। মুরগীর রোস্ট বানিয়ে তাতে মাখন মাখিয়ে, নুন মরিচ ছড়িয়ে খেতে দিলে কার না ভালো লাগে?

আমি সমুদ্রে যাই সাধারণ নাবিক হয়ে। মাস্তুল বেয়ে টঙে উঠি, গলুইয়ের কিনারায় দাঁড়াই, হুকুম মত দৌড়ঝাঁপ করি হাসি মুখে—তিড়িং-তিড়িং লাফিয়ে বেড়াই মে মাসের মাঠে গঙ্গাফড়িংয়ের মত। লজ্জা কিসের?

অপমান কিসের? বড় বংশের ছেলে হলে তাদের গায়ে লাগত। কিন্তু আমাকে যখন চোয়াড়ে ক্যাপ্টেন হুকুম করে ঝাঁটা নিয়ে ডেক ঝাঁট দিতে, আমি কখনো তা হীনকাজ মনে করি না। কেন করব? বাইবেলে কি বলেছে এ কাজ ছোট? দেবদূত গ্যাব্রিয়েল এর চাইতে ছোট কাজ করেনি? আর ঘাড়ধাক্কা, মারধর, গালাগালি? দুনিয়ার কোন মানুষটার বরাতে এ সব ঝোটেনি? ধরনটা অন্যরকম হতে পারে—কিন্তু নিগ্রহ সইতে হয় প্রত্যেককেই। সুতরাং বিশ্বব্যাপী এই নিগ্রহ নিয়ে আমি মন খারাপ করতে যাব কেন?

খালাসী হয়ে সাগরপাড়ি দিই আরও একটা কারণে। এ কাজে আমি মাইনে পাই—যাত্রী হতে গেলে উল্টে আমাকেই টাকা দিতে হত। আমি রোজগার করি—যাত্রীরা খরচ করে। দুটোর মধ্যে তফাৎ অনেক। যদিও টাকাই যত অনিষ্টের মূল—এবং অর্থবান্ ব্যক্তির স্বর্গে প্রবেশ নিষেধ—তাহলেও গতর খাটিয়ে টাকা রোজগারের যে আনন্দ তার সঙ্গে কিছুর তুলনা হয় না।

খালাসীর কাজ নিয়ে সমুদ্র বিহারের আমার সবচেয়ে বড় কারণটা হল সামনের গলুইয়ের টাটকা হাওয়া আর প্রতিটি মাংসপেশীর কঠোর ব্যায়াম। দুনিয়ার যেখানেই যান না কেন, পিথাগোরিয়ান ম্যাক্সিম মেনে চললে, সামনের গলুইয়ের হাওয়ার চাইতে পেছনের গলুইয়ের হাওয়া নিরেস হবেই। এতদিন সওদাগরী জাহাজে এই হাওয়া ফুসফুস ভরে নিয়েছি। এবার ঠিক করেছি তিমি শিকারীর জাহাজে পাড়ি দেব। যে অদৃশ্য পুলিশ অফিসারটি আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন, অবিচল দৃষ্টি আমার ওপর রেখেছেন, রহস্যজনক ভাবে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছেন এবং অবর্ণনীয় ভাবে আমার ওপর প্রভাব খাটিয়ে বসে আছেন—তিনিই বলতে পারেন হঠাৎ তিমি ধরা জাহাজে চড়ে সমুদ্রের নোনা হাওয়া খাওয়ার সখ মাথায় চাপল কেন। বিধাতা বোধহয় অনেক আগেই ঠিক করে রেখে ছিলেন আমাকে তিমি শিকারীর জাহাজে সমুদ্র পাঠাবেন এবং জগতের বড় বড় ঘটনাগুলোর সঙ্গে ইসমাইলের নামটাও ইতিহাসে উঠে যাবে। কাবুলে বৃটিশ সৈন্যের শোচনীয় পরাজয়, আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্যে ভোটের লড়াই আর ইসমাইলের তিমি-অভিযান একই গুরুত্ব নিয়ে দৈনিকের শিরোনামায় হয়ে ছাপা হবে।

বিধাতা ভদ্রলোক কেন যে আমার বেলায় এই বিধান দিলেন জানি না। কেউ বিখ্যাত হচ্ছে বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে। কেউ মিলনান্ত কাহিনীর অবতারণা করে, কেউ স্রেফ লোক হাসিয়ে ভাঁড়ামি করে। আমার ক্ষেত্রে তিনি ফতোয়া দিলেন তিমি শিকারে বেরোতে হবে!

তিমি শিকারে বেরোনোর সবচেয়ে বড় প্রেরণা পেয়েছি কিন্তু তিমির প্রকাণ্ড দেহটা কল্পনা করে। রহস্যময় দানবটা আমার কৌতূহল জাগ্রত করেছে। দূর সমুদ্রের দামাল তরঙ্গে তিমি ভাসছে দ্বীপ-দেহ নিয়ে—নামহীন আতংক আর অজানা বিপদ অদৃশ্য বলয়ের আকারে ঘিরে রয়েছে তাকে—এই কল্পনা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে তিমি অভিযানে বেরোতে। প্রাগৈতিহাসিক দানবের সহস্র বিস্ময়, চীৎকার এবং কলেবরের কল্পনা নাচন জাগিয়েছে আমার অণুপরমাণুতে। অন্য মানুষ এ সব কল্পনায় নাচবে না—কিন্তু আমি চিরকালই সৃষ্টিছাড়া। যা কিছু দুরন্ত, দূর দিগন্তের বাইরে, ভয়ানক, রহস্যময়, বিপদসংকুল—চিরকাল আমার মন টেনেছে সেই সবের দিকে। আমি ভালবাসি নিষিদ্ধ সমুদ্রে পাড়ি দিতে, ভালবাসি বর্বর উপকূলে পা দিতে, ভয়ংকরের সঙ্গে মিতালি পাতাতে।

এই সব কারণেই তিমি অভিযান আমাকে টেনেছিল চুম্বকের মত। বিস্ময়ভরা অজ্ঞাত জগতের সিংদরজা দুহাট হয়ে খুলে গিয়েছিল দু চোখের সামনে। যে বন্য ধ্যানধারণা নিয়ে ছুটে বেরিয়েছি অথই জলে—তা প্রকট হয়ে উঠেছিল চোখের সামনে। অন্তরের গহনতম কন্দরে সংগোপনে লালিত সেই ভয়ংকর কল্পনায় পাশাপাশি ভেসে গিয়েছিল অগুন্তি তিমির সীমাহীন শোভাযাত্রা—সবার মাঝে আকাশ ছোঁয়া তুষার পাহাড়ের মত একটা ভৌতিক ছায়া—মবি-ডিক।

## কার্পেট ব্যাগ

খান দুই সার্ট আমার পুরোনো কার্পেট ব্যাগে ঠেসে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কেপহর্ন আর প্রশান্ত মহাসাগর অভিমুখে। পেছনে পড়ে রইল মানহাট্টো—শহরের মত শহর—যথা সময়ে পৌছোলাম নিউ বেডফোর্ডে। তখন রাত হয়েছে। দিনটা শনিবার—ডিসেম্বর মাস। নানটাকেটগামী জাহাজ ছেড়ে গিয়েছে শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সামনের সোমবারের আগে ওদিকে আর কোনো জাহাজ যাবে না।

তিমি শিকারের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যে-সব নওজোয়ানরা নিউবেডফোর্ডে দিন কয়েক থেকে যায় সমুদ্রে বেরোনোর আগে—আমি তাদের দলে নই। আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি সাগর পাড়ি দেব বলে—মাঝ পথে থামতে নয়। মন চাইছে নানটাকেট থেকে জাহাজে চেপে তিমির পেছনে ধাওয়া করতে—কারণ নানটাকেট আমার মনের মত শহর। অবশ্য তিমির কারবারে

নিউ বেডফোর্ড ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, নানটাকেট অনেক পেছিয়ে পড়েছে। তাহলেও ভুললে চলবে না নানটাকেটই আদি শহর তিমি শিকারের ব্যাপারে। প্রথম আমেরিকান মরা তিমি ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকেছিল এই শহরেই। প্রাগৈতিহাসিক দানোর পেছনে ক্যানো নিয়ে তাড়া করার দুঃসাহস সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল এই শহরেই—অসভ্য বর্বর সেই তিমি-শিকারীরা অন্য কোনো শহরে গিয়েছিল কি? এই শহর থেকেই জাহাজ বোঝাই নুড়ি পাথর নিয়ে একটা ক্ষুদে জাহাজ রওনা হয়েছিল বার-দরিয়ায় তিমির অন্বেষণে। পাথর নিয়েছিল কেন? না, তিমির কাছাকাছি গিয়ে পাথর ছুঁড়ে দেখবে গায়ে লাগছে কিনা—তারপর ছুঁড়বে হারপুন।

সামনে একটা রাত। একটা পুরো দিন, তারপরেও একটা রাত। তারপর পাবো নানটাকেটগামী জাহাজ। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় নিউ বেডফোর্ডে থাকতে গেলে চাই বেশ কিছু টাকাকড়ি। হোটেলে শুতে হবে, ক্ষিদে পেলে খেতে হবে। এদিকে কনকনে শীতে হাড় পর্যন্ত জমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পকেট হাতড়ে খান কয়েক রৌপ্যমুদ্রা ছাড়া হাতে কিছু ঠেকল না। উত্তরের অন্ধকারের সঙ্গে দক্ষিণের অন্ধকারের তুলনা করে মনে মনে বললাম, ওহে ইসমাইল, পকেট তো গড়ের মাঠ। যে হোটেলেই ঢোকোনা কেন, দরদাম আগে যাচাই করে নিও।

গোটা দুই সরাইখানা পেরিয়ে এলাম। 'ক্রশড হার্পুন' হোটেলটি এত উঁচু দরের যে ঢুকতে সাহস পেলাম না। 'সোর্ড ফিস সরাইখানার' লাল জানলা দিয়ে তির্যক রেখায় আলো পড়ছিল রাস্তার দশ ইঞ্চি পুরু জমাট বরফের ওপর—যেন বরফ পর্যন্ত গলে যাবে সেই আলোয়, ভেতরে কাঁটা-ছুরি চামচ-গেলাসের টুং-টাং শব্দ শুনেই বুক শুকিয়ে গেল। পকেটের ঐ রেস্ত নিয়ে এত দামী হোটেলে ঢোকা যায় না। ইসমাইল, সরে পড়ো এখান থেকে! তালিমারা বুটজোড়া নড়তে চাইছে না কেন দোর গোড়া থেকে? এবার চললাম জলের দিকে—সস্তা সরাইখানার খোঁজে।

খাঁ-খাঁ রাস্তার চেহারা দেখে মনটা দমে গেল খুবই। অন্ধকারের স্তূপের মত বাড়ীগুলো দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে। মাঝে মাঝে নড়ছে এক আধটা মোমের আলো—যেন গোরস্থানে মোমবাতি জ্বলছে কবরের ওপর। হপ্তা শেষের দিনে—বিশেষ করে এত রাতে—শহরের এ অঞ্চলে লোকজন তেমন থাকে না। কিন্তু আমার কপাল ভাল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা নিচু চওড়া বাড়ী থেকে বিচ্ছুরিত এক ঝলক ধোঁয়া-মলিন আলো। দরজা দুহাট করে খোলা—যেন আহ্বান জানাচ্ছে সাদরে। আমি হুড়মুড় করে ঢুকেই

হোঁচট খেলাম ছাইয়ের বাক্সের ওপর এবং নাকেমুখে ছাই ঢুকে দম আটকে আসার উপক্রম হল। একটু সামলে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে খুললাম ভেতরের দরজা।

ঢুকেই দেখলাম শ'খানেক কালো মুখ। বেদীর ওপরে বই খুলে দাঁড়িয়ে আরো একজন কালো মানুষ। নিগ্রো চার্চ। পুরুৎ ঠাকুর সেই মুহূর্তে অন্ধকারের অন্ধকারত্ব নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। আমি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলাম বাইরে।

কিছুক্ষণ হাঁটবার পর বন্দরের কাছাকাছি এসে একটা মলিন লণ্ঠন ঝুলতে দেখলাম একটা দরজায় সামনে। লণ্ঠনটা হাওয়ায় দুলছে এবং ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। দরজার সাদা রঙের ওপর লেখা—স্পাউটার সরাইখানা, পিটার কফিন।

স্পাউটার আর কফিন—এই দুটি শব্দ দেখেই আঁৎকে ওঠা স্বাভাবিক। আমি কিন্তু জানি নানটাকেট শহরে দুটি শব্দই খুব চালু। কে জানে, সরাই-খানার মালিক সেখান থেকেই এসেছে কিনা। বাড়ীর যা চেহারা দেখছি, নিশ্চয় অতি সস্তায় থাকা-খাওয়া যাবে।

সাবেকী বাড়ীটাকে দেখতে কিন্তু বিদঘুটে। একদিক ঝুঁকে পড়েছে জমির ওপর। সগর্জনে দামাল বাতাস 'ইউরোক্লিডন' আছড়ে পড়ছে দরজা জানলার ওপর। এই বুঝি ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। দেখে, ইউরোক্লিডন সম্পর্কে পুরাণে লেখা অনেক কথাই মনে পড়ল। তারপর পা দিলাম সরাইখানায়।

## স্পাউটার-সরাইখানা

সরাইখানার একটা দিক তেকোণা আকারে এমনভাবে ঝুঁকেছিল মাটির ওপর যেন একটা মান্ধাতা আমলের ভাঙা জাহাজের গলুই। ভেতরে ঢুকে চোখে পড়ল একটা মস্ত অয়েল-পেন্টিং। ধোঁয়ায় ময়লা। ছবির বিষয়বস্তু বোঝা ভার। তাল তাল অন্ধকার আর ছায়া ছাড়া কিছু দেখা যায় না। শিল্পী যেন নিজেই বুঝে উঠতে পারেনি কি আঁকতে চায়। অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে দেখার পরেও মনের ধোঁকা কাটবে না।

সবচেয়ে গোলমেলে হল ছবির ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড কালো অন্ধকারের পিণ্ড। নামহীন ফেনপুঞ্জে তিন তিনটে অস্পষ্ট নীলচে খাড়াই রেখার ঠিক ওপরে দুলছে প্রকাণ্ড প্রেতচ্ছায়াটা। দেখে ধাত ছেড়ে যেতে

পারে দুর্বলমনা মানুষের। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে পারে বিষয়বস্তুর নামহীন ভয়াবহতায়। কিন্তু যদি ভয় না পেয়ে একটু খুঁটিয়ে দেখা যায়, মনে হবে, মাঝ রাতে ঝড় উঠেছে কালো সমুদ্রে—অথবা শীতকালের দামাল হাওয়া এলোমেলো ছুটছে বরফ-স্রোতকে বুকে নিয়ে—অথবা স্বয়ং মহাকাল তাথই-তাথই নৃত্য জুড়েছে অন্ধকারের পুঞ্জে। এ-সবই অবশ্য কপোল কল্পনা। এসব যদি বাদ দিতে পারেন মন থেকে—ছবির মাঝখানকার ঐ অন্ধকারের পিণ্ডটার স্বরূপ ধরতে দেরী হবে না। তাহলেই বাকী অংশ সরল হয়ে আসবে। সবুর···সবুর! দানবিক মাছের মত চেহারা না অন্ধকারের পিণ্ড? প্রাগৈতিহাসিক তিমি নিজে নয় তো?

অনেক বয়স্ক লোককে জিজ্ঞেস করে এবং আমি নিজে অনেক ভেবে ছবিটার যে মানে দাঁড় করিয়েছি, তা এই: ঝড় উঠেছে সমুদ্রে। তিন মাস্তুলওলা একটা জাহাজ ডুবু-ডুবু হয়ে ছুটছে ঢেউয়ের নাগর দোলায় নাচতে নাচতে। এমন সময়ে একটা প্রকাণ্ড তিমি লাফ দিয়ে গোটা জাহাজটাকে পেরোতে যাচ্ছে—কিন্তু তিন-তিনটে মাস্তুল ত্রিশূলের শূলের মত গেঁথে ফেলছে তাকে শূন্য পথে।

উল্টো দিকের দেওয়ালে সারি সারি ঝুলছে অসভ্য বর্বরদের অস্ত্রশস্ত্র। বিশাল গদা; মানুষের চুলের ঝুঁটি লাগানো বর্শা; কারও ফলায় সাদা হাড়ের করাত; একটা প্রকাণ্ড কাস্তে। রক্ত হিম হয়ে যায় অস্ত্রগুলো দেখলে। নরখাদক বর্বর ছাড়া এ হাতিয়ার কেউ ব্যবহার করে? পাশা-পাশি রয়েছে মর্চে ধরা ভাঙা হার্পুন। কতকগুলো হার্পুনের ইতিহাস মনে দাগ কাটার মত। ঐ যে লম্বা বর্শাটা—পঞ্চাশ বছর আগে ঐ বর্শা দিয়ে নাথান সোয়েন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে পনেরোটা তিমি মেরেছিলেন। শেষকালে অবশ্য জাভাসমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিল হার্পুনটা—নিয়ে পালিয়েছিল একটা তিমি। নরদেহের কোথাও যদি ছুঁচ ঢুকে বসে থাকে—বছরের পর বছর দেহের মধ্যে দিয়ে ছুঁচটা সরে সরে যায়। এই হার্পুনটাও গেঁথেছিল তিমির ল্যাজে। কিন্তু তিমি দেহের মধ্যে দিয়ে সঞ্চরমান হার্পুন শেষ পর্যন্ত পৌঁছোয় চল্লিশফুট দূরে ঘাড়ের কাছে। বহুবছর পরে ব্লাঙ্কো অন্তরীপে তিমিটাকে বধ করার পর হার্পুনটাকে ঘাড়ের কাছে পেয়ে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলেন অনেক তিমি শিকারী।

ধূলি ধূসর প্রবেশ পথ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে মনে হল যেন একটা জাহাজ-চালকের কেবিনে এসে পড়লাম। এককালে এখানে ছিল মস্ত চিমনী আর আগুনের চুল্লী। এখন মদের আড্ডা। পুরো বাড়ীটার ঝুঁটি ধরে নাড়া

দিচ্ছে উন্মাদ বাতাস। ঠিক যেন সমুদ্রে জাহাজ দুলছে। মাথার ওপর কড়িবরগাগুলোও জাহাজী কেবিনের কড়িবরগার মতন। একদিকে তাকের মত লম্বা টানা টেবিলে সাজানো কাঁচের আলমারী। আলমারীর মধ্যে শোভা পাচ্ছে পৃথিবীর নানান জায়গা থেকে জোগাড় করা হরেকরকম বস্তু। ঘরের আরেক কোণে দেওয়াল থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে মদ বিতরণের কাউন্টার। আসলে সেটা একটা মরা তিমির চোয়াল। আকারে এত বড় যে একটা আস্ত ঘোড়ার গাড়ী তার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। বিশাল চোয়ালের মধ্যে টেবিলে সাজানো মদের সরঞ্জাম। একজন বুড়ো পয়সার বিনিময়ে প্রলাপ আর মৃত্যু বিতরণ করছে খালাসীদের।

মদের গেলাসগুলো চোঙার মত লম্বাটে। তলাটা সরু। নীলচে কাঁচের গেলাস। লোক ঠকানোর ফন্দী। মদ নামক গরল একটুখানি ঢাললেই অর্ধেক ভর্তি হল গেলাস—তার দাম এক পেনি। আরও এক পেনি দিলে পুরো ভর্তি করা হবে চোঙা গেলাস!

বেশ কয়েকজন জোয়ান লোক টেবিল ঘিরে বসে গুলতানি করছিল ডুবুরীর সরঞ্জাম নিয়ে। আমি সরাইখানার মালিকের কাছে ঘর চাইলাম। সে মাথা নেড়ে বললে—"অসম্ভব। একটা ঘরও খালি নেই। তবে যদি হার্পুনারের সঙ্গে কম্বল ভাগাভাগি করে এক বিছানায় শুতে চাও, ব্যবস্থা করতে পারি। তুমিও তো দেখছি হার্পুন চালাতেই যাচ্ছো। এক সঙ্গে শুলে আখেরে কাজ দেবে।" বললাম—"কারো সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া ধাতে সয় না আমার। তবে যদি আর কোথাও না জায়গা থাকে, তার সঙ্গেই শোবো। এই ঠাণ্ডায় যাবো কোথায়?"

"খুব ভালো কথা। বসে পড়ো। খাবে তো? খাবার তৈরী।"

বসলাম কাঠের বেঞ্চিতে। খানিক তফাতে আর একজন বসে হেঁট হয়ে ছুরী দিয়ে দুই উরুর ফাঁকে বেঞ্চির গায়ে কি যেন লিখছে। খাবার ঘরে ডাক পড়ল কিছুক্ষণ পরে। চার-পাঁচজন গেলাম সে ঘরে। দারুণ ঠাণ্ডা সেখানে। আগুনের চুল্লী নেই। মালিক বলল, আগুন জ্বালানোর পয়সা তার নেই। জ্বলছে শুধু দুটো চর্বির মোমবাতি—ঘরের দুদিকে।

আলু-মাংসর ঘ্যাট দেখেই ককিয়ে উঠল একটা ছোকরা। গায়ে তার সবুজ কোট। ফিসফিস করে শুধোলাম মালিককে—"ঐ ছেলেটাই কি সেই হার্পুনার?"

"আরে না, সে কালো চামড়ার মানুষ। মাংস ছাড়া কিচ্ছু খায় না।"

"কোথায় সে ?"

"আসবে এখুনি।"

কালো চামড়ার মানুষ—এই বথা শুনেই সন্দেহ হল আমার।

খাওয়া শেষ হল। ফিরে এলাম মদের আড্ডায়। আচমকা ভীষণ হট্টগোল শোনা গেল বাইরে।

খাড়া হয়ে বসল মালিক—"গ্রাম্পাস খালাসীরা এসে গেল!"

সামুদ্রিক বুটের দুপদাপ শব্দ শোনা গেল বাইরে। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল এক দঙ্গল খালাসী। গায়ে তাদের নোংরা কোট। হাতা ছেঁড়া। কলারে বরফ চকচক করছে। ঠিক যেন শীতের দেশের ভালুক।

নৌকো থেকে ডাঙায় পা দিয়েই সামনেই এই সরাইখানা দেখে ঢুকে পড়েছে দল বেঁধে। সটান পা বাড়ালো তিমির হাঁ অভিমুখে—মদের বোতলের দিকে। একজন গুঁড়িয়ে উঠল মাথার যন্ত্রণা নিয়ে—মাথায় ঠাণ্ডা বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে দেওয়া হল কালো পীচের মত জিন আর ঝোলা-গুড়ের মিশেল—ঠাণ্ডার দাওয়াই। সর্দি পুরোনো হোক, কি নতুন হোক—একঢোক খেলেই পালাবার পথ পাবে না।

মদ শুধু শরীর গরম করে না—মাথাও গরম করে। খালাসীদের মাথাতেও মদ পৌঁছে গেল অচিরে। শুরু হল তুবড়ির মতন বকুনি।

বকবক করল না শুধু একজন। দেখলাম, দলছাড়া হয়ে বসে আছে সে। বিরাট লম্বা চেহারা—পাক্কা ছ ফুট। চওড়া কাঁধ—তেমনি বুকের পাটা। মুখের রঙ ঘন তামাটে—রোদে পোড়া। দুচোখে এমন একটা স্মৃতির রোমন্থন যা সুখাবহ নয়। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল ভার্জিনিয়ার অ্যালিগানিয়ান পর্বতারোহীদের অন্যতম। মুখভাব অতিশয় শান্ত। সমুদ্রের দেবতার মতলব ছিল এ-হেন মানুষকেই আমার সঙ্গে এই সমুদ্রযাত্রায় ভিড়িয়ে দেওয়ার। তাই সঙ্গীসাথীরা যখন হট্টগোলে মুখর, সে সুট করে বেরিয়ে গেল বাইরে। সঙ্গীরা হঠাৎ দেখলে, সে নেই। "বার্লিংটন···বার্লিংটন··· বার্লিংটন গেল কোথায় ?" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সবাই বেরিয়ে গেল বাইরে।

বার্লিংটনকে এরপর দেখেছিলাম জাহাজে—তিমি অভিযানের সঙ্গী হিসেবে।

ঘর নিস্তব্ধ। আমি মনে মনে একটা ফন্দী আঁটলাম কৃষ্ণকায় হার্পুন-ধারীর সঙ্গে এক বিছানায় শোওয়া নিয়ে।

কোনো পুরুষই আর এক পুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে চায় না—নিজের ভাইয়ের সঙ্গেও নয়। শোওয়ার সময়ে সবাই চায় নিজেকে নিজের

কাছে পেতে। কাজেই অজানা দেশে অজানা সরাইখানায় অজানা হার্পুন-ধারীর সঙ্গে বিছানা ভাগাভাগি করা কি সম্ভব? সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েও আমরা এক বিছানায় শুই না। এক ঘরে শুই বটে—কিন্তু আলাদা হ্যামকে। কম্বলও নিজের।

কৃষ্ণকায় হার্পুনধারীর জামাকাপড় আদৌ পরিচ্ছন্ন কিনা জানি না। নিশ্চয় নয়। ভাবতেই গা শিরশির করে উঠল আমার।

"মালিক!" হেঁকে বললাম—"আমি হার্পুনারের সঙ্গে শোবো না। এই বেঞ্চে শোবো।"

"যথা অভিরুচি। আমি কিন্তু টেবিলের চাদর পেতে তোমার বিছানার গদী বানাতে পারব না। বেঞ্চিটাও বড্ড এবড়ো-খেবড়ো- শোবে কি করে? দাঁড়াও—র‍্যাদা দিয়ে চেঁচে দিচ্ছি।" বলে ছুতোরের থলি থেকে একটা র‍্যাদা নিয়ে এল মালিক। ঘস ঘস করে কাঠ চেঁচে সমান করে দিতে লাগল অসমান বেঞ্চিকে। কব্জির জোরও আছে বটে। কিন্তু হঠাৎ র‍্যাদা আটকে গেল একটা কাঠের গুটলিতে--কিছুতেই সমান করা গেল না।

আমি বললাম—"ঢের হয়েছে। ওতেই হবে।"

দাঁত বার করে বিচ্ছিরি হাসল মালিক। কাঠের কুচোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আগুনের চুল্লীতে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল নিজের কাজে।

বেঞ্চিটাকে মাপলাম। আমার চাইতে লম্বায় এক ফুট ছোট। একটা চেয়ার বসিয়ে সে ঘাটতি পূরণ করা যাবে। কিন্তু চওড়াতেও বেঞ্চিটা মাত্র ফুটখানেক। ঘরের অন্য বেঞ্চিগুলো চার ইঞ্চি উঁচু—পাশাপাশি লাগানো যাবে না। তাই যে দেওয়ালটা মোটামুটি পরিষ্কার, তার পাশে রাখলাম এই বেঞ্চিটা—একদম ভিড়িয়ে দিলাম না—একটু ফাঁক রাখলাম—যাতে আমার পেছন দিকটা সেই ফাঁকে আটকে দিয়ে শুতে পারি। কিন্তু অচিরে আবিষ্কার করলাম, জানলার ফাঁক দিয়ে একটা বিচ্ছিরি কনকনে হাওয়া আসছে। নড়বড়ে দরজার তলা দিয়েও একটা শৈত্যপ্রবাহ আসছে। দুটো হাওয়ার স্রোত মুখোমুখি ধাক্কা লেগে ঘূর্ণি হাওয়ার সৃষ্টি করছে আমি যেখানে রাত কাটাবো মনস্থ করেছি ঠিক সেইখানেই।

হার্পুনধারীর মুণ্ডপাত করলাম মনে মনে। আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? ও ঘরে ঢোকার আগেই আমি ঢুকে পড়লে হয় না? খিল তুলে দিয়ে একাই দখল করব খাট? দরজায় ধাক্কা মারবে? মারুক। তারপরের দিন সকালবেলা যদি ওৎ পেতে বসে থাকে বাইরে? ঘর থেকে বেরোলেই মেরে দ্যায়? নাঃ—এ মতলব চলবে না?

আর একবার চারপাশ তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু অন্যের বিছানায় শোওয়া ছাড়া শীত নিবারণের কোনো পথ দেখলাম না। তার চাইতে বরং এক কাজ করা যাক। হার্পুনধারীকে না দেখেই তার সম্বন্ধে কতকগুলো মনগড়া ধারণা নিয়ে কষ্ট না পেয়ে তাকে দেখা যাক। সে আসুক। আমি বসে থাকি ততক্ষণ। দেখে যদি পছন্দ হয়, এক সাথে রাত কাটানো যাবে'খন।

একে-একে ফিরে এল অনেকেই—গেল যে-যার ঘরে। কিন্তু পাত্তা নেই সেই হার্পুনধারীর।

মালিককে জিজ্ঞেস করলাম—"কি ব্যাপার বলুন তো? বারোটা বাজল—এখনো ফিরল না হার্পুনার।"

খিক-খিক করে হেসে উঠল মালিক। হাসিটা দুর্বোধ্য। আমার গা শির-শির করে উঠল হাসির ধরণ দেখে। বলল—"ফিরবে…ফিরবে…ওর আবার সবকিছুই সকাল-সকাল করার অভ্যেস। ঘুমোয় সকালে, ওঠেও সকালে। তবে আজ বেরিয়েছে মুণ্ড বিক্রী করতে। খদ্দের পাচ্ছে না বোধহয়।"

"মুণ্ড! মুণ্ডর খদ্দের পাচ্ছে না! আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছেন নাকি?" রেগে বললাম আমি। "শনিবারের রাতে নিজের মুণ্ড বেচতে বেরিয়েছে হার্পুনার—এই কথাই কি বলতে চান আপনি?"

"হ্যাঁ, তাই বলতে চাই।—তখনি বলেছিলাম ওকে, বিক্রী করতে পারবে না—বাজারে মাল রয়েছে।"

"কি মাল?"

"মুণ্ড—দুনিয়ায় মুণ্ডর কি অভাব আছে রে ভাই?"

"মালিক, আমি কাঁচা ছেলে নই—যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দিন।"

"আরে দূর, কাঁচা হতে যাবে কেন।" খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে বলল মালিক—"তবে তোমাকে পাকিয়ে ছাড়বে হার্পুনার যদি শোনে তার মুণ্ড নিয়ে আলতু-ফালতু কথা বলেছো।"

ধাঁ করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়—"মুণ্ড ভেঙে দেব!"

"ভাঙাই আছে।"

"ভাঙা আছে মানে?"

"আরে হ্যাঁ, তাই তো মুণ্ডটা বেচতে পারছে না।

"মালিক," সংযত কণ্ঠে বললাম—"তামাশা ছাড়ুন। আমি রাত কাটাতে চাই শুনে আপনি হার্পুনারের সঙ্গে শুতে বলেছিলেন। এখন বলছেন সে

মুণ্ড ফেরী করতে বেরিয়েছে।—দেখুন মশায়, লোকটা যদি বদ্ধ পাগল হয়—আর সব জেনে শুনেও যদি তার সঙ্গে একখাটে শুইয়ে দেন আমাকে—আপনার হাতে দড়ি পড়তে পারে খেয়াল রাখবেন।"

দম নিয়ে মালিক বললে—"আরেব্বাস! মস্ত লেকচার দিয়ে ফেললে দেখছি! মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করো—অত গরম হয়ো না। যার কথা বলছি, সে এই সেদিন দক্ষিণ থেকে ফিরেছে। আসবার সময়ে নিউজিল্যাণ্ড থেকে কতকগুলো মানুষের মাথা নিয়ে এসেছে—ম্যমী করা মাথা। জানো তো, কিউরিও হিসেবে এ মাথার দাম অনেক। সব মাথা বিক্রী হয়ে গেছে—বাকী রয়েছে একটা। শনিবারে অথবা রোববারে মানুষ চার্চে যায় ধর্মকথা শুনতে—তখন কি মড়ার মাথা বিক্রী হয়? গত রোববার যখন চারটে মাথা মালার মত ঝুলিয়ে বেরোচ্ছিল—বেরোতে দিই নি।"

কুটিল রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল এই কথা শুনে। বুঝলাম, আমাকে নিয়ে রগড় করবার কোনো বাসনা নেই মালিকের। কিন্তু মানুষের মাথা নিয়ে ফেরী করে যে লোক তার সম্বন্ধে খোলাখুলি খবর দিলে যদি আমি ভড়কে যাই? এ ব্যবসা নরখাদককে মানায়। ম্যমী-মুণ্ড বিক্রী কি চাট্টিখানি কথা?

বললাম—"হার্পুনার লোকটাও নিশ্চয় বিপজ্জনক।"

"টাকাকড়ি যথাসময়ে মিটিয়ে দেয়।—কিন্তু রাত অনেক হল। চল শোবে চল। আরে শোনো, খাটটা মস্তবড়। এই সেদিন তিনজন একসঙ্গে শুয়েছিল। দুজন পাশাপাশি। আর একজন পায়ের কাছে। মাঝরাতে লাথি খেয়ে তার হাত ভাঙে আর কি। তারপর থেকে ঠিক হয়েছে—ওভাবে আর শোওয়া চলবে না।—নাও, উঠে পড়ো।"

আমি কিন্তু এক ইঞ্চিও নড়লাম না। মালিক হঠাৎ চমকে উঠল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে—"সব্বোনাশ! রোববার শুরু হয়ে গেছে। শোনো হে, শোনো—হার্পুনার আজ রাতে আর ফিরবে না। নিশ্চয় কোথাও আটকে গেছে।"

শুনে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। মালিকের পেছন পেছন গেলাম শোবার ঘরে। খাটটা সত্যিই পেল্লায়—অনায়াসে চারজন শুতে পারে।

হাতের মোমবাতিটা একটা সাবেকী সমুদ্র-সিন্দুকের ওপর রেখে বিদায় নিল মালিক। সিন্দুকটার কাজ দুটো—হাত ধোওয়ার জায়গা এবং লেখবার টেবিল।

বিছানার চাদর ভাঁজ করে সরিয়ে রাখলাম। শয্যার চেহারা দেখেশুনে

ভালই লাগল। চারপাশে তাকিয়ে সিন্দুক আর খাট ছাড়া আর কোনো আসবাব দেখতে পেলাম না। একটা ন্যাড়া তাক। চারটে রুখু দেওয়াল। দেওয়ালে সাঁটা একটা কাগজে তিমি শিকারের ছবি—হার্পুন ছুঁড়ে তিমি মারছে একজন শিকারী। দড়ি বাঁধা একটা হ্যামক গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝেতে। হার্পুনারের জিনিসপত্র রাখার একটা প্রকাণ্ড থলি ট্রাঙ্কের বদলে। মাছ ধরার ছিপ আর বঁড়শির একটা মস্ত প্যাকেট। আগুনের চুল্লীর তাকে দাঁড় করানো একটা লম্বা তিমি মারার বর্শা—হার্পুন।

কি আছে সিন্দুকের মধ্যে? ডালাটা খুললাম। মোমবাতির আলোয় ভেতরে দেখলাম একটা পাপোষের মত জিনিস—মাঝখানে একটা ফুটো—চারপাশে ন্যাকড়ার ঝালর।

দেখে খটকা লাগল। হার্পুনধারী কি এই পাপোষ মাথায় গলিয়ে শহরের পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায়?—আমি নিজে জিনিসটা মাথায় গলালাম—দেওয়ালে ঝোলানো ভাঙা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শিউরে উঠলাম নিজেকে দেখে। ঝটিতি মাথা গলিয়ে পাপোষ খুলতে গিয়ে বেশ খানিকটা কেটে গেল গলার কাছে।

এবার শোওয়ার পালা। মাংকি জ্যাকেট আর কোট খুলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর মনে পড়ল মালিক বলেছে, হার্পুনার আজ রাতে আর ফিরবে না। সঙ্গে সঙ্গে পাৎলুন-বুট খুলে ঝাঁপ দিলাম বিছানায়।

গদীর মধ্যে ছোবড়া ছিল কি, কাঁচভাঙা ছিল জানি না—অনেকক্ষণ গড়াগড়ি দিলাম—ঘুম এল না কিছুতেই। তারপর যখন তন্দ্রা এসেছে দরজার বাইরে গলিপথে ভারী পদশব্দ শোনা গেল—সচমকে দেখলাম দরজার তলা দিয়ে আলো আসছে ঘরের মধ্যে।

হায় ভগবান! নরমুণ্ড ফেরীওয়ালা তাহলে ফিরে এল! আমি নড়ছি না বিছানা থেকে।

ঘরে ঢুকল নৃমুণ্ড বিক্রেতা। এক হাতে আলো, আরেক হাতে নিউজিল্যাণ্ড থেকে আমদানী করা মানুষের মুণ্ড। খাটের দিকে না তাকিয়ে সিধে গেল ঘরের কোণে। মোমবাতি নামিয়ে রেখে গিঁট খুলতে লাগল থলির। আমি সেই ফাঁকে মুখটা দেখতে চাইলাম—কিন্তু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকায় দেখতে পেলাম না। থলির মুখের ফাঁদটা এঁটে গিয়েছিল বলে একটু বেগ পেতে হল তাকে। তারপর মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলাম তার মুখচ্ছবি এবং শিউরে উঠলাম।

একী মুখ! সারা মুখে ছোপ ছোপ কালো, লাল, হলদে রঙ।

অনেকগুলো চৌকো কালো গর্ত—লড়াইয়ের পরিণাম বোধহয়। কিন্তু প্লাস্টার দিয়ে ঢাকা নেই তো! তবে কি উল্কির চিহ্ন? এরকম একটা গল্প শুনেছিলাম বটে। নরখাদকদের কবলে পড়েছিল একজন সাদা মানুষ—তিমি শিকারী। জংলীরা তার মুণ্ড চিত্রবিচিত্র করে ছেড়েছিল বীভৎস উল্কী এঁকে।

চুলোয় যাক মুখের চেহারা! বাইরেটা খারাপ হলেও অনেক মানুষের ভেতর ভাল থাকে। কিন্তু লোকটার গায়ের রঙ এরকম অপার্থিব হল কেন? দক্ষিণ সমুদ্রে অবশ্য আমি কখনো যাইনি। ওখানকার রোদে জলে কি গায়ের রঙ ঝলসে লালচে-হলদে হয়ে যায়?

লোকটা থলির মুখ খুলে ফেলেছে। হাতড়ে হাতড়ে বার করল একটা রেড ইণ্ডিয়ানদের 'টোমাহক' কুড়ুলের মত বস্তু আর সীল মাছের সলোম চামড়ার থলি। জিনিসদুটো সিন্দুকের ওপর রেখে কদাকার মুণ্ডটা ঠেসেঠুসে ঢুকিয়ে দিল থলির মধ্যে। তারপর ভোঁদরের চামড়ার টুপীটা মাথা থেকে খুলতেই আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আমি।

লোকটার মাথায় একদম চুল নেই। কপালের কাছে চামড়ার খানিকটা ডেলা ছাড়া কিচ্ছু নেই তেলতেলে লালচে মাথায়। মাথা তো নয়—যেন একটা কুৎসিত করোটি। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল আগন্তুক—নইলে আমি লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে চোঁচা দৌড় দিতাম বাইরে।

জানলা দিয়ে গলে পালালে হয় না? কিন্তু দোতলার জানলা থেকে পড়ে মরব নাকি? আমি কাপুরুষ নই। কিন্তু নৃমুণ্ড পশারীর চালচলন বড় দুর্বোধ্য।

লোকটা কিন্তু নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। এখন জামাপ্যাণ্ট খুলছে। বাহু আর বুকেও দেখলাম সেইরকম রহস্যময় চৌকো কালো দাগ। পিঠেও তাই। একটানা বছর তিরিশ লড়াই করে ক্ষতবিক্ষত দেহে যেন সারা গায়ে স্টিকিং প্লাস্টারের কোট পরে এসেছে। উরু দুটিতে যেন সবুজ ব্যাঙ লাফ দিচ্ছে—অদ্ভুত আঁকিবুকি সেখানকার চামড়ায়।

এতক্ষণে বুঝলাম, আগন্তুক নিশ্চয় কোনো বর্বর অসভ্য জংলী। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে তিমি ধরা জাহাজে উঠে এসেছে খৃস্টান জগতে। ফেরী করতে বেরিয়েছে মানুষের ম্যমী-মুণ্ড—খুব সম্ভব নিজের ভাইদের মুণ্ড! 'টোমাহক' কুড়ুলটার চেহারাই কি কম হিংস্র!

কিন্তু ভয় পেয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপলে চলবে না। বুনো লোকটার পরবর্তী কার্যকলাপ দেখে চোখ কপালে উঠে গেল আমার। গায়ের মোটকা ভারী জোব্বা অথবা আলখাল্লা অথবা ওভারকোটটা খুলে ঝুলিয়ে রেখেছিল সে।

এবার হাত ঢুকোলো তার পকেটে—টেনে বার করল অত্যন্ত বিদঘুটে একটা বেঢপ মূর্তি—পিঠে কুঁজ; মিশমিশে রঙটা দেখে মনে হল তিনদিন বয়সের কঙ্গো বাচ্ছা। আশ্চর্য কিচ্ছু নয়। ম্যমী-মুণ্ড নিয়ে যে ফেরী করতে পারে, ম্যমী-শিশুও সে জোগাড় করতে পারে।

কিন্তু মূর্তিটার চকচকে গা দেখে আমার ভুল ভাঙল। পালিশ করা আবলুষ কাঠ। জিনিসটা তাহলে কাঠের পুতুল—বিগ্রহ। বুনো লোকটা এবার শূন্য ফায়ার-প্লেসের সামনে গিয়ে চিমনীর ঝুলের সামনে বসিয়ে দিল মূর্তিটাকে। দেখলাম মানিয়েছে ভাল। আগুনের চুল্লীটা যেন বেদী—পেছনকার কালিঝুলি বিগ্রহর চালচিত্র।

লোকটা পকেট হাতড়ে একমুঠো কাঠের কুচো রাখল বিগ্রহর সামনে। একটা সমুদ্র-বিস্কুট রাখল তার ওপর। তারপর মোমবাতি এনে আগুন ধরিয়ে দিল কাঠের কুচোয়। যেন হোম করছে—দেবতাকে আবাহন করছে। বেশ কয়েকবার কাঠের কুচোয় আঙুল ঢুকিয়ে এবং আঙুলে ছ্যাঁকা লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত টেনে আনল পোড়া বিস্কুটটা। নিবেদন করল আবলুষ দেবতাকে। কিন্তু শুকনো পোড়া বিস্কুট খাওয়ার কোনো অভিরুচি ছিল না দারু-দেবতার। আগাগোড়া বিড়বিড় করে স্তোত্রপাঠের মত দুর্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ করে গেল বর্বর মানুষটা। মুখভাব এমন বিকৃত অস্বাভাবিক হয়ে উঠল যে বলবার নয়। সবশেষে আগুন নিভিয়ে দিয়ে অত্যন্ত হেলাফেলার সঙ্গে দারু দেবতাকে তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল জোব্বার পকেটে—যেন একটা কাঠের টুকরো ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই সব দেখে শুনে আরো বেড়ে গেল আমার অস্বস্তি। তারপর যখন দেখলাম জংলীটা পুজো-আচ্চা সেরে শোওয়ার মতলব করছে, আর বোবা থাকা শ্রেয় মনে করলাম না। আলো নেভবার আগেই কিছু বলা দরকার।

কিন্তু কি বলব, ভাবতে গিয়ে খানিকটা সময় নষ্ট করে মহা ভুল করে বসলাম। টেবিল থেকে টোমাহক তুলে নিয়ে মাথার দিকটা খানিকক্ষণ দেখল সে, কামড়ে ধরল হাতলটা। তারপর আলোর ওপর ধরে ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল মুখ দিয়ে। পরক্ষণেই ফুস করে নিভে গেল মোমবাতি, টোমাহক মুখে নিয়ে লাফ মেরে নরখাদকটা উঠে এল বিছানায়—আমার গায়ের ওপর। আমি আর বোবা হয়ে থাকতে পারলাম না—চেঁচিয়ে উঠলাম বিকট গলায়। অবাক হয়ে সে হাতড়াতে লাগল অন্ধকারে। কিন্তু ছুঁতে পারল না আমাকে।

তোৎলাতে তোৎলাতে কি যে ছাই বলেছিলাম তখন, এখন মনে নেই।

শুধু মনে আছে দেওয়ালের গায়ে সেঁটিয়ে গিয়েছিলাম আমি। চেষ্টা করছিলাম খাট থেকে নেমে মোমবাতিটা জ্বালব।

বুনো হার্পুনার এবার ভাঙা-ভাঙা ইংরেজীতে গর-গর করে উঠল—"কে রে…কে তুই…কথা বলছিস না কেন · মেরে খুন করব।" দপ দপ করে অন্ধকারে জ্বলতে লাগল মুখের টোমাহক।

"মালিক…মালিক! পিটার কফিন! শীগগির আসুন! বাঁচান! কফিন! মেরে ফেললে!"

"আবার চেঁচাচ্ছিস শীগগির বল কে তুই·· মেরে খুন করব!" আবার দপ দপ করে জ্বলে উঠল টোমাহক—জ্বলন্ত অঙ্গার আর ছাই ছিটকে গেল খাটে—আগুন লাগল বলে!

ঠিক এই সময়ে পিটার কফিন ছুটে এল ঘরে। আমি লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে দৌড়ে গেলাম তার কাছে।

দাঁত খিঁচিয়ে হেসে বলল মালিক—"আর ভয় কিসের? কুইকোয়েগ একগাছি চুলও ছিঁড়বে না তোমার।"

"আর দাঁত দেখাতে হবে না।" তেড়েমেড়ে বললাম আমি। "মানুষ-খেকোর সঙ্গে রাত কাটাতে হবে, আগে বলো নি কেন?"

"নিজেই জানতে পারবে বলে বলিনি। মুণ্ড ফেরী করে বলেছিলাম তো?—নাও, নাও, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো।—কুইকোয়েগ, এ তোমার সঙ্গে শোবে। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে," মুখের পাইপ নামিয়ে খাড়া হয়ে বিছানায় বলল জংলী মানুষ-খেকো। বিনীতভাবে বলল আমাকে—"উঠে এসো…।" টোমাহক নেড়ে ইসারা করল খাটে উঠতে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাল করে দেখলাম তাকে। উল্কার জন্যে বীভৎস-দর্শন হলেও খুব ঠাণ্ডা স্বভাবের নরখাদক। খামোকা এতটা হুটোপাটি করলাম। ওর আর দোষ কী? ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

মাতাল খৃস্টানের সঙ্গে রাত্রিবাস করার চাইতে ধীর স্থির নরখাদকের শয্যাসঙ্গী হওয়া অনেক নিরাপদ।

বললাম—"মালিক, ওর ঐ টোমাহক বা পাইপ—যাই বলুন না কেন—সরিয়ে রাখতে বলুন। তামাক খাওয়া শেষ না হলে বিছানায় উঠব না। খাটে শুয়ে পাইপ খাওয়া ঠিক নয়। বিপজ্জনক। আমার জীবন-বীমাও নেই।"

মালিক বুঝিয়ে বলল কুইকোয়েগকে। সবিনয়ে তৎক্ষণাৎ পাইপ সরিয়ে

রেখে সাদর আহ্বান জানাল খাটে ওঠবার জন্যে—নিজেও সরে গেল একদম কিনারায়—যাতে আমার গায়ে গা না লাগে।

"শুভরাত্রি। মালিক। আসতে পারেন আপনি," বললাম আমি।

উঠলাম খাটে, ঘুমোলাম মড়ার মত।

## বিছানার চাদর

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখলাম কুঈকোয়েগ আমাকে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরে নাক ডাকছে। বাহুবেষ্টনে বন্দী। বিছানার চাদরের যে রঙ, ওর বাহুর রঙ তাই—হুবহু মিলে গিছে। চাদরটিতে অসংখ্য তালি-মারা। কোনোটি চৌকোণা, কোনোটি তেকোণা। এক-একটির এক-একরকম রঙ। ওর বাহুর রঙও তাই। এক রঙ কোথাও নেই—হরেক রঙ। সমুদ্রে কাজ করেছে তো—ছায়ায় দেহ রাখতে শেখেনি। চোখ মেলে তাই হক চকিয়ে গেলাম চিত্রবিচিত্র বাহু আর বিছানার চাদর দেখে—দুটি যে আলাদা বস্তু চট করে ধরা যায় না। এদিকে ওর আদরের বাহু বেষ্টনে আমার দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়।

আমার তখনকার অনুভূতি বর্ণনা করবার চেষ্টা করছি। আমি যখন ছোট ছিলাম, কি যেন একটা দুষ্কর্ম করছিলাম চিমনীর মধ্যে ঢুকে। আমার সৎ-মা হিড়হিড় করে পা ধরে টেনে নামাল চিমনীর ভেতর থেকে—হুকুম দিল বিছানায় শুয়ে পড়তে। অথচ তখন বেলা দুটো। দিনটা ২১ শে জুন। আমাদের গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন। সৎ-মা আমার সত্যিই সৎ-মা। চাবুক-পেটা করতে বা না খাইয়ে ঘরে আটকে রাখতে জুড়ি নেই। হাকিম নড়লেও তার হুকুম নড়ে না। তাই চোরের মত গেলাম দোতলার ঘরে।

কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আর পারলাম না। ষোলটি ঘণ্টা এইভাবে থাকব কি করে? জানলার রোদ দেখছি, রাস্তায় গাড়ীর আওয়াজ শুনছি, বাড়ীময় ফুর্তির চেঁচামেচি শুনছি। শেষকালে পিঠে ব্যথা ধরে গেল শুয়ে থাকতে থাকতে। পা টিপেটিপে নেমে গেলাম সৎ-মায়ের কাছে। সটান আছড়ে পড়লাম পায়ের ওপর। ক্ষমা চাইলাম। অন্য যে কোনো শাস্তি চাইলাম—কিন্তু এসময়ে যেন আমাকে শুতে বলা না হয়। কিন্তু সৎ-মা আমার কোনো কথাই শুনল না। ফের পাঠালো ঘরে। কি আর করি, চুপচাপ শুয়ে রইলাম চোখ মেলে। তারপর বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। আচমকা চটকা ভাঙতেই একটা বিচিত্র অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত হল সর্ব অঙ্গ। কিছু দেখতে

পেলাম না। শুনতেও পেলাম না। কিন্তু বেশ বুঝলাম, কে যেন আমার গা ঘেঁসে বিছানায় বসে আছে এবং একটা হাত আমার গায়ের ওপর রেখেছে।

আমি নড়তে পারলাম না, কথা বলতে পারলাম না। কেবলি মনে হল নড়লে অথবা কথা বললেই এই মোহাবস্থার অবসান ঘটবে। কাঠ হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে আবার তন্দ্রা এল—ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর বেলা উঠে কিন্তু রাতের রহস্যের অর্থ ধরতে পারলাম না। আজও সেই অনুভূতি রহস্যের ব্যাখ্যা আমার মাথায় আসেনি।

কুঈকোয়েগের স্নেহনিষিক্ত বাহু বেষ্টনের সঙ্গে সেই অলৌকিক অদৃশ্য স্পর্শের অনেক সাদৃশ্য আছে। কাল রাতের ঘটনাগুলো ভীড় করে এল মনের মধ্যে। অনেক চেষ্টা করলাম ওকে জাগাতে। কিন্তু যত চেঁচাই, ওর নাক ডাকা ততই বাড়ে। শেষকালে নিজেই বাহুর মধ্যে থেকে গলে বেরিয়ে আসতে খ্যাঁচ করর কি যেন ফুটে গেল গায়ে। হাত বুলিয়ে গায়ের চাপার তলা থেকে বার করে আনলাম সেই টোমাহকটা। আচ্ছা জংলী তো! ঠিক যেন একটা বাচ্চাকে পাশে ঘুম পাড়িয়ে নিজে ঘুমোচ্ছে। "কুঈকোয়েগ··এই কুঈকোয়েগ উঠে পড়ো?" চেঁচামেচি আর ঠেলাঠেলিতে এবার একটু কাজ হল। বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেলাম আমি। তারপর জল থেকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড কুকুর যে-ভাবে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে আসে, ঠিক সেইভাবে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল কুঈকোয়েগ। কুৎকুতে চোখে পিটপিট করে চেয়ে রইল আমার পানে। যেন আমাকে চিনতে পারছে না। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে মনে পড়ল আমি কে। তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে নেমে পড়ল মেঝেতে এবং অঙ্গভঙ্গী করে বললে—আগে সে জামাকাপড় পরে নেবে—তারপর পুরো ঘরটাই আমাকে ছেড়ে দেবে সাজ গোজ করার জন্যে। জংলী হলেও কুঈকোয়েগ অতিশয় ভদ্র, বিনীত এবং মার্জিত।

ওর সাজগোজ আরম্ভ হল কিন্তু উল্টোদিক থেকে। খাটে বসে পরম কৌতূহলে ওর কার্যকলাপ দেখতে লাগলাম আমি। প্রথমে ভোঁদর-চামড়ার টুপী মাথায় দিল। তারপর ব্যাঙ-তড়কা লাফ দিয়ে ঘরময় খুঁজতে লাগল জুতো জোড়া। শেষকালে জুতো পাওয়া গেল খাটের তলায়। লম্বা টুপী পরেই তলায় ঢুকল সে। বেরিয়ে এল লম্বা টুপীকে থেঁৎলে, দুমড়ে, মুচড়ে। পায়ে জুতো গলাতে গিয়ে লাগল নতুন বিভ্রাট। জুতো পরা অভ্যেস নেই নিশ্চয়। অতিকষ্টে লেংচে লেংচে এক পায়ে নেচে নেচে সাঙ্গ হল জুতোপরা।

মাথায় টুপী আর পায়ে জুতো পরে ঘুরতে লাগল ঘরময়। দৃশ্যটা অতি বিসদৃশ। তাই বললাম প্যান্ট পরে নিতে। তৎক্ষণাৎ বিনীতভাবে কথা শুনল কুঈকোয়েগ। এবার মুখ ধোওয়ার পালা। সবাই যা করে এক্ষেত্রে, ও কিন্তু করল ঠিক তার উল্টো। আগে মুখ না ধুয়ে জল দিল বুকে, বাহুতে, হাতে। খৃস্টানরা যা করে, তার বিপরীত। তারপর প্যান্টের ওপর ওয়েস্টকোট পরে নিয়ে এক টুকরো শক্ত সাবান বার করে সিন্দুকের ওপর রাখা গামলার জলে ভিজিয়ে নিয়ে জোরে জোরে ঘসতে লাগল মুখে। ভাবছিলাম, ক্ষুরটা রেখেছে কোথায়। কিন্তু দাড়ি কামানোর যন্ত্র দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। ঘরের কোণ থেকে হার্পুন এনে কাঠের ডাণ্ডা খুলে ফেলল। শুধু ফলা দিয়ে ঘ্যাচর ঘ্যাচর করে ঘসতে লাগল দাড়ির ওপর। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ির ওপর হার্পুন চালানোর সেই দৃশ্য ভোলবার নয়! তারপর অবশ্য খেয়াল হল—হার্পুনের ফলায় সাংঘাতিক ধার থাকে। সেরা ইস্পাত দিয়ে তৈরী হয় প্রতিটি ফলক। সুতরাং—

সাজগোজ শেষ করে ওভারকোট পরল কুঈকোয়েগ। এক হাতে নিল হার্পুন—তারপর বুক ফুলিয়ে গটমটিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

## প্রাতরাশ

কিছুক্ষণ পরে আমিও নেমে এলাম মদ্যপানের ঘরে। আমাকে দেখেই দাঁত খিঁচিয়ে হেসে অভ্যর্থনা জানাল মালিক। আমি রাগ করলাম না। হাসি বড় দুর্লভ বস্তু। প্রাণ খুলে যে হাসতে পারে না—সে দুর্ভাগা। তাই কেউ যদি ব্যঙ্গব্যঙ্গ করে হাসতে চায় হাসুক—তাকে না হাসতে দেওয়াটা ঠিক নয়। যাকে ঘিরে এত সুন্দর হাসির সৃষ্টি, মনে রাখবেন তার ভেতরে এমন কিছু আছে যা আপনি ভাবতেও পারেন না।

মদ্যশালায় আজ অনেক লোক। সবাই রাত কাটিয়েছে সরাইখানায়। প্রত্যেকেই তিমি শিকারী। চীফ মেট, সেকেণ্ড মেট, থার্ড মেট, ছুতোর, কামার, হার্পুনার। তামাটে পুরুষালি গড়ন প্রত্যেকের। মুখবোঝাই দাড়ি। রুক্ষ কর্কশ চেহারা। প্রত্যেকেরই গায়ে মাংকি জ্যাকেট আর মর্নিং গাউন।

লোকগুলোর চেহারা দেখেই কিন্তু বলা যায় কে কদ্দিন হল ডাঙায় ফিরেছে। ঐ যে ছোকরা—গায়ের রঙ যার রোদ্দুরে সেঁকা কড়াই শুঁটির মত, গাল দুটি স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ভরা—ও কিন্তু খুব জোর দিন তিনেক হল আরও মহাসাগর

থেকে ফিরেছে। পাশের লোকটার গায়ের রঙ কয়েক পোঁচ হাল্কা—ও কমসেকম সাতদিন ডাঙায় পা দিয়েছে। কিন্তু কুঈকোয়েগের মত অমন বাহারি গাল কি কেউ দেখেছে? যেন অ্যাণ্ডিজ পর্বতের পশ্চিম ঢাল—বিভিন্ন ঋতুর খেলা এক-এক অঞ্চলে!

"ব্রেকফাস্ট!" হাঁক দিল মালিক। হুড়মুড় করে খাবার ঘরে গেলাম প্রাতরাশ খেতে।

লোকে বলে, যারা দুনিয়া দেখে এসেছে, তাদের হাবভাব খুব সরল সাদাসিদে সহজ হয়—সংযমী ধীরস্থির হয়। কথাটা অবশ্য সবক্ষেত্রে খাটে না।

কিন্তু খাবার টেবিলে যাদের দেখলাম, তারা কেউ ব্যতিক্রম নয়। ওরা প্রত্যেকেই দুর্মদ যোদ্ধা, নির্ভীক তিমি শিকারী। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময়ে তিমির পিঠে উঠেছে, অজানা সাগরে হার্পুন চালিয়েছে, প্রাগৈতিহাসিক দানোকে খতম করেছে। ওদের অনেক অভিজ্ঞতা; গল্প বলার মত অনেক গল্প ওদের মগজে ঠাসা। কিন্তু কেউ একটি কথাও বলছে না। বিরাট তিমির পিঠে উঠতে যাদের বুক কাঁপেনি—টেবিলে পাশাপাশি বসে আছে তারা ভীরুভাবে—চোখ তুলে তাকাতেও পারছে না—যেন কেউ কাউকে চেনে না। অথচ ওদের পেশা এক, ধর্ম এক, শৌর্যবীর্য সাহস সমান-সমান। কিন্তু এমনভাবে খাচ্ছে নীরবে নত মুখে যেন পাহাড়ী ভেড়া চরানো ছাড়া ইহ জীবনে আর কিছু করেনি! অদ্ভুত দৃশ্য! তিমি-যোদ্ধাদের এই আচরণ সত্যিই বিরল!

কুঈকোয়েগ এদের মাঝেই বসে আছে—টেবিলের গোড়ায়। সঙ্গে সেই হার্পুন। নির্বিকার ভাবে হার্পুনের ফলা দিয়ে গরুর মাংস ভাজা প্লেট থেকে গেঁথে মুখে পুরছে। কোনোদিকে দৃকপাত নেই। পরম নিশ্চিন্তে প্রশান্ত চিত্তে খেয়ে চলেছে হার্পুন দিয়ে।

তার কফি পান করা, গরম 'রোল' চিবোনো—সব কিছুই অদ্ভুত। কত আর বলব। খাওয়া শেষ হলে মদ্যশালায় এসে প্রকাণ্ড টোমাহক পাইপ ধরিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল প্রশান্ত-চিত্তে—মাথায় রইল চিরসঙ্গী ভোঁদর চামড়ার লম্বা টুপীটা।

আমি বেরিয়ে পড়লাম শহর পরিক্রমায়।

### রাস্তা

শহরে পরিবেশে কুঈকোয়েগকে দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। রাস্তায় বেরিয়ে হাজার-হাজার আধা জংলীকে পথে ঘাটে চক্কর দিতে দেখে অবাক

হতেও ভুলে গেলাম। যে কোনো শহরে জাহাজ ঘাটার কাছে নাবিকদের জটলা দেখা যায়। বোম্বাই শহরের অ্যাপোলো বন্দরে ইয়াঙ্কি খালাসী দেখে চমকে ওঠে ভারতীয়রা। কিন্তু নিউ বেডফোর্ড হার মানিয়েছে সব শহরকে। আধা জংলী, পুরো জংলী, মানুষখেকো, অসভ্য বর্বররা গিজগিজ করছে পথে ঘাটে। কারো গায়ে এখনো সবুজ পাহাড়ের ছায়া, আবার কারো মাথায় ভোঁদরের চামড়ার টুপী, কারো পরণে সোয়ালো পাখীর ল্যাজ দিয়ে তৈরী কোট।

বিখ্যাত এই শহরে শুধু জংলী, মানুষখেকো আর হার্পুনার আছে বললেও অবিচার করা হবে। সত্যিই আজব দেশ এই নিউ বেডফোর্ড। তিমি-শিকারীরা না থাকলে অন্যান্য উপকূল-শহরের মত এ-শহরের চেহারাও অন্যরকম হত। হট্টগোল লেগেই থাকত। শহরের পেছন দিকে পাহাড় ছাড়া কিছু নেই। পাথুরে জমি। যদিও তৈল সমৃদ্ধ অঞ্চল, তাহলেও এ-শহরের পথে ঘাটে দুধের স্রোত বয় না, বসন্তে ডিম গড়াগড়ি যায় না। তা সত্ত্বেও সারা আমেরিকা ঘুরে এসেও নিউ বেডফোর্ড শহরের বাগান বা বাড়ীর মত সুন্দর বাগান বা অভিজাত সৌধ আপনি আর কোনো শহরে পাবেন না। কোত্থেকে এসব এসেছে বলুন তো? ন্যাড়া দেশে এত সমৃদ্ধি আসে কোত্থেকে?

বাড়ী-বাড়ী গিয়ে হার্পুন সজ্জা দেখলেই বুঝবেন কোত্থেকে। আজ্ঞে হ্যাঁ; সমুদ্র থেকে। বাড়ীঘরদোর বাগান বাগিচা সব কিছুই এসেছে আটলান্টিক, প্রশান্ত আর ভারত মহাসাগর থেকে। বলুন দিকি, আলেকজাণ্ডার নিজেও এমন কাণ্ড করতে পারতেন?

শোনা যায়, মেয়ের বিয়ের সময়ে এ-শহরে যৌতুক দিতে হয় আস্ত তিমি। যে কোনো বিয়েতে হাজির থাকলে দেখবেন, আলোয় ঝলমল করছে সারা বাড়ী। কেন? প্রতি বাড়ীতে তিমির তেলের চৌবাচ্চা আছে। সারা-রাত এই তেল পুড়িয়ে উৎসব হয় বিয়ে উপলক্ষ্যে।

বসন্ত এলে শুরু হয় প্রতি বাড়ীতে নতুন উৎসব। নিউ বেডফোর্ডের রমণীরাও ফোটা গোলাপের মত সুন্দর। তবে কি জানেন, গোলাপ ফোটে কেবল বসন্ত কালে। কিন্তু নিউ বেডফোর্ডের সুন্দরীরা সারা বছরই ফুটে আছে উজ্জ্বল রূপ নিয়ে—এ যেন সপ্ত স্বর্গের রৌদ্ররশ্মি—ম্লান হতে জানে না।

## গির্জে

সকাল বেলা এক চক্কর ঘুরে এসে ফের বেরোলাম শহর দেখতে। এবার দেখলাম নাবিকদের গির্জে আর সমাধি ক্ষেত্র। এক জায়গায় বেশ কিছু নাবিক-বধূ দাঁড়িয়ে—কেউ বিধবা, কেউ সধবা। মূক প্রত্যেকেই—ঝড়ের গর্জন ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। আরো খানিক এগোতে দেখলাম সমাধিভূমি। সারি সারি প্রস্তর ফলক। তাতে লেখা জাহাজী মানুষদের নশ্বর জীবনের ইতিবৃত্ত। স্মৃতি এখানকার প্রতিটি ঘাসে, ধূলিকণায়।

আমার আগে তিমি অভিযানে বেরিয়ে যারা আর ফিরতে পারেনি—কেউ আঠারো বছর বয়েসে হারিয়ে গিয়েছে ডেক থেকে, কাউকে তিমি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে নিরুদ্দেশের পথে, কাউকে নৌকোর ওপরেই পিষে মেরে ফেলেছে গুণ্ডা তিমি—ফলকগুলিতে উৎকীর্ণ তাদের সেই পরিণতি। ম্লান আলোয় আমি তা দেখলাম। মন বলল, ইসমাইল, তোমার পরিণতিও ঐ। তারপর কি করে জানি না, আবার ফিরে পেলাম মনের ফুর্তি—কেটে গেল বিষণ্ণতা। তিমি অভিযানে মরণ পদে পদে—তা আমি জানি। হয়ত আমি আর ফিরব না—অনন্তের যাত্রী হব। তারপর কি হবে? আমার জীবন আর মৃত্যুকে আমরা ভুল বুঝেছি। আমার মনে হয়, ইহলোকে আমার ছায়াই আমার আসল সত্তা। আমার মনে হয়, অধ্যাত্ম-লোকে দৃষ্টিপাত করা আর শুক্তির ভেতর থেকে জল ফুঁড়ে সূর্য দেখা একই জিনিস—পুরু জলকে তখন মনে হয় যেন পাতলা বাতাস। আমার শরীর গেলে আমার কি? যার খুশী নিয়ে নিক এই শরীর। শরীরটা তো আমি নই। কাজেই জয় হোক নানটাকে-টয়ের। আসুক জাহাজ—পাড়ি দেব দূর সমুদ্রে তিমির হাঁ-য়ের সামনে—কারণ আমার আত্মাকে বিনাশ করবার ক্ষমতা স্বয়ং বিধাতারও নেই।

## পুরুষের মঞ্চ

গির্জের মধ্যে বেশীক্ষণ বসতে হল না। দরজার ওপর ঝড় মাথা কুটছিল—সহসা পাল্লা খুলে যেতেই ঝড়ের সঙ্গে যিনি ভেতরে ঢুকলেন, তিনি বলিষ্ঠ, বৃদ্ধ এবং সৌম্য দর্শন। তাঁর প্রতি ঘরভর্তি মানুষের সশ্রদ্ধ চাহনি দেখেই বুঝলাম, ইনিই এ-গির্জের পুরুৎ ঠাকুর—স্বনামধন্য ফাদার ম্যাপল।

ফাদার ম্যাপল তিমি শিকারীদের মনের মানুষ—নামটাও তাদেরই দেওয়া। এককালে নাবিক ছিলেন, হার্পুন ছুঁড়ে তিমি শিকারও করেছেন। যৌবন যাওয়ার পর জীবন উৎসর্গ করেছেন ধর্মচক্রে। বৃদ্ধ বয়েসেও তাঁর স্বাস্থ্য অটুট। কপালের বলি রেখায় আশ্চর্য দীপ্তি। হাতে ছাতা নেই। গাড়ী চেপেও আসেননি। তেরপলের টুপীতে বরফ গলছে, প্রকাণ্ড পাইলট জ্যাকেট জলে ভিজে ভারী হয়ে গিয়েছে। টুপী, কোট এবং জুতো খুলে এক কোণে রেখে ভদ্রস্থ হয়ে এসে দাঁড়ালেন মঞ্চের সামনে।

সেকেলে মঞ্চর মত এটিও খুব উঁচু। উঁচু মঞ্চতে ওঠবার সিঁড়ি বানাতে গেলে স্বল্পপরিসর কক্ষের বেশ খানিকটা জায়গা নষ্ট হত। তাই বুঝি পুরুৎ-ঠাকুরের নির্দেশেই ছুতোর একটা দড়ির সিঁড়ি ঝুলিয়ে দিয়েছে মঞ্চের পাশে—যেমনটি জাহাজের গায়ে ঝোলে। নৌকো থেকে যে মই বেয়ে জাহাজে উঠতে হয়—অবিকল সেই রকম। জনৈক তিমি শিকারীর বিধবা বউ লাল ওর্সটেড দিয়ে তৈরী দড়ি দিয়েছিলেন মই তৈরীর জন্যে। তার সঙ্গে কাঠের টুকরো লাগিয়ে এমনভাবে বানানো হয়েছে মইটা যাতে ভাঁজ করে তুলে রাখা যায়।

দেখে অবাক হলাম। দড়ির মই বেয়ে মঞ্চে ওঠার মধ্যে অভিনবত্ব আছে—ঠিক যেন জাহাজে উঠছেন পুরুৎ ঠাকুর। কিন্তু মইটাকে ভাঁজ করে রাখার মত করে তৈরী করা হল কেন ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। মঞ্চটা তো আর জাহাজ নয়! তারপর যখন দেখলাম, ফাদার ম্যাপল পাকা নাবিকের মতই দুহাতে মই ধরে ধাপে ধাপে পা দিয়ে ওপরে উঠে মইটাকে টেনে তুলে ভাঁজ করে রেখে দিলেন জাহাজী কায়দায়— তখন আর অবাক হলাম না।

শুধু মই কেন, মঞ্চের পেছনেও সেই জাহাজ আর সমুদ্রর চিত্রপট। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে অসহায় একটা জাহাজে মেঘলোক থেকে রশ্মিরেখা এসে পড়েছে। ঝড়ো মেঘের আড়ালে শুধু সূর্যই উঁকি দেয় নি—উঁকি মারছেন একজন দেবদূত। তার নয়ন থেকেই স্নিগ্ধ রশ্মিরেখা আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ছে ডুবু-ডুবু জাহাজটার ওপর। নীরব ভাষায় দেবদূত যেন বলছেন—"ভয় কী? বিপদ কেটে গেছে। ঐ দেখো সূর্য উঠছে—মেঘ সরে যাচ্ছে।"

মঞ্চের সামনের দিকে কাঠের প্যানেলটা জাহাজের গলুই-য়ের অনুকরণে তৈরী। চঞ্চুর মত তাকের ওপর রাখা বাইবেল।

সব মিলিয়ে যেন একটা জাহাজের পুরো ভাগ। এই দুনিয়াটা যেন সেই জাহাজ—ভেসে চলেছে অনন্তের উদ্দেশে—যাত্রা এখনো ফুরোয় নি। ঐ মঞ্চ সেই পৃথ্বী-জাহাজের গলুই।

## ধর্মোপদেশ

ঘণ্টাধ্বনির মত গমগমে কণ্ঠে হেঁকে উঠলেন ফাদার ম্যাপল—"স্টার বোর্ডের* লোক এদিকে এসো · লারবোর্ডের লোক ওদিকে যাও।"

তৎক্ষণাৎ চঞ্চল পদধ্বনি এবং গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল ঘরময়। কিছুক্ষণ পর আবার নেমে এল স্তব্ধতা। সবাই তাকিয়ে পুরুৎ মশায়ের দিকে।

নতজানু হয়ে গলুইয়ের সামনে বসলেন ফাদার। দুবাহু বুকের ওপর রেখে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে এমন ভরাট কণ্ঠে প্রার্থনা আরম্ভ করলেন যেন বসে আছেন সমুদ্রের তলদেশে।

গলা তো নয়—যেন গির্জের ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং! শেষ হল প্রার্থনা। এবার সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইলেন তিমি শিকারীদের গান। এবার যেন আনন্দে মাতাল হল ঘণ্টাধ্বনি। সারা ঘর মুখরিত হল সেই শব্দে। ঝড়ের গর্জন পর্যন্ত চাপা পড়ে গেল গানের গমকে।

গান থামল। বাইবেলের পাতা ওলটালেন ফাদার। বললেন—"জাহাজী বন্ধুগণ, প্রথম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটা খুলুন—জোনা-কে গিলে খাওয়ার জন্যে একটা বিরাট মাছ সৃষ্টি করলেন ঈশ্বর।"

শুরু হল মহাপাপী জোনার কাহিনী। কি ভাবে সে সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছিল কি ভাবে তার পাপে ভয়ংকর ঝড় জাহাজকে গ্রাস করতে গিয়েছিল, কি ভাবে নাবিকরা তাকে জলে ছুঁড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন জাদুমন্ত্রবলে ঝড় সরে গিয়েছিল, কি ভাবে সারি সারি দাঁত বসানো প্রকাণ্ড চোয়াল এসে গিলে ফেলেছিল তাকে, কি ভাবে তিমির উদরে বসেও অনুতপ্ত জোনা মঙ্গলময় ঈশ্বরের চরণ বন্দনা করেছিল, কি ভাবে তার প্রায়শ্চিত্ত অন্তে তিমিরূপী ঈশ্বর তাকে এক দ্বীপে উগরে বার করে দিয়েছিল।

বিরামবিহীন ভাবে আশ্চর্য সেই কাহিনী বলে গেলেন ফাদার। প্রতিটি লোমকূপ রোমাঞ্চিত হল তাঁর অগ্নিগর্ভ চাহনি দেখে, আর বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর শুনে। শেষ কথাটি শেষ করার পর দুহাতে মুখ ঢেকে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলেন নিরবে। একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সবাই। শূন্য কক্ষে বসে রইলেন একা ফাদার ম্যাপল।

*স্টারবোর্ড—জাহাজের ডান দিক। লারবোর্ড—জাহাজের বাঁ দিক।

গির্জে থেকে ফিরে এসে দেখলাম কুঈকোয়েগ একা বসে রয়েছে আগুনের চুল্লীর সামনে। এক হাতে আবলুষ কাঠের সেই দেবতা, আর এক হাতে ছুরী। ছুরীর ডগা নাড়ছে দেবতার নাকের সামনে এবং দুর্বোধ্য ভাষায় বিড়বিড় করে বকছে আপন মনে।

আমি এসে পড়ায় বাধা পড়ল স্বগতোক্তিতে। তুলে রাখল কাঠের দেবতা। টেবিলের সামনে গিয়ে একটা মোটা বই টেনে নিয়ে রাখল কোলের ওপর। তারপর পরম নিষ্ঠার সঙ্গে গুনতে লাগল পাতার সংখ্যা। পঞ্চাশ পাতা গুনেই থেমে গেল—বিস্ময়ধ্বনি করে ফের গুনতে লাগল এক থেকে পঞ্চাশ। আবার থামল—আবার বিস্ময়ধ্বনি করল—আবার গোনা শুরু হল এক থেকে পঞ্চাশ। পঞ্চাশের বেশী যেন ও গুনতে শেখেনি। তাই প্রতিবারেই অবাক হয়ে যাচ্ছে পঞ্চাশ পাতার পরেও এতগুলো পাতা দেখে। এত পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল! তবুও তো পাতা ফুরোয় না।

পরম আগ্রহে আমি খাটে বসে চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। কুঈকোয়েগ বর্বর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কদাকার মুখখানাই তার প্রমাণ। তা সত্বেও আমার মনে হল বীভৎস ঐ মুখের মধ্যেও এমন কিছু আছে যা বীভৎস নয়। আত্মাকে লুকিয়ে রাখা যায় না। অপার্থিব উল্কীর বেড়াজালের মধ্যে দিয়েও ওর সরল সৎ অন্তকরণ দেখতে পেলাম। ওর বড় বড় গভীর, কালো এবং বলিষ্ঠ চোখের মধ্যে যে তেজ দেখলাম, হাজার শয়তানকে টক্কর দেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট। চেহারা দেখে মনে হল, ধার-দেনা করা ওর কুষ্ঠিতে লেখা নেই। পৌত্তলিক হতে পারে, অসভ্য বর্বর হতে পারে, কিন্তু ওর মুণ্ডিত মাথা যে কোনো করোটি বিশারদের কৌতূহল জাগ্রত করতে সক্ষম। শুনে হাসি পেতে পারে, তবুও বলব, মাথার গড়ন অনেকটা জর্জ ওয়াশিংটনের মাথার মত। ভুরুর ওপর থেকে পাহাড়ি ঢালের মত কপাল উঠে গেছে ওপর দিকে। ভুরু জোড়া ঝুলন্ত ঝোপের মত ঠেলে বেরিয়ে এসেছে সামনে। কুঈকোয়েগ জর্জ ওয়াশিংটনের নরখাদক-সংস্করণ।

আমি ওকে প্যাট প্যাট করে দেখছি, সকৌতুকে ওর হাবভাব লক্ষ্য করছি—কুঈকোয়েগ কিন্তু আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। আমার অস্তিত্ব নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই। ব্যাপারটা অদ্ভুত। কাল রাতেও আমরা ঘনিষ্ঠভাবে শুয়েছি। আজ তার এরকম ব্যবহার অদ্ভুত বই কি। অলঙ্কারের

স্বভাব-চরিত্র একটু সৃষ্টিছাড়াই হয়। আমি তো দেখেছি, সরাইখানার কারো সঙ্গে মেলামেশা নেই কুঈকোয়েগের। নিজেই নিজের মধ্যে ভরপুর হয়ে বসে আছে একা। অথচ কেপহর্ণ ঘুরে এদেশে এসেছে বিশ হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে। এত দূরে থেকেও সে প্রশান্ত, আত্মনিমগ্ন।

বাইরে ঝড়, ভেতরে কুঈকোয়েগ। নিজের দর্শন নিয়ে সে পরম সুখী। ঠিক করলাম ওর মনের কাছে যাবো। কথাবার্তা শুরু করব। তাই বেঞ্চিটা টেনে নিয়ে বসলাম ওর সামনে। ও কিন্তু বইয়ের পাতা গোনা নিয়ে তন্ময়। তারপর খেয়াল হল আমি এসে বসেছি এবং গায়ে পড়ে কথা বলার চেষ্টা করছি। গত রাতের শোয়ার কথা বলতেই ও জিজ্ঞেস করল আজ রাতেও শোবো কিনা। আমি হ্যাঁ বলতেই খুব খুশী হল এবং যেন ধন্য হল।

এরপর আমি বইটা টেনে নিয়ে বই ছাপা সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম। বই ছাপার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিলাম। দেখলাম ওর কৌতূহল জাগছে। একসঙ্গে শহর দেখার প্রস্তাব করলাম এবং সবশেষে একত্রে ধূমপানের ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। বলতেই টোমাহক আর তামাক-থলি বার করল সে। এগিয়ে দিল আমার দিকে। দু জনে নীরবে পাইপ টেনে চললাম পালাক্রমে।

আমার প্রতি ওর যেটুকু তুহিন কঠিন ঔদাসীন্য ছিল, তামাকের ধোঁয়ায় তা গলে গেল। আমাকে ওর বন্ধুরূপে গ্রহণ করল। তামাক খাওয়া শেষ হলে আমার কপালে কপাল ঠেকিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, এখন থেকে আমরা বিবাহিত—ওর ভাষায় যার অর্থ বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়লাম। আমার জন্যে সে এখন থেকে মরতেও প্রস্তুত। সভ্য-মানুষের চোখে এ-প্রতিজ্ঞার কোনো দাম না থাকতে পারে—কিন্তু অসভ্য বর্বর যা বলে, তা করে।

রাতের খাওয়া শেষ করে শোবার ঘরে গেলাম। ফের কিছুক্ষণ গল্প করলাম এবং পাইপ টানলাম। মমীমুণ্ডটা আমাকে উপহার দিল কুঈকোয়েগ। তামাক-থলি খুলে তিরিশটা রুপোর ডলার ফেললো টেবিলের ওপর। পাশাপাশি ডলারগুলো সাজিয়ে অর্ধেক সরিয়ে দিল আমার দিকে—কোনো কথা শুনল না। তারপর শুরু হল নৈশ-প্রার্থনা। কাঠের দেবতাকে বার করে ফায়ার প্লেসের ওপর রেখে উদ্বিগ্নভাবে আহ্বান জানালো আমাকে প্রার্থনায় যোগ দিতে।

আমি ধর্মে খৃস্টান—পৌত্তলিকের পাশে বসে পুতুল পুজো করি কি করে? কিন্তু পুজো কাকে বলে? স্বর্গ-মর্ত্যের দেবতা কি একটুকরো কাঠকে ঈর্ষা করবেন? অসম্ভব। পুজো মানে কি?—ঈশ্বরের ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করা।—ঈশ্বরের ইচ্ছা কি?—আমার পাশের মানুষ যে-রকম আচরণ—

প্রত্যাশা করে, আমার তাই করা। এই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় এবং কুঈকোয়েগ যদি আমার পাশের মানুষ হয়—তাহলে সে যা চাইছে তা করলেই ঈশ্বরকে পুজো করা হয় নাকি ?

দ্বিরুক্তি না করে বসে পড়লাম ওর পাশে। কাঠের কুচোর ধুনি জ্বাললাম, বিস্কুট পুড়িয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করলাম, দুতিন বার সেলাম ঠুকলাম এবং কাঠের পুতুলের নাকে চুমু খেলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম খাটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোতে পারলাম না।

বিছানা জায়গাটা হল গোপন কথার জায়গা। স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব এক শয্যায় শুয়ে মনের গোপন কুঠরীতে অর্গল খুলে দেয় পরস্পরের কাছে। আমরাও অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে কথা বললাম।

## রাতের পোশাক

শুধু শুয়ে রইলাম না - বক বক করতে লাগলাম। ভালবেসে আমার গায়ের ওপর কতবার উল্কী আঁকা পা তুলে দিল কুঈকোয়েগ। আবার নামিয়ে নিল। দুটি মনের মধ্যে এবং দেহের মধ্যে সব ব্যবধান ঘুচে গেল। একটু একটু করে উঠে বসতে লাগলাম বিছানার ওপর। চার হাঁটু এক হয়ে গেল, নাকে নাক, কপালে কপাল ঠেকিয়ে বসে রইলাম জড়োসড়ো হয়ে। বিছানার চাদর রাতের পোশাকের মত ঘিরে রইল দুজনকে। আগুনের চুল্লীতে আগুন নেই, কিন্তু ঘরে কনকনে ঠাণ্ডা আছে। পরস্পরের দেহের উত্তাপ দেহ পেতে গ্রহণ করে শীত নিবারণ করে চললাম পরম আরামে। ঘরে যাদের আগুনের চুল্লীর মত দামী দামী ঘর গরম করার সরঞ্জাম থাকে, তারা এই আরামটুকু উপভোগ করতে পারবেন না।

মাঝরাতে কুঈকোয়েগের ইচ্ছে হল আলো জ্বালিয়ে পাইপ খাওয়ার। কাল রাতেও পাইপ খাওয়া নিয়ে কত মেজাজ দেখিয়েছি। কিন্তু ভালবাসা মানুষকে পালটে দেয়। তাই আজ রাতে বিছানায় ধূমপান নিয়ে কোনো বিতৃষ্ণা এল না মনে। বরং একই টোমাহক-পাইপ থেকে দুজনেই ধূমপান করে চললাম। এ যে কি আরাম, বলে বোঝানো যাবে না। দুই বন্ধু একটা কম্বল আর একটা পাইপকে ভাগাভাগি করে ভোগ করছি। জ্যাকেট টেনে তুলেছি ঘাড় পর্যন্ত, কম্বল দিয়ে মুড়েছি পা পর্যন্ত, নীলচে ধোঁয়া ভাসছে মাথার ওপর। এই অবস্থায় কুঈকোয়েগ শোনালো ওর অতীত জীবনের কাহিনী।

কুঈকোয়েগ যে দ্বীপে জন্মেছে, তার নাম কোকোভোকো। ম্যাপে চিহ্ন নেই দ্বীপটার। আসল জায়গাগুলোই চিরকাল বাদ যায় ম্যাপ থেকে।

কুঈকোয়েগের বাবা সেখানকার রাজা। কাকা প্রধান পুরুৎ। রাজরক্ত নিয়ে জন্মালেও কুঈকোয়েগের বাল্যকাল নরখাদক সাহচর্যে কেটেছে।

একদিন একটা খৃস্টান জাহাজ এসে ভিড়ল সেই দ্বীপে। কুঈকোয়েগ জাহাজে চেপে খৃস্টান দুনিয়া দেখতে চাইল। কিন্তু ক্যাপ্টেন বাড়তি লোক নিতে চাইল না জাহাজে। দ্বীপের রাজার অনুরোধেও কাজ হল না।

কুঈকোয়েগ দমবার পাত্র নয়। একটা ছিপ-নৌকো নিয়ে পাড়ি জমালো সমুদ্রে। অনেক দূরে একটা সরু অন্তরীপের মধ্যে গিয়ে নৌকো নিয়ে প্রতীক্ষায় রইল জাহাজের। অন্তরীপের একদিকে প্রবাল পাহাড়—আর একদিকে ঝোপঝাড়ভরা সরু জিভের মত একফালি জমি। আগাছা নেমে এসেছে জলের মধ্যেও। ছিপ নৌকো নিয়ে ওৎ পেতে বসে রইল কুঈকোয়েগ সেই আগাছার মধ্যে।

জাহাজটা অন্তরীপে ঢুকতেই বিদ্যুৎগতিতে নৌকো নিয়ে পাশে হাজির হল সে লাথি মেরে নৌকো ডুবিয়ে দিল জলে, শেকল বেয়ে উঠে এল ডেকে এবং একটা নোঙর খামচে উপুড় হয়ে রইল কাঠের মত—পণ করল কেটে ফেললেও মুঠো আলগা করবে না।

ক্যাপ্টেন ছুটে এলেন—খোলা কৃপাণ ওর কব্জির ওপর ঝুলিয়েও ওর মুঠো আলগা করতে পারলেন না। খৃস্টান দুনিয়া দেখবার এত আগ্রহ দেখে শেষকালে মনটা নরম হয়ে এল তাঁর। হুকুম দিলেন খোলের ভেতর গিয়ে থাকতে। হার্পুন ধরতে শিখল কুঈকোয়েগ—শিখল তিমি শিকার করতে।

কিন্তু বন্দরে পৌঁছে নাবিকদের কীর্তিকলাপ দেখে খৃস্টান দুনিয়া সম্বন্ধে মোহ কাটতে আরম্ভ করল কুঈকোয়েগের—একদম কেটে গেল নানটাকেট পৌঁছেও যখন দেখল খালাসীরা কিভাবে জমানো টাকা খরচ করছে ফুর্তির পেছনে। তিমি শিকারের ধরণ দেখেও মনটা খিঁচড়ে গিয়েছিল কুঈকোয়েগের। নরখাদক বাবার সঙ্গে এদের বিশেষ তফাৎ খুঁজে পায় নি। এখন ঘেন্না ধরে গেল খৃস্টান জগতের ওপর। আশা ছিল, সভ্য দুনিয়া থেকে নতুন কিছু শিখে গিয়ে নিজের দেশকে উন্নত করবে। কিন্তু সে আশায় ছাই

পড়েছে। উপরন্তু দেশে ফিরলেও এখন দেশের লোক কিভাবে গ্রহণ করবে বোঝা মুস্কিল। সে তো ধর্মভ্রষ্ট। যার বাপ ঠাকুর্দারা তিরিশ পুরুষ ধরে রাজা হয়ে এসেছে—সে কি আর রাজা হতে পারবে ম্লেচ্ছদের দেশ ঘুরে?

তাই পৌত্তলিক হয়ে থাকাই শ্রেয় মনে করেছে কুঈকোয়েগ। তাই ওর ধরণধারণ এত অদ্ভুত। তাই ও জামাকাপড় পরে খৃস্টানদের মত, কিন্তু উপাসনা করে পৌত্তলিকদের মত। শিকার করে সাত সাগরের তিমি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম এখন ওর ভবিষ্যৎ কার্যসূচী কি। ও বললে—সমুদ্রে বেরোবে। আমি তখন বললাম, আমিও সমুদ্রে যাব—হার্পুনার হব। শুনে খুব খুশী হল কুঈকোয়েগ। কথা দিল, আমি যে জাহাজে থাকব—সেও সেই জাহাজে উঠবে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তিমি শিকার করবে। ওর মত দক্ষ অভিজ্ঞ তিমি শিকারীকে পাশে পেলে আমিও বর্তে যাব।

গল্প শেষ হল, তামাক ফুরোলো। ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে আমরা সরে গেলাম বিছানার দুপাশে এবং ঘুমিয়ে পড়লাম তক্ষুনি।

## এক চাকার হাত গাড়ী

পরের দিন সকালে ম্যমী-মুণ্ডটা একজন নাপিতের কাছে গছিয়ে কুঈকোয়েগের উপহারের টাকা দিয়ে মিটিয়ে দিলাম দুজনের হোটেল বিল। এই সেদিন যাকে দেখে আঁৎকে উঠেছিলাম, তার সঙ্গে হঠাৎ আমার এত বন্ধুত্ব দেখে সরাইখানার সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল।

মাল বইবার জন্যে একটা এক চাকার হাতগাড়ী ভাড়া করে জিনিসপত্র চাপালাম তাতে। গাড়ী ঠেলে নিয়ে চললাম জাহাজ ঘাটার দিকে। রাস্তার লোকরা অবাক চোখে চেয়ে রইল আমাদের পানে। নরখাদক অসভ্য পথেঘাটে দেখা যায়—কিন্তু সাদা মানুষের সঙ্গে তাদের এত দহরম-মহরম দেখা যায় না। আমি ভ্রূক্ষেপ করলাম না। গল্প করতে করতে চললাম জাহাজে চড়তে।

কুঈকোয়েগের হার্পুনটা কেবলি হেলে পড়ছিল। প্রতিবারই ও সেটা সিধে করে দিচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হার্পুন নিয়ে এত ঝঞ্ঝাটের দরকার কী? জাহাজে কি হার্পুন থাকে না? ও বললে, থাকে—তবে নিজের হার্পুনটার ওপর আস্থা বেশী—তিমি-হৃৎপিণ্ড নির্ভুল লক্ষ্যে বিদ্ধ করার একটা মজার গল্প বলল কুঈকোয়েগ। জীবনে প্রথম এক চাকার হাত গাড়ী চালানোর গল্প। কোকোভোকো দ্বীপ থেকে পালিয়ে এসে সাগবন্দরে

নেমেছে সে। ভারী কাঠের বাক্স বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এক চাকার হাত গাড়ী দেওয়া হয়েছে তাকে। কুঈকোয়েগ বাক্সটা হাত গাড়ীর ওপর বেশ করে বেঁধে পুরো গাড়ীটাই বয়ে নিয়ে চলল কাঁধের ওপর তুলে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—"রাস্তার লোক তোমাকে দেখে হাসেনি?"

ও তখন আরেকটা মজার গল্প শোনালো। কোকোভোকো দ্বীপে এক জাহাজী ক্যাপ্টেন এসেছেন তার বোনের বিয়েতে। বোনের বয়স দশ। বিয়ে উপলক্ষ্যে তুম্বার খোলে নারকেলের জলভরা আছে। ঠিক যেন পান পাত্র। প্রথা মত, খোল ভর্তি জল তুলে দেওয়া হল ক্যাপ্টেনের হাতে। তারপর রাজা তাতে আঙুল ডুবিয়েছে, তাঁকেও ডোবাতে হবে। গম্ভীর-ভাবে তিনি সবকটা আঙুল ডুবিয়ে বেশ করে ধুয়ে নিলেন কব্জি ডুবিয়ে খাবেন বলে।

কুঈকোয়েগ বলল—"এবার তুমিই বলো, সেদিন দেশশুদ্ধ লোক ক্যাপ্টেনের কাণ্ড দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েনি?"

যাই হোক, জাহাজের ভাড়া মিটিয়ে মালপত্র নিয়ে উঠলাম ডেকের ওপর। পাল তুলে দিয়ে জাহাজ ভেসে চলল নদীপথে। একদিকে বরফ ছাওয়া হিমেল নিউ বেডফোর্ড শহর। সারি সারি তিমি ধরা জাহাজ ভাসছে নোঙর বাঁধা অবস্থায়। আরেক দিকে ছুতোরদের যন্ত্রপাতির আওয়াজ—জাহাজ মেরামত হচ্ছে, নতুন জাহাজ তৈরী হচ্ছে। অভিযান শেষ হয়েছে—আবার শুরু করার আয়োজন চলছে। ফি বছরেই এই একই দৃশ্য, একই আওয়াজ; বিরাম নেই, শেষ নেই।

খোলা হাওয়ায় পাল উড়ছে পত পত করে। মাস্তল দুটো বেতের মত নুয়ে পড়ছে। গলুইয়ের সামনে সাদা ফেনা হয়ে জল সরে যাচ্ছে।

ডেকের ওপর এক দঙ্গল লোক মজা করছিল আমাদের নিয়ে। চিত্র-বিচিত্র জংলীর সঙ্গে সাদা মানুষের গলায়-গলায় বন্ধুত্ব দেখে ওদের পেটে খিল ধরে যাচ্ছে হাসতে হাসতে। আমি দেখেও ভ্রূক্ষেপ করিনি। কিন্তু একটা ছোকরা বেশী এগিয়ে মুখ ভেংচেছিল কুঈকোয়েগের পেছন থেকে। কুঈকোয়েগ তা দেখে ফেলল।

পরক্ষণেই ছোকরার হাত ধরে হ্যাচকা টানে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় কাছে টেনে আনল কুঈকোয়েগ এবং বিপুল শক্তিভরে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। ছোকরার আয়ুর জোর ছিল বলেই শূন্যপথে ডিগবাজী খেয়ে এসে পড়ল পায়ের ওপর এবং "ক্যাপটেন! ক্যাপটেন" করে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটল ডেকের ওপর দিয়ে।

কুঈকোয়েগ কিন্তু ওকে ছুঁড়ে দিয়ে আর ফিরে তাকায়নি। পেছন ফিরে বসে পাইপ টানছিল।

ছুটে এলেন ক্যাপ্টেন। হেঁকে বললেন কুঈকোয়েগকে—"এ্যাও!...কি ভেবেছো তুমি? ..ছোকরা যদি মরে যেতো?"

আমার দিকে আস্তে আস্তে ফিরে শুধোলো কুঈকোয়েগ—"কি বলছে?"

"বলছে যে ছেলেটাকে তুমি আর একটু হলে মেরে ফেলতে।"

"মেরে ফেলতাম!" ঘৃণায় উল্কী আঁকা মুখ কুঁচকে বললে কুঈকোয়েগ। "কুঈকোয়েগ ছোট মাছ মারে না—বড় তিমি মারে!"

আর যায় কোথা! তুর্কীনাচ নেচে গর্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন—"খবরদার! খুন করে ফেলব ফের যদি বাঁদরামি দেখি জাহাজের ওপর! হুঁশিয়ার!"

কিন্তু ক্যাপ্টেনের নিজেরই তখন হুঁশিয়ার হওয়ার সময় হয়েছিল। তাই মূল মাস্তুলের ওপর হাওয়ায় প্রচণ্ড চাপে ছোট পালটা সশব্দে গেল ছিঁড়ে। তৎক্ষণাৎ পালের নিচের দিকে যে লম্বা ডাণ্ডাটা থাকে, সেটা ভীমবেগে দুলতে লাগল ডাইনে-বাঁয়ে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। দমাস করে ডাণ্ডার ঘায়ে ছোকরাটা ছিটকে বেরিয়ে গেল ডেকের বাইরে—জলের মধ্যে।

হুড়মুড় করে জাহাজের যাত্রীরা জড়ো হল নিরাপদ দূরত্বে। কিন্তু দুলন্ত ডাণ্ডাকে ধরবার সাধ্য নেই কারো। কে যাবে সামনে? যে যাবে তাকেই ডাণ্ডার ঘায়ে ছিটকে যেতে হবে জলে।

মুহূর্তের মধ্যে হেঁট হয়ে বসে পড়ল কুঈকোয়েগ। গুঁড়ি মেরে দুলন্ত ডাণ্ডার তলা দিয়ে গিয়ে একগোছা দড়ির এক মুখ বাঁধল মাস্তুলের গোড়ায়—দুলন্ত ডাণ্ডা ভীষণবেগে মাথার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময়ে দড়ির আরেকটা প্রান্ত ফাঁসের মত ছুঁড়ে দিল ডাণ্ডার ওপর দিয়ে। হ্যাঁচকা টানে স্থির হয়ে গেল ডাণ্ডার পেণ্ডুলাম দুলুনি। বোট নামানোর আয়োজন করছেন ক্যাপ্টেন। জামা খুলে ফেলল কুঈকোয়েগ। ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন করে টুপ করে লাফ দিলে জলে। মিনিট তিনেক সাঁতরেও ছোকরাকে না পেয়ে লম্বালম্বিভাবে ডুব দিল তলায়। অনেকক্ষণ পরে উঠে এল ওপরে—এক হাত সামনে বিস্তৃত—আরেক হাতে ধরা একটা নিস্পন্দ দেহ।

বোট এগিয়ে গেল কাছে। দুজনকে তুলে নিল ওপরে। জাহাজে উঠতেই ক্ষমা চাইলেন ক্যাপ্টেন। কুঈকোয়েগ কিন্তু পরিষ্কার জল ছাড়া কিছু চাইল না—মেডেল নয়, পুরস্কার নয়, বাহবা নয়। গায়ের লোনা ক্লেদ পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুকনো জামাকাপড় পরে পাইপ টানতে লাগল রেলিংয়ে হেলান দিয়ে। আধবোজা চোখে তাকিয়ে যেন এই কথাই বলছিল মনে মনে—

"দেওয়া-নেওয়া নিয়েই এই সংসার    আমরা নরখাদকরা এইভাবেই সাহায্য করব খৃস্টানদের।"

## নানটাকেট

যাওয়ার পথে উল্লেখ করার মত কিছু ঘটল না। যথা সময়ে নির্বিঘ্নে পৌঁছোলাম নানটাকেট।

নানটাকেট! ম্যাপ বার করুন—সমুদ্র দেখুন। দেখুন পৃথিবীর কোন কোণে একাকী অবস্থিত এই দেশ। মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন—এডিস্টোন লাইট হাউসের চাইতেও নিঃসঙ্গ। দেখুন, ভাল করে দেখুন। কি দেখছেন? সামান্য একটা টিলা আর বালির স্তূপ। সবটাই সমুদ্র সৈকত—পশ্চাদ ভূমি নেই। ব্লটিং পেপারের বদলে যদি বালি ব্যবহার করেন—নানটাকেট-য়ের বালি বিশ বছরেও ফুরোবে না। ঐ ঝোপঝোড় আগাছা দেখছেন, ওগুলো নাকি ওখানে জন্মায়নি—আমদানী করতে হয়েছে কানাডার মাটি থেকে। সমুদ্র পেরোতে হয়েছে এক মুঠো মাটির জন্যে।—কেন না, তেলের পিপে ফুটো হলে দরকার হয় এই মাটির। রোম নগরীতে ক্রুশ কাঠ যেভাবে ভক্তি ভরে বহন করা হয়, নানটাকেট শহরে নাকি কাঠের টুকরো বয়ে নিয়ে আসা হয় সেইভাবে। ওখানকার মানুষ নাকি বাড়ীর সামনে ব্যাঙের ছাতা পুঁতে দেয় গরমকালে ছায়া পাবে বলে। সেখানে একটি ঘাসের পাতা পাওয়া নাকি মরুদ্যান পাওয়ার সামিল বললেই চলে—সারাদিন হেঁটে যদি তিনটি ঘাসের পাতা পান—তাহলে তা তৃণ প্রান্তরের সামিল। ওখানকার মানুষ নাকি চোরাবালির ভয়ে বিশেষ জুতো পরে—যেমনটি পরে ল্যাপ-ল্যাণ্ডের মানুষরা বরফ জুতো। সামুদ্রিক কচ্ছপের পিঠে যেমন সামুদ্রিক গুল্ম লেগে থাকে—তাদের টেবিল চেয়ারেও নাকি সেই রকম গুল্ম লেগে থাকে বারো মাস—কারণ মাঝে মাঝে দুরন্ত সমুদ্র চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে ঝাঁপিয়ে পড়ে দ্বীপের মধ্যে—গৃহে অন্তরীন থাকতে হয় দিনের পর দিন।

লাল-মানুষরা কিভাবে এই দ্বীপে আস্তানা নিল, সেই কিংবদন্তীও কম চমকপ্রদ নয়। অনেক বছর আগে নিউ ইংলণ্ডের উপকূল থেকে একটি ইণ্ডিয়ান শিশুকে ছোঁ মেরে তুলে আনে প্রকাণ্ড একটা ঈগলপাখী। শিশুর আত্মীয়-স্বজন ক্যানো নৌকো নিয়ে সেই দিনই বেরিয়ে পড়ল ছেলের খোঁজে। ঈগলপাখী যেদিকে দিগন্তে উড়ে গেছে, সেইদিকে যেতে যেতে পাওয়া গেল

বালুময় এই দ্বীপ আর একটা শ্বেতশুভ্র অস্থি-পেটিকা—রেডইণ্ডিয়ান শিশুর কংকাল।

সেই থেকে লাল-মানুষরা ঘরবাড়ী বানিয়ে নিল এই ঊষর দ্বীপে। প্রথমে খিদের জ্বালায় বালি থেকে কাঁকড়া, গুগলি, শামুক নিয়ে খেত। দেহেমনে একটু জোর এলে জাল ফেলে ধরল ম্যাকারেল মাছ; অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর নৌকো নিয়ে গিয়ে ধরে আনল কড মাছ। অবশেষে জাহাজ বাহিনী নিয়ে জয় করতে বেরোলো জলময় দুনিয়াকে—কতবার যে বেড় দিল জল-পৃথ্বীকে—তার হিসেব নেই; উঁকি দিল বেরিং অন্তরীপে এবং সব ঋতুতে সব মহাসাগরে অন্তহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেল মহাশক্তিমান, ভীষণ হিংস্র, অতিশয় ক্রুর লোনা জলের ম্যাসটোডন (হাতীর চেয়েও বড় অধুনালুপ্ত প্রাণী) হিমালেহানের সঙ্গে—যারা তেড়ে আসছে শুনলেই নিঃসীম আতংকে হাড় হিম হয়ে আসে—লড়বার কথা খেয়াল থাকে না।

এইভাবে সমুদ্র-তাপস এই নানটাকেটবাসীরা সমুদ্রমধ্যস্থ এই পিপীলিকা-পাহাড় থেকে বহুবার জল দুনিয়া বিজয় করে এল—বহু দিগ্বীজয়ী আলেকজাণ্ডারের পক্ষেও যা সম্ভব নয়। আটলাণ্টিক, প্রশান্ত, ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে তাদের বাহিনী ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে—তিন তিনটে হার্মাদ বাহিনী লুঠ করে এল পোল্যাণ্ড। টেক্সাসের সঙ্গে মেক্সিকোকে জুড়ে দিক আমেরিকা, কিউবাকে স্তূপাকারে রাখুক কানাডার ওপর, সারা ভারতবর্ষে তাণ্ডব নাচ নাচুক ইংরেজরা—তবুও জানবেন ভূগোলকের দুই তৃতীয়াংশে আধিপত্য থেকে যাবে নানটাকেটবাসীদের। কেন না সমুদ্রই তাদের বাড়ী-ঘরদোর। সম্রাট যেমন সাম্রাজ্যের অধিপতি—সমুদ্রের অধিপতি তেমনি এরা। অন্যান্য যাত্রীদের শুধু একটাই অধিকার আছে—সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাওয়ার—তার বেশী নয়। সওদাগরী জাহাজ দেশে দেশে সেতু রচনা করছে, যুদ্ধ-জাহাজ ভাসমান দুর্গ হয়ে যাচ্ছে, জলদস্যুরা ডাঙার ডাকাতের মতই অন্যান্য জাহাজ লুঠ করছে। কিন্তু সমুদ্রের তলহীন অতল থেকে জীবিকা আহরণ কেউ করে না। করে এই নানটাকেটবাসীরা। তারা দামাল সমুদ্রের সঙ্গে দাঙ্গা করে, বাইবেল-বর্ণিত ভাষায় জাহাজের সঙ্গেই অতলে তলিয়ে যায়। এই সমুদ্রই তাদের বাড়ী, এই সমুদ্রই তাদের জীবিকা, এই তাদের ব্যবসাক্ষেত্র। নোয়ার মহাপ্লাবনে চীনদেশের কোটি কোটি মানব ভেসে যেতে পারে—এদের কিছু হবে না। সবুজ মাঠের মোরগ যেমন মাঠে বিচরণ করে—এরা তেমনি বিচরণ করে নীল সমুদ্রে। লুকোয় ঢেউয়ের আড়ালে, চড়ে ঢেউয়ের মাথায়—যে কোনো পর্বতারোহীর মতই। বছরের

পর বছর ডাঙার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। তাই যখন ডাঙায় ফিরে আসে— মনে হয় চাঁদ এসে নামল পৃথিবীর বুকে। সমুদ্রেই ভাসে, সমুদ্রেই ঘুমোয়— বালিশের তলায় দলে দলে খেলা করতে থাকে সিন্ধুঘোটক আর তিমি মাছ।

## চৌডার

স্পাউটার-ইন সরাইখানার মালিক তার এক দূর সম্পর্কের ভাইয়ের সরাইখানায় উঠতে বলেছিল আমাদের। ভাইয়ের নাম, হোসি হসে। সরাইখানার নাম ট্রাই-পট্স্। ওখানকার চৌডার নাকি বিখ্যাত। জিভে জল এসে যায়।

জাহাজ থেকে যখন নামলাম, রাত হয়েছে। খাওয়া আর ঘুম ছাড়া কিছু করবার নেই। তাই খুঁজতে বেরোলাম ট্রাই-পট্স্ সরাইখানা। খুঁজে খুঁজে বেদম হয়ে শেষকালে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে বুঝলাম সরাইখানাটি পাওয়া গেছে।

জিনিসটা একটা জাহাজের মাস্তুল। উঁচু মাস্তুল। একটা বাড়ীর সামনে পোঁতা হয়েছে মাস্তুলটা—কিন্তু আড়াআড়িভাবে লাগানো ডাণ্ডার দুপাশ করাত দিয়ে কেটে ছোট করা হয়েছে। ফলে, জিনিসটাকে দেখতে হয়েছে ফাঁসি কাঠের মত। ঐ রকম ফাঁসি কাঠ, বাড়ীর সামনে কালো রঙ করা দু'দুটো প্রকাণ্ড কাঠের পিপে আর হোসি হসে-র ভাই 'কফিন' নামের স্মৃতি —এই সবকটির সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমার গা ছমছম করে উঠল— মনে হল করাত দিয়ে কাটা ঐ আড়াআড়ি ডাণ্ডার একদিকে ঝুলব আমি— আরেক দিকে কুঈকোয়েগ।

বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে লাল পশমের সার্টপরা উস্কো টাইপের একজন পুরুষ আর হলদে গাউন পরা একজন হলদে-চুলো স্ত্রীলোক। মাথার ওপর কাণা চোখের মত জ্বলছে একটা লাল বাতি। স্ত্রীলোকটি তেরেমেরে কথা বলছে লোকটার সঙ্গে।

"বেরোও…এখুনি যাও…নইলে তোমার একদিন কি আমার একদিন।"

আমি বললাম—"কুঈকোয়েগ, চলে এসো। উনিই মিসেস হোসি হসে।"

অনুমান অভ্রান্ত প্রমাণিত হল। সরাইখানার মালিক হোসি হসে কাজে বেরিয়েছেন—খদ্দের সামলানোর ভার দিয়ে গেছেন গিন্নীকে। খাণ্ডারনী মহিলা। লোকটাকে ধমক দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের কথা শুনে নিলেন, ভেতরে নিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন—"ক্লাম, না, কড?"

হকচকিয়ে প্রশ্ন করলাম—"তার মানে?"

"ক্লাম, না, কড?" মিসেস হুসের তখন মন পড়ে রয়েছে বাইরের লোকটার দিকে।

"এত রাতে ক্লাম? নিশ্চয় ঠাণ্ডা হবে?"

লোকটাকে ঝেড়ে কাপড় পরানো বাকী রয়েছে। তাই মিসেস তখনো পালাতে পারলে বাঁচেন। তাই শুধু 'ক্লাম' পর্যন্ত শুনেই ছুটে গেলেন রান্নাঘরের দরজায়। হেঁকে বললেন—"দু'থালা ক্লাম।" বলেই বায়ুবেগে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

নিঃশ্বাস ফেলে বললাম কুঈকোয়েগকে—"ওহে, একথালা নিলে হয় না? দুজনে খাওয়া যাবে?"

কিন্তু অচিরে ভুল ভাঙল রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা অপূর্ব সুগন্ধে। তারপরেই হাতাভর্তি ক্লাম-চৌডার এসে পৌছোলো সামনে। অহো! সে কি সুবাস! ক্লাম মাছের টুকরোগুলো বাদামের টুকরোর চেয়ে বড় নয়। সামুদ্রিক বিস্কুটগুঁড়ো দিয়ে মাখানো। নোনা শূওরের মাংস ফালিফালি করে কেটে সাজানো মাছের টুকরোর পাশে। সব কিছুর ওপর ছড়ানো প্রচুর মাখন এবং পরিমাণ মত নুন আর মরিচ।

দেখেই খিদে চড় চড় করে বেড়ে গেল। মিসেস হুসে-র 'ক্লাম, না, কড' প্রশ্নের রহস্যও পরিষ্কার হয়ে গেল। গোগ্রাসে থালা সাফ করে রান্না ঘরে গিয়ে অর্ডার দিলাম দু'থালা 'কড' দিতে।

আবার নাকে ভেসে এল সৌরভ—এবার অন্যরকম। তারপরেই এল আরেক প্রস্থ উপাদেয় আহার্য—এবার কড মাছের চৌডার।

ট্রাই-পটস্ সরাইখানা সত্যিই মেছো সরাইখানা। এখানকার ডেকচিতে চৌডার সবসময়েই ফুটছে। প্রাতরাশে চৌডার, দুপুরের খাওয়ায় চৌডার, রাতের খাওয়ায় চৌডার। খেতে খেতে মনে হবে এই বুঝি চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে এল মাছের কাঁটা। বাড়ীর চারদিকের জমিতে ক্লাম মাছের আঁশ ভর্তি। মিসেস হুসের গলায় কড মাছের শিরদাঁড়া দিয়ে তৈরী চকচকে নেকলেস। হিসেবের খাতা হাঙরের চামড়া দিয়ে বাঁধানো। কিন্তু দুধের মধ্যেও আঁশটে গন্ধ আসে কি করে, ভেবে অবাক হয়েছিলাম। তারপর একদিন সকালবেলা গিয়ে দেখি মাছের কাঁটা-মুড়ো খেতে দেওয়া হয়েছে মিসেস হুসের গরুকে, এবং চোখ বুঁজে সে কাঁটা চিবুচ্ছে কড মাছের মুড়োয় পা চাপিয়ে।

রাতের খাওয়া শেষ হল। মিসেস হুসে লণ্ঠন নিয়ে আমাদের এগিয়ে

দিলেন শোবার ঘরে। হার্পুনটা কিন্তু কেড়ে নিয়ে গেলেন কুঈকোয়েগের হাত থেকে। কারণ নাকি কিছুদিন আগে মদ খেয়ে ঘরে ঢুকে হার্পুনের ওপর আছড়ে পড়ে মারা গেছে একজন জোয়ান। সেই থেকে শোবার ঘরে হার্পুন নিয়ে ঢোকা নিষেধ এই সরাইখানায়।

## জাহাজ

বিছানায় শুয়ে পরের দিনের কার্যসূচী স্থির করলাম দুজনে। অবাক হলাম কুঈকোয়েগের কথা শুনে। সে নাকি এর মধ্যেই তার কাষ্ঠদেবতা য়োজো'র সঙ্গে পরামর্শ করেছে এ-ব্যাপারে। য়োজো-র হুকুম হয়েছে— দুজনকেই একই জাহাজে থাকতে হবে। তবে জাহাজ নির্বাচন করবে ইসমাইল।

য়োজো-র ওপর কুঈকোয়েগের অসীম আস্থার কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। য়োজো-র হুকুম ছাড়া কুটোটিও নাড়ে না সে। য়োজো তাকে বলে দেয় কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল।

যাই হোক, হুকুমটা য়োজো-র হোক কি কুঈকোয়েগেরই হোক, পরের দিন সকালবেলা আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম জাহাজঘাটা অভিমুখে। য়োজো-কে নিয়ে কুঈকোয়েগ বসে রইল ঘরে। সেদিন নাকি ওর উপোস অথবা আত্মনিগ্রহর দিন। ধুনি জালিয়ে কি যেন করতে লাগল য়োজো-র সামনে। ওর ভাষায় এর নাম রামাদান।

জাহাজঘাটায় গিয়ে তিনটে জাহাজ দেখলাম। ডেভিল-ড্যাম, টিট-বিট আর পিকুঅড। শেষের নামটা মনে পড়ছে? ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইণ্ডিয়ানদের বিখ্যাত সেই অধুনালুপ্ত জাত—প্রাচীন মেণ্ডিজ-দের মতই যা লোপ পেয়ে গেছে ধরাতল থেকে। ডেভিল-ড্যাম আর টিট-বিট জাহাজ দেখে শুনে গিয়ে উঠলাম পিকুঅড জাহাজের ডেকে এবং পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এই সেই জাহাজ যে জাহাজের ভাগ্যের সঙ্গে বিধাতা আমার ভাগ্য একসাথে বেঁধে দিয়েছেন।

অদ্ভুত গড়ন জাহাজ জীবনে অনেক দেখে থাকতে পারেন—কিন্তু এমনটি কখনো দেখেন নি। চৌকো-মুখ লাগার, পাহাড়-প্রমাণ জাপানী জাঙ্ক, মাখন-বাক্স গ্যালিঅট এবং এরকম আরো অনেক কিছু। কিন্তু বিশ্বাস করুন, বুড়ো পিকুঅডের মত এমন কিম্ভূতকিমাকার জাহাজ কখনো দেখেন নি। জাহাজটা পুরোনো কায়দায় তৈরী, আকারে ছোটখাট, কিন্তু শ্বাপদের থাবার মত। ঝড় জল রোদে মজবুত, চার সমুদ্রের অনেক তুফান মাথার

ওপর দিয়ে গেছে, ফরাসী গোলন্দাজের গায়ের রঙের মত কালচে মেরে গেছে পুরোনো খোল। যেন দাড়ি গজিয়েছে গলুইতে। মাস্তুলগুলো কোনন রাজাদের খাড়া শিরদাঁড়ার মত আড়ষ্ট ভাবে সটান মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আকাশ পানে—যদিও মূল মাস্তুলটা খোয়া গেছে অতল দরিয়ায়, ঝড়ের প্রকোপে। ক্যাণ্টারবেরী ক্যাথিড্রালের যেখানে বেকেট রক্তাপ্লুত দেহে শুয়েছিল—যেখানকার পাথর তীর্থযাত্রীরা যুগযুগান্তর ধরে ধুয়ে বলিরেখার মত কুঞ্চিত করে তুলেছে—পিকুঅড জাহাজের মান্ধাতা আমলের ডেকের চেহারা অবিকল সেই রকম। এ-হেন বুড়ো চেহারা নিয়ে একটানা পঞ্চাশ বছর ধরে দুর্দান্ত তিমি অভিযানে বেরোচ্ছে পিকুঅড—বিরাম নেই এক বছরের জন্যেও।

ক্যাপ্টেন পেলেগ এককালে এ-জাহাজের চীফ-মেট ছিলেন, এখন অবসর নিয়েছেন। পরে আরেকটা জাহাজ তিনি বানিয়েছিলেন। কিম্ভূতকিমাকার পিকুঅড জাহাজের পরিকল্পনাও তাঁর। ইথিওপিয়ার বর্বর মহারাজদের মতই জাঁকালো সাজসজ্জা পিকুঅডের। হাড়ের মালা ঝুলছে যেন গলায়। অগুন্তি মেডেলের অধিকারী এই জাহাজ। জাহাজের মধ্যে নরখাদক-জাহাজ। খোলা ডেক স্পার্ম-তিমির ব্যাদিত চোয়ালের মত টানা লম্বা এবং ঝকঝকে খুঁটিগুলো যেন ধারালো লম্বা দাঁতের সারি। হালের চাকা হাড়ের তৈরী। তিমির আস্ত চোয়ালের হাড়। যুগ যুগ ধরে যাদের ধাওয়া করছে পিকুঅড, বধ করছে অথই জলে—তাদেরই একটির চোয়াল খুদে নির্মিত অপরূপ এই চাকা। এ-চাকা যে খামচে ধরে, তার মনে হয় যেন তিমির চোয়াল খামচে ধরেছে। সম্ভ্রান্ত জাহাজ—কিন্তু বড় বিষণ্ণ! দুটোই অবশ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত জীবনের সর্বক্ষেত্রে। যেখানে সম্ভ্রম—সেখানেই বিষাদ!

ডেকে উঠে ভাবছি কার সঙ্গে কথা বলব, এমন সময়ে একটা অদ্ভুত তাঁবু দেখলাম। তাঁবু না বলে জিনিসটাকে রেড ইণ্ডিয়ানদের চামড়ার কুঁড়ে বললেও চলে। রাইট-তিমির চোয়াল দিয়ে তৈরী কুঁড়ে। গোড়ার দিকে চওড়া হয় চোয়ালগুলো—আগার দিকে ছুঁচোলো এবং ভেতর দিকে হেলানো। বিরাট আকারের এই রকম অনেকগুলো চোয়াল চক্রাকারে গোড়ার ওপর বসানো ডেকেতে এবং চামড়া দিয়ে মোড়া। সব মিলিয়ে ফুট দশেক উঁচু।

তেকোণা ফাঁক দিয়ে তাঁবুর মধ্যে দেখা যাচ্ছে চামড়ার চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় এক বৃদ্ধকে। তাঁবুর ভেতরে বসে খরশান দৃষ্টি রেখেছে ডেকের ওপর। দু'চোখ ঘিরে চামড়া অতি-সূক্ষ্মভাবে মাকড়সার মিহিজালের মত কুঁচকে গুটিয়ে রয়েছে। ক্রমাগত সমুদ্রযাত্রা করলে এবং বাতাসের দিকে

চোখ রাখলে চোখের চারধারের চামড়া এইভাবেই কুঁচকে যায়। হঠাৎ দেখলে মনে হবে কোপদৃষ্টিতে ভ্রূকুটি হানছে মানুষটা।

তেকোণা দরজার দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"আমি কি পিকুঅডের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলছি?"

"কি চাই?"

"জাহাজে চাকরী চাই।"

"অ্যাঁ? জাহাজে চাকরী চাই? তিমি ধরা জাহাজে কাজ করেছো কোনো কালে?"

"না।"

"তিমি শিকার কি জিনিস জানা আছে?"

"আজ্ঞে না। তবে শিখে নেবো। বার কয়েক সওদাগরী জাহাজে সমুদ্র ঘুরে এসেছি—"

"গোল্লায় যাক সওদাগরী জাহাজ! ও জাহাজের নাম যেন আর না শুনি! ছুঁড়ে ফেলে দেবো জাহাজ থেকে! বড় জাঁক দেখাচ্ছো—সওদাগরী জাহাজে কাজ করা হয়েছে! অ্যাঁ! বলি, ব্যাপার কি হে? এখানে এসেছো কি মতলবে? কোন ক্যাপ্টেনের তবিল হাল্কা করেছো? আসল পেশা কি?—বোম্বেটে? জাহাজে উঠে অফিসার খুনের মতলব?"

ভীষণ প্রতিবাদ করলাম। কথাগুলো ব্যঙ্গের ছলে বললেও বুঝলাম লোকটা সন্দিগ্ধ প্রকৃতির এবং হুঁশিয়ার।

বললাম—"ওসব কিছু নয়। আমি দেখতে চাই তিমি শিকার কি জিনিস—দেখতে চাই সারা দুনিয়া।"

"বটে! বটে! তিমি শিকার দেখতে চাও? তার আগে বলো দিকি বাপু—ক্যাপ্টেন আহাবকে কখনো দেখেছো?"

"কে তিনি?"

"এ-জাহাজের ক্যাপ্টেন।"

"তাই বলুন। আমি ভেবেছিলাম আপনি ক্যাপ্টেন।"

"আমি ক্যাপ্টেন পেলেগ। আমি আর ক্যাপ্টেন বিলডাড এই জাহাজের মালিক। জাহাজের দেখাশুনো করা আর লোকজন রাখার ভার আমাদের। বাপু হে, ক্যাপ্টেন আহাবের একখানা পা দেখলেই বুঝবে তিমি শিকার কাকে বলে।"

"আর একটা পা বুঝি তিমি নিয়েছে?"

"নিয়েছে মানে? কামড়ে, চিবিয়ে, কড়মড় করে গুঁড়িয়ে ফোঁৎ

করে গিলে খেয়েছে—যেভাবে স্পার্ম-তিমিরা নৌকো চিবোয়—ঠিক, সেই ভাবে।"

প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে কথাগুলো বললেন ক্যাপ্টেন পেলেগ। শুনে আঁৎকে উঠলাম আমি।

তবুও বললাম শান্ত কণ্ঠে—"ঐ একটা তিমিই হয়ত এইরকম হিংস্র। তবে আমি বলব, দুর্ঘটনা যখন তখন ঘটতে পারে।"

"ছোকরা! কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে ফুসফুস এখনো পাকে নি। সমুদ্রের লোনা হাওয়া ফুসফুসে পৌঁছেছে বলে তো মনে হয় না।"

"ক্যাপ্টেন, আগেই বলেছি আপনাকে আমি সমুদ্র গেছি চারবার সওদাগরী—"

"চোপরাও! ফের ঐ কথা?...মাথা গরম করে দিও না বলছি।—তিমি শিকার করতে চাও?"

"আজ্ঞে।"

"তিমির গলায় হারপুন ছুঁড়ে দিয়ে পেছন পেছন লাফ দিতে পারবে?"

"যদি দরকার হয়—পারবো।"

"বেশ...বেশ। দুনিয়াটাও দেখতে চাও, কেমন? যাও দিকি বাপু ঐ গলুইয়ের সামনে। এসে বলো কি দেখলে।"

আমি ঘুরে এসে বললাম—"শুধু জল। জোয়ার এসেছে—জাহাজ বার-দরিয়ায় যেতে চাইছে।"

"চমৎকার। শুধু জল দেখলে, কেমন? কেপ হর্ণ ছাড়িয়ে আর কি দেখবার আশা করো? দুনিয়া দেখা তো হয়ে গেল।"

আমি হকচকিয়ে গেলাম। কিন্তু লেগে রইলাম ছিনে জোঁকের মত। শেষকালে ক্যাপ্টেন রাজী হলেন আমার জেদ দেখে। বললেন—"চলো, কাগজপত্র সই করবে।"

ডেকের নীচে কেবিনে ঢুকে একজন অদ্ভুত পুরুষকে অদ্ভুতভাবে বসে থাকতে দেখলাম জানলার গোবরাটে। বয়সে বৃদ্ধ, চোখে চশমা, মেদহীন পাকানো শরীর। তন্ময় হয়ে একটা মোটা বই পড়ছেন সুর করে।

ইনিই এ-জাহাজের অন্যতম মালিক—ক্যাপ্টেন বিলডাড। বেশীর ভাগ শেয়ারের অধিকারী ইনি আর পেলেগ। বাদবাকী শেয়ারের মালিক নানটাকেট-য়ের বুড়ো নাবিকরা, বিধবা বউরা, অনাথ ছেলেমেয়েরা। কারো ভাগে পড়ে একখানা তক্তা, কারো ভাগে দুখানা পেরেক। কিন্তু তবুও প্রত্যেকে তিমি শিকারের ব্যবসায় টাকা লগ্নী করে লভ্যি অর্থ দিয়ে।

ক্যাপ্টেন বিলডাড সম্বন্ধে অনেক কথা আগেই শুনেছিলাম। লোকটা এ-অঞ্চলের আদি বাসিন্দা কোয়াক-দের বংশধর। সেইরকম জেদী, তেজী এবং কর্মঠ। ছেঁড়া জামা পরে কেবিন-বয়ের চাকরী নিয়ে কাজে ঢুকেছিলেন; তারপর ক্রমে ক্রমে হয়েছেন হার্পুনার, বোটের সর্দার, চীফ-মেট, ক্যাপ্টেন—সবশেষে জাহাজের মালিক। ষাট বছর বয়সে প্রচুর অর্থ ও সম্মান নিয়ে অবসর নিয়েছে। এখন ধর্মচর্চা তাঁর অধিকাংশ সময় ভরিয়ে রাখে।

কর্মজীবনে এই মানুষটিই কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। জীবনে কাউকে গাল দেন নি। কিন্তু হিমেল চাহনি হেনে মানুষকে খাটিয়ে নিতেন নিষ্করুণ ভাবে। শোনা যায়, জাহাজ জেটিতে ফিরে আসার পর কর্মচারীরা অতিরিক্ত খাটুনির দরুন ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়ে ডাক্তারের কাছে দৌড়োতো। উনি নিজে কিন্তু বসে থাকতেন না। খাটতেন উদয়াস্ত। তাই গায়ে এককণা চর্বিও লাগতে দেননি।

এহেন ক্যাপ্টেন বিলডাড জানলার গোবরাটে বসে ধর্মগ্রন্থ পড়ছেন দেখে টিটকিরি দিলেন ক্যাপ্টেন পেলেগ—"কি হে বিলডাড, তিরিশ বছরেও মোক্ষলাভ হল না? আর কত পড়বে?"

ক্যাপ্টেন বিলডাড এ ধরনের শ্লেষ অনেক শুনেছেন। তাই গায়ে মাখলেন না। চোখ তুলে তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন আমার আপাদমস্তক।

পেলেগ বললেন—"ছোকরা চাকরী চায়।"

"তাই নাকি?" উদাসীন কণ্ঠে বললেন বিলডাড আমার দিকে তাকিয়ে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" বললাম আমি।

"কি মনে হয় তোমার? চলবে?" শুধোলেন পেলেগ।

"চলবে।" বলে চোখ নামালেন বইয়ের পাতায়—শুরু হল স্তোত্রপাঠ।

সিন্দুক খুলে দোয়াত, কলম, কাগজ বার করে টেবিলে সাজিয়ে রাখলেন পেলেগ। আমার লভ্যাংশ কত স্থির হবে, এই নিয়ে মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, মোট লাভের ২৭৫ ভাগের এক ভাগ পাওয়া উচিত আমার। তিন বছরের থাকা খাওয়ার খরচ তো লাগছে না। তিমি শিকারের জাহাজে মাইনে দেওয়ার রেওয়াজ নেই। কাজের গুরুত্ব অনুসারে মোট লাভের একটা ভাগ দেওয়া হয়। চলতি ভাষায় তার নাম 'লে'।

ক্যাপ্টেন পেলেগ ছুরি বার করে কলমের ডগা কাটছিলেন। বিলডাড একমনে বাইবেল পড়ছেন। এই দুজনের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে আমার মেহনতের লভ্যাংশ। মনে মনে আশা আছে, দুশ ভাগের এক ভাগ 'লে' পেলেও পেতে পারি। কারণ আমার চেহারাটা তো বিশাল।

পেলেগ জিজ্ঞেস করলেন বিলডাডকে—"ছোকরাকে কত 'লে' দেব?"

"সাতশ সাতাত্তর ভাগের এক ভাগ।"

শুনেই বুঝলাম এ বড় কঠিন ঠাঁই। এত কম 'লে'? এক ফার্দিংকে সাতশ সাতাত্তর ভাগ করলে এক ভাগে কি থাকে?

খেপে উঠলেন পেলেগ—"নিকুচি করেছে তোমার! ছোকরাকে ঠকাতে চাও নাকি? আরও বেশী 'লে' পাওয়া উচিত ওর।"

"সাতশ সাতাত্তর ভাগের এক ভাগ", শান্ত কণ্ঠ বিলডাডের। "তার বেশী দিতে গেলে বিধবা আর অনাথ ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করতে হয়।"

তারস্বরে চেঁচিয়ে বললেন পেলেগ—"ওসব জানি না···একে আমি তিনশ ভাগের এক ভাগ দেব।"

বাইবেল নামিয়ে রেখে প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন বিলডাড—"তোমার মনটা দরাজ। কিন্তু বিধবা আর অনাথদের কথা মনে রেখো।—মহাপাপ হবে। শেষ পর্যন্ত নরক না যেতে হয়।"

ব্যস! তুরুক্ক নাচ নেচে উঠলেন পেলেগ।—"কি! আমাকে নরক দেখাচ্ছে! নরকে তুমি যাও—বুড়ো শয়তান কোথাকার!"

বলেই দুমদাম করে তেড়ে গেলেন বিলডাডের দিকে। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় পাশ কাটিয়ে গেলেন বিলডাড।

আমি দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়ালাম। ভেবেছিলাম, এবার নিশ্চয় চম্পট দেবেন বিলডাড। কিন্তু অবাক হলাম। ফের গোবরাটে গিয়ে বসলেন তিনি। পেলেগের আস্ফালন তাঁর জানা আছে। পেলেগও বেদম হয়ে পড়েছিলেন একবার তেড়ে গিয়েই। শান্তশিষ্ট মেষশাবকের মত টেবিলে বসে বললেন—"ছুরিটায় একদম ধার নেই। বিলডাড, তুমি বর্শা ছুঁচোলো করতে পারতে চমৎকার। কলমটা কেটে দাও তো।—তিনশ ভাগের এক ভাগ দিচ্ছি ছোকরাকে।"

যে জাহাজের দুই কর্তার মধ্যে এইরকম সম্পর্ক, সে জাহাজে চাকরী করা উচিত হবে কি? বিলডাড কিন্তু যেন আর শুনতেই পেলেন না।

আমি বললাম—"আমার এক বন্ধু যেতে চায় এই জাহাজে।"

"কত 'লে' নেবে?" ফস করে বলে উঠলেন বিলডাড।

"তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না," খ্যাক করে উঠলেন পেলেগ। আমাকে বললেন—"তিমি শিকার করেছে তোমার বন্ধু?"

"অনেকবার।"

"নিয়ে এসো।"

কাগজপত্রে সই করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। মন বলল, য়োজো ঠিক জায়গায় এনে ফেলেছে আমাকে।

হঠাৎ মনে হল, ক্যাপ্টেন আহাবকে তো দেখা হল না। যাঁর সঙ্গে তিন বছর থাকতে হবে, তাঁকে না দেখে যাই কি করে?

ফিরে গিয়ে ক্যাপ্টেন পেলেগকে আমার অভিপ্রায় বললাম। উনি বললেন—"কি হবে দেখা করে? চাকরী তো পেয়েছ।"

"তা পেয়েছি। কিন্তু তাঁকে দেখতে চাই।"

"দেখা পাবে না। আমিই পাচ্ছি না—তুমি কি করে পাবে। কি যে হয়েছে ওঁর, বাড়ী থেকে একদম বেরোন না।—তবে হ্যাঁ, আহাব লোক খুব ভাল। দেবতা বললেই চলে। ধার্মিক না হলেও সোজা মানুষ। কথা বলেন কম—যখন বলেন তখন শোনবার মত। ভয় নেই, তোমার পছন্দ হবে। নামটা কি রকম দেখতে হবে তো—আহাব—মুকুটধারী রাজা।"

"বদ্ রাজা। এত বদ্ যে মরবার পর কুকুরে তাঁর রক্ত চেটে খেয়েছিল।"

"আরে! আরে! এসব কথা যেন জাহাজে বলতে যেও না। আহাব নামটা কি ওঁর নিজের নেওয়া? বারো মাস বয়েসে মা মারা যায়—এ নাম মায়ের দেওয়া। কিন্তু মায়ের ইচ্ছে পূর্ণ হবে না। আহাব সে রকম মানুষই নন। বিলডাডের মত ধার্মিক—আমার মত সরল। হাসেন না কোনো কালে—বড্ড বেশী ভাবুক। বিশেষ করে সেই পাজী তিমিটা পা খেয়ে যাওয়ার পর থেকে সবসময়ে কি যেন ভাবেন। তাতে কী? হাসিখুশী অথচ বদ ক্যাপ্টেনের চাইতে গম্ভীর কিন্তু ভাল ক্যাপ্টেনের সঙ্গ ভাল নয় কি? তা ছাড়া তাঁর মিষ্টি বউ আছে, একটা বাচ্চাও আছে। এমন লোক কখনো খারাপ হয়? যাও, যাও, কিচ্ছু ভাবতে হবে না।"

চলে এলাম আমি। আহাব সম্বন্ধে মনের মধ্যে দানা বেঁধে রইল অজানা ভয়, সম্ভ্রম, সহানুভূতি আর অব্যক্ত যাতনা।

## রামাদান

কুইকোয়েগের রামাদান, উপবাস অথবা আত্মনিগ্রহ সারাদিন চলবে জানতাম। এ অবস্থায় কাউকে বিরক্ত করা উচিত নয়। কারো ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া কি ঠিক? পৌত্তলিক হলেও তার মনে যে বিশ্বাস আছে, তা খৃস্টধর্মের প্রতি আমার বিশ্বাসের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। তাই

সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরে বিকেল বেলা ফিরলাম ঘরে। ফিরে দেখলাম ঘরের দরজা বন্ধ।

চাবীর দরজা দিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। খাটের কোণা আর ঘরের একটা কোণে দাঁড় করানো কুঈকোয়েগের হার্পুন ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। হার্পুন যখন আছে, কুঈকোয়েগও আছে।

কিন্তু অনেক ধাক্কাধাক্কি ডাকাডাকি সত্বেও সাড়া এল না ভেতর থেকে।

ভাবনায় পড়লাম। ব্যাপার কী? মৃগী রোগে পড়ল নাকি কুঈকোয়েগ? আত্মনিগ্রহ কি চরমে উঠেছে?

ভয় পেয়ে দৌড়োলাম নীচে। ঝি-কে ডেকে সব কথা বললাম। সে বললে—সকালে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে দরজা বন্ধ দেখেছিল। এখনো রয়েছে।

কিন্তু হার্পুনটা তো কাল রাতে ঘরে ছিল না! জমা ছিল মিসেস হুসের কাছে। গেল কি করে ঘরের মধ্যে?

ঝি ততক্ষণে চেঁচাতে শুরু করেছে—"খুন! খুন!"

আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম গলার শির তুলে—"দরজা ভাঙো! কুঈকোয়েগ মরতে চলেছে! জলদি!"

চেঁচানি শুনে মিসেস হুসে এক হাতে সরষের বাটি এবং আর এক হাতে ভিনিগারের ডেকচি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। হার্পুন নিয়ে কুঈকোয়েগ ঘরে ঢুকেছে শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখলেন সিঁড়ির তলায়—সত্যিই হার্পুন নেই সেখানে।

সঙ্গে সঙ্গে চিলের মত চেঁচিয়ে উঠলেন তিনিও—"আবার সুইসাইড! ওরে কে আছিস! এখুনি রঙ মিস্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আয়! সাইনবোর্ডে লিখে দে—ঘরের মধ্যে ধূমপান বা আত্মহত্যা নিষেধ।"

আমি তেড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম দরজা ভাঙবার জন্যে। মিসেস হুসে দুহাত বাড়িয়ে পথরোধ করলেন।

"উঁহু! আমার বাড়ীর দরজা ভাঙা চলবে না! এক মাইল দূরে তালার মিস্ত্রী আছে—ডেকে আনো তাকে।—সবুর! নকল চাবী আমার কাছেই আছে মনে হচ্ছে।"

বলে, ভিনিগারের ডেকচি নামিয়ে রেখে কোমরের পকেট থেকে একটা চাবী বার করলেন ভদ্রমহিলা। চাবী ঘুরে গেল—তালা খুলে গেল—কিন্তু দরজা খুলল না। কুঈকোয়েগ খিল তুলে দিয়েছে ভেতর থেকে।

এবার আর হাত বাড়িয়েও মিসেস হুসে আমাকে আটকাতে পারলেন না। ভীমবেগে আছড়ে পড়লাম দরজার ওপর। মড়াৎ করে খিল ভেঙে

দুহাট হয়ে গেল দরজা। দরজার হাতলটা এত জোরে দেওয়ালে গেঁথে গেল যে চুণ বালি ভেঙে ছিটকে গেল কড়িকাঠের দিকে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে নিস্পন্দ দেহে বসে কুঙ্গীকোয়েগ। উরু মুড়ে বসে বিচিত্র আসনে। মাথার ওপর বসানো কাঠের দেবতা য়োজো। সিধে তাকিয়ে সামনে। চোখের পাতা পড়ছে না। ফিরেও তাকাচ্ছে না। একটানা দশ বারো ঘণ্টা এইভাবেই বসে আছে—দেহে প্রাণ আছে—কিন্তু চাঞ্চল্য নেই।

অদ্ভুত! এরই নাম রামাদান?

কত ডাকলাম, সাড়া দিল না কুঙ্গীকোয়েগ। মিসেস হুসেকে বললাম—"ও যখন বেঁচে আছে, আমি ওর ভার নিচ্ছি!"

রাত এগারোটা পর্যন্ত খাবার ঘরে বসে একদল সদ্য প্রত্যাগত তিমি শিকারীর মুখে অনেক গল্প শুনলাম। এরা ছোটখাট অভিযানে বেরিয়েছিল আটলান্টিকে! এরকম স্বল্প মেয়াদের অভিযানের নাম—প্লাম পুডিং অভিযান।

শোবার ঘরে এসে দেখি তাজ্জব ব্যাপার! তখনো খাড়া হয়ে বসে কুঙ্গীকোয়েগ। এক ইঞ্চিও নড়েনি!

ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিলাম। আমার গা থেকে খুলে ভালুকের চামড়ার পুরু জ্যাকেট ওর গায়ে জড়িয়ে দিলাম। কনকনে শীতের রাতে মেঝের ওপর একটা মানুষকে ঐভাবে বসিয়ে রেখে আমি বিছানায় শুলাম বটে, ঘুম এল অনেক দেরীতে।

ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙল। সূর্যের আলো ঘরে ঢুকতেই চোখ মেলে তাকাল কুঙ্গীকোয়েগ। মৃদু হেসে আমার কপালে কপাল ঠেকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

যে ধর্মবিশ্বাস অন্য মানুষকে এত উদ্বেগের মধ্যে রাখে, মনের শান্তি কেড়ে নেয়—সে সম্বন্ধে এবার কিছু বলা দরকার মনে করলাম। মনে মনে রাগও হয়েছিল খুব।

বললাম—"কুঙ্গীকোয়েগ, শোবে এস।"

পাশে এসে শুয়ে পড়ল কুঙ্গীকোয়েগ। আমি ওকে আদিমতম ধর্ম থেকে আধুনিক ধর্ম পর্যন্ত অনেক কথা বললাম। গভীর দৃষ্টি মেলে সব শুনে গেল সে। যখন বললাম, উপবাস স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর, আত্মার পক্ষে অশুভ এবং রামাদান করে শুধু লোক হাসানোই হয়—নিজের কিছু হয় না—তখনও কোনো প্রতিবাদ করল না। আমি বললাম—মানুষের হজমের গোলমাল

হলেই নরক কল্পনা জেগে ওঠে। এই রকম আত্ম নিপীড়ন করে, বদহজমে ভুগে, বিষাদ রোগে আচ্ছন্ন থাকে অনেক ধর্মবিশ্বাসী। জিজ্ঞেস করলাম—কুঈকোয়েগেরও এরকম বদহজমের ব্যায়রাম আছে কিনা।

ও বললে, একদম না। জীবনে একবারই বদহজম হয়েছিল অতিরিক্ত মানুষ খাওয়ার ফলে। যুদ্ধে জিতেছিল ওর বাবা। পঞ্চাশজন সৈন্যকে মেরে এনে তক্ষুণি রান্না করে খেয়ে নিয়েছিল সবাই মিলে।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। আমি জানি এরপর ও কি বলবে। নরখাদকদের এরকম প্রথার কথা আমার জানা আছে। যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদের দেহ নানারকম ফল মূল, নারিকেল, সব্জী দিয়ে সাজিয়ে আত্মীয়স্বজনদের বাড়ী ভেট পাঠায় যুদ্ধ জয়ের উৎসবের অঙ্গ হিসেবে।

ধর্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা কুঈকোয়েগের মনে কোনো রেখাপাত করেছে বলে মনে হল না। বরং, ধর্ম সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা ওকে খুব পীড়া দিয়েছে মনে হল। গভীর সমবেদনা এবং অনুকম্পা মিশোনো চোখে শুধু চেয়ে রইল আমার পানে।

চব্বিশ ঘণ্টার উপবাস উশুল করে নিল কুঈকোয়েগ। প্রাতরাশ খেল বেশ কয়েক থালা চৌডার। তারপর হালিবুট মাছের কাঁটা দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে দুজনে রওনা হলাম পিকুঅড জাহাজ অভিমুখে।

### লক্ষ্যভেদ

ডেকের ওপরকার চামড়ার কুঁড়ে থেকে পেলেগ দেখতে পেলেন আমাদের। হাঁড়ি গলায় তৎক্ষণাৎ কী চীৎকার তাঁর। আমার বন্ধুটি মানুষ-খেকো, আগে তা বলা হয়নি কেন? কাগজপত্র ঠিকঠাক না থাকলে নরখাদককে জাহাজে উঠতে দেবেন না তিনি।

অগত্যা আমি একাই উঠলাম ডেকে। জেটিতে হারপুন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুঈকোয়েগ।

"কি বলছেন বুঝলাম না," শুধোলাম পেলেগকে।

"তোমার বন্ধুর কাগজপত্র পরিষ্কার তো?"

উদাসীন কণ্ঠে বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন বিলডাড—পেলেগের ঠিক পেছনেই চামড়ার তাঁবুর মধ্যে বসেছিলেন উনি—"ও যে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, সেই কাগজ দেখাতে হবে।" বলে কুঈকোয়েগকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"ওহে অন্ধকারের ছানা, কোন্ গির্জেতে যাতায়াত আছে?"

জবাব দিলাম আমি। বললাম—"যে গির্জেতে সব ধর্মের সম্মেলন হয়, সেই গির্জেতে।"

"কী!" ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে উঠলেন বিলডাড—"ধর্মসভায় নরখাদক ঠাঁই পেয়েছে!" খপাৎ করে চশমা খুলে প্রকাণ্ড রুমাল দিয়ে কাঁচ-জোড়া মুছে নিলেন ক্যাপ্টেন, ফের চোখে লাগিয়ে গলুইয়ের ধারে গিয়ে কটমট করে চেয়ে রইলেন কুঈকোয়েগের পানে।

আমার দিকে ফিরে বললেন—"চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে না খুব বেশীদিন চার্চে যাতায়াত করছে? ঠিক কিনা?"

পেলেগ বললেন—"খৃস্টানই হয়েছে কিনা সন্দেহ। হলে মুখের ঐ কদাকার উল্কীগুলো তুলে ফেলত।"

"কোন গির্জেতে যাতায়াত আছে বলছিলে?" আমাকে প্রশ্ন করলেন বিলডাড।

"বললাম তো, যে গির্জেতে সব ধর্মের সম্মেলন হয়, সেই গির্জেতে।"

"সেটা কোথায়? কি নাম?" সন্দিগ্ধ চাহনি বিলডাডের।

কোণঠাসা হয়ে পড়লাম। গলা সাফ করে নিয়ে বললাম—"দেখুন স্যার, যে ক্যাথোলিক চার্চে আপনি, আমি, ক্যাপ্টেন পেলেগ, কুঈকোয়েগ এবং সব মায়ের ছেলেই জড়ো হয়—সেইখানে—আকাশের চাঁদোয়ার তলায় এই বিরাট বিশ্বমন্দিরে—সমস্ত জীবের উপাসনা মন্দিরে—আমরা সবাই সেই এক ঈশ্বরেরই ভজনা করছি—নানা মতে, নানা পথে, নানা কথায়।"

"সাব্বাস!" লাফিয়ে উঠলেন পেলেগ। "আরে ছোকরা, তোমার তো গির্জের পুরুৎ হওয়া উচিত ছিল—জাহাজে এলে কেন? ফাদার ম্যাপল নিজেও এমন খাসা বাণী ছাড়তে পারতেন না।—উঠে এসো, উঠে এসো, কুওহোগ, না, কি যেন ওর নাম—ওকে নিয়ে উঠে এস। হার্পুনটা তো চমৎকার। ধরবার ধরনটাও পাকা। ওহে কুওহোগ, তিমি-শিকারের নৌকোয় কখনো দাঁড়িয়েছো? মাছ গেঁথেছো?"

কুঈকোয়েগ জবাব দিল ওর নিজস্ব কায়দায়। লাফ দিয়ে উঠে এল ডেকে—আরেক লাফে গিয়ে পড়ল ঝোলানো নৌকোর মধ্যে। হাঁটু গেড়ে বসে হার্পুন বাগিয়ে ধরে হেঁকে উঠল জগাখিচুড়ি ভাষায়—"ক্যাপ্টেন! ঐ যে পিচ ভাসছে জলে…ঐটা ধরুন তিমির চোখ…এই ছুঁড়লাম হার্পুন!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে নির্ভুল লক্ষ্যে হার্পুন বাতাস কেটে উড়ে গেল বিলডাডের চওড়া কিনারা টুপী ঘেঁসে এবং পিচটা গেঁথে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল জলের তলায়।

দড়ি ধরে হার্পুন টানতে টানতে বললে কুঈকোয়েগ—"তাম খতম!"

তারস্বরে বিলডাডকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলেন পেলেগ—বিলডাড সেই মুহূর্তে কান ঘেঁসে হারপুন উড়ে যাওয়ায় বিরক্তমুখে কেবিনে চম্পট দিচ্ছিলেন—"জলদি জলদি কাগজপত্র বার করো—হেজহগ, ইয়ে, কুওহোগকে, একটা নৌকোয় বসাতেই হবে। খাসা হাত! শোনো কুওহোগ, নব্বই ভাগের একভাগ সে পাবে—এর বেশী কোনো হার্পুনার পায় না।"

কাগজপত্র তৈরী হয়ে যাওয়ার পর পেলেগ বললেন—"কুওহোক—নাম সই করতে জানো? না, চিহ্ন আঁকো?"

কুঈকোয়েগ এর আগেও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তাই কথা না বলে কলম হাতে নিল এবং ওর হাতে আঁকা উল্কীর চিহ্নটা হুবহু এঁকে দিল খাতায়।

ক্যাপ্টেন বিলডাড এতক্ষণ চুপ করে বসে দেখছিলেন কুঈকোয়েগকে। এখন একটা ধর্মগ্রন্থ বার করে ওর দুহাত বইয়ের দুপাশে রেখে বললেন—"অন্ধকারের ছানা, আমার কর্তব্য তোমাকে আলোর জগতে নিয়ে আসা। নরকের আগুন থেকে উঠে এস হে পৌত্তলিক!"

খেঁকিয়ে উঠলেন পেলেগ—"দোহাই বিলডাড, ও যা আছে তাই থাকতে দাও। হিংস্র ভাবটা চলে গেলে আর তিমি মারতে পারবে না।"

"পেলেগ! পেলেগ!" চোখ তুলে বললেন বিলডাড। "আহাবকে নিয়ে যেবার বেরিয়েছিলে, মনে পড়ে ঝড়জলে পিকুঅড ডুবতে বসেছিল? তখন তো তুমি ভগবানের নাম করোনি?"

"আমি? আরে গেল যা! আমি তখন ভাবছিলাম কিভাবে ছোট পাল তুলব, জাহাজকে জেটিতে নিয়ে আসব, অতগুলো মানুষকে প্রাণে বাঁচাব। ভগবানের কথা ভাববার সময় কোথায়?"

বিলডাড আর কথা বললেন না। প্রশান্ত মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডেকে। দেখতে লাগলেন মিস্ত্রীরা কিভাবে মাস্তুল মেরামত করছে। মাঝে মাঝে হেঁট হয়ে দু একটা ছেঁড়া কাপড় বা পিচে ডোবানো সুতো তুলে জড়ো করতে লাগলেন হাতের মুঠোয়—যা তাঁর চোখে না পড়লে ফেলে দেওয়া হত ডেক ঝাঁট দিয়ে।

### ভবিষ্যদ্বক্তা

"বন্ধু, এ-জাহাজে কখনো কাজ নিয়েছো?"

পিকুঅড থেকে আমি আর কুঈকোয়েগ সবে নেমে এসেছি, এমন সময়ে

কানের কাছে শুনলাম প্রশ্নটা। চমকে উঠলাম। দেখলাম প্রশ্নকর্তার গায়ে ছেঁড়া পোশাক, গলায় কালো রুমাল—আঙুল তুলে দেখাচ্ছে পিকুঅড-কে।

'আমি বললাম—"এই মাত্র কাজ পেলাম।"

'"বটে!—পিকুঅড জাহাজে কাজ নিলে শেষ পর্যন্ত? বলি, তোমাদের আত্মার মধ্যে আছে কি?"

"কি বাজে বকছো!"

"অনেকেরই ভেতরে কিছু থাকেনা।"

"কুইকোয়েগ, চলো যাই। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে।"

"দাঁড়াও!" গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল আগন্তুক। "বুড়ো বজ্র'র সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"সে আবার কে?"

'"ক্যাপ্টেন আহাব।"

"হয়নি। উনি অসুস্থ।"

"ক্যাপ্টেন আহাব যেদিন সুস্থ হবেন, জানবে আমার এই বাঁ হাতটাও সেদিন সুস্থ থাকবে।"

"কি জানো তাঁর সম্বন্ধে?"

"তোমরা কি শুনেছো ওঁর সম্বন্ধে?"

"সব শুনেছি। ভালো তিমি-শিকারী—লোকজনের সঙ্গে ব্যবহারও ভাল।"

"সত্যি…সত্যি…সব সত্যি! কিন্তু আর কিছু শোনোনি? কেপ হর্ন গিয়ে পা রেখে এলেন কার কাছে? কোন তিমির পেটে?"

"তাও শুনেছি।"

"স–ব?"

"হ্যাঁ, সব।"

"বেশ, যেতে চাও, যাও। আহাব সমুদ্রে গেলে সঙ্গে লোকজন তো যাবেই। কিন্তু পরে যেন বলো না আমি সাবধান করিনি। গুড মর্নিং!"

"যদি কিছু বলার থাকে, বলতে পারো।"

"মর্নিং! যেমন আহাব, তেমনি তোমরা!"

"কি বলতে চাও?"

"মর্নিং!"

"চলে এসো কুইকোয়েগ।—কি নাম হে তোমার?"

'"এলিজা।"

লোকটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে মোড় ফেরবার

সময়ে দেখলাম এলিজা তখনো পেছনে-পেছনে আসছে। বুঝলাম না তার কি মতলব। কিন্তু কেন এই ভবিষ্যদ্বাণী? পিকুঅড আর ক্যাপ্টেন আহাবকে কেন্দ্র করে কেন এই ভবিষ্য-ভাষণ? কোন্ অশুভ পরিণতির ইঙ্গিত রয়েছে এলিজার প্রলাপোক্তির মধ্যে? আহাবের একটা পা নেই—কিন্তু তার সঙ্গে তিমি অভিযানের কি সম্পর্ক?

কিছুদূর গিয়ে এলিজাকে আর দেখতে পেলাম না।

## সবাই চঞ্চল

দিন দুয়েক খুব কাজের ছুটোছুটি রইল পিকুঅড জাহাজের ডেকের ওপর। পুরোনো পাল তো মেরামত হলই, সেই সঙ্গে এল নতুন পাল, তেরপল, রশি ইত্যাদি। চামড়ার তাঁবুর মধ্যে বসে কড়া নজর রাখলেন ক্যাপ্টেন পেলেগ মজুরদের ওপর। বিলডাড একাই পঞ্চাশবার তীরে গিয়ে জিনিসপত্র কেনা কাটা করলেন। মজুররা কাজ করে চলল গভীর রাত পর্যন্ত।

কুঈকোয়েগের সই সাবুদ হয়ে যাওয়ার পরের দিনই হুকুম এল সেইদিনই যেন রাতের মধ্যে বাক্স-টাক্স জাহাজে নিয়ে আসে সবাই—পরের দিন কখন জাহাজ ছাড়বে তার ঠিক নেই। আমরা ভাবলাম, রাতটা তাহলে জেটিতেই শুয়ে কাটাবো। কার্যতঃ কিন্তু পরের দিন জাহাজ ছাড়ল না।

সংসার করতে গেলে টুকিটাকি অনেক জিনিস দরকার হয়। তিমি মারতে গেলেও তেমনি একটা গোটা সংসার জাহাজে নিয়ে যেতে হয়। বরং আরো বেশী লাগে। সওদাগর জাহাজে যা জিনিস থাকে তার চাইতেও বেশী সরঞ্জাম রাখতে হয় তিমি শিকারের জাহাজে। কেননা, দুর্ঘটনা লেগেই থাকে—যা সওদাগরী জাহাজে বড় একটা হয় না। ভাঙচোর মেরামতের জন্য যা দরকার, তা বিদেশের বন্দরে নাও মিলতে পারে। তাই প্রতিটি জিনিসের বাড়তি রাখতে হয়—শুধু বাড়তি একজন ক্যাপ্টেন আর বাড়তি একখানা জাহাজই থাকে না—বাকী সব এক প্রস্থ বেশী নেওয়া হয়। দীর্ঘ তিন বছরের সমুদ্র অভিযানে নিত্যদিনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাড়তি সঙ্গে রাখা সোজা কথা নয়।

এ ব্যাপারে অসামান্য খাটতে দেখা গেল বিলডাডের বোনকে। নাম তাঁর চ্যারিটি। চ্যারিটি নাম সার্থক তাঁর। মূর্ত বদান্যতা তিনি! কখনো এক বাণ্ডিল কলম রেখে যাচ্ছেন চীফ মেট-এর টেবিলে, কখনো এক বয়াম আচার নিয়ে আসছেন ভাঁড়ার ঘরে; আবার কখনো কার পিঠে যাত আছে

শুনে বয়ে আনছেন ফ্লানেল-য়ের থান। আশ্চর্য মহিলা বটে! ভাইয়ের জাহাজে যাতে কারো তিল মাত্র অসুবিধে না ঘটে, সেদিকে খরদৃষ্টি তাঁর একার।

এই কদিন আমরা দুজনে জাহাজের অভিযান-প্রস্তুতি দেখেছি এবং ঘন ঘন খোঁজ নিয়েছি—ক্যাপ্টেন আহাব আসছেন কী? প্রতিবারেই শুনেছি একই জবাব—শরীর আগের চাইতে ভাল—এই এলেন বলে।

সত্যি বলতে কি, মনটা আমার খচ খচ করছিল এই কারণে। কাগজপত্র সই করেছি ঠিকই, কিন্তু যার হুকুম মাথা পেতে নিতে হবে দীর্ঘ তিনটি বছর—তাঁর চেহারা পর্যন্ত এখনো দেখলাম না। এ কিরকম কথা?

অবশেষে হুকুম হল, পরের দিন জাহাজ ছাড়বেই। তাই সেদিন খুব ভোরে উঠে রওনা হলাম আমি আর কুঈকোয়েগ।

## জাহাজের ডেকে

তখন প্রায় ভোর ছটা। ঘন কুয়াশায় চারিদিক অস্পষ্ট। জেটির ওপর এসে দাঁড়ালাম দুজনে। দেখলাম ছায়ার মত চার পাঁচটা মূর্তি জাহাজের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হঠাৎ কাঁধের ওপর হাত পড়ল পেছন থেকে। দুহাতে দুজনের কাঁধ ধরে মাঝখান দিয়ে উঁকি মারল এলিজা—ছন্নছাড়া সেই পাগলটা।

পর্যায়ক্রমে আমাদের মুখ দেখল এলিজা। বলল—"যাচ্ছ কোথায়? জাহাজে?"

"হাত নামাও," বললাম আমি। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল কুঈকোয়েগ।

"কোথায় যাচ্ছ? জাহাজে?"

"হ্যাঁ।"

"যাও। মর্নিং…", বলেই ফের কাঁধে হাত রাখল এলিজা। "একটু আগে কয়েকজনকে জাহাজে উঠতে দেখেছো?"

"হ্যাঁ, দেখেছি," বললাম আমি। "কি হয়েছে?"

"যাও মর্নিং মর্নিং…ফের দেখা হবে…দীন দুনিয়ার মালিকের আদালতে।"

"পাগলা—এসো কুঈকোয়েগ," এগোলাম আমি।

এলিজা ফের হাত রাখল কাঁধে—"এক গোয়ালের গরু…ঝাঁকের কই ঝাঁকে মেশে…যাচ্ছ যাও…একটু আগে যারা গেল—তারা কোথায়?"

চেয়ে রইলাম আমি। এলিজা বলল—"মর্নিং···মর্নিং।" বলতে বলতে মিলিয়ে গেল কুয়াশায়।

ডেকে উঠলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। সত্যিই তো! আগে যারা এল, তারা কোথায়? কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দড়িদড়া স্তূপীকৃত। ডেকের কিনারায় যেখান দিয়ে বাড়তি জল বের করে দেওয়া হয়। তার ছিদ্রপথে আলো জ্বলতে দেখে এগোলাম। দেখলাম, দুটো সিন্দুকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে একটা লোক। দড়ি সামলানোর ভার থাকে এ জাতীয় খালাসীদের ওপর।

কুঈকোয়েগ বিনা বাক্যব্যয়ে বসে পড়ল তার পিঠের ওপর। লোকটা কিন্তু জেগে উঠল না। আমি টেনে হিঁচড়ে কুঈকোয়েগকে সরিয়ে আনলাম একপাশে। লোকটার মাথার কাছে বসল সে, পায়ের কাছে আমি।

টোমাহক জ্বালিয়ে আরম্ভ হল ধূমপান। কুঈকোয়েগ বললে তাদের দেশে সোফা নেই। দশ বারোজন গোলাম হুকুম পেলেই সটান এইভাবে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে। রাজা বসে সেই মানুষ-গদীর ওপর। তাতে অনেক সুবিধে। মাথায় করে সোফা বয়ে জঙ্গলে যেতে হয় না। গোলামরা গাছতলায় কাদার ওপর শুয়ে পড়ে। দলবল নিয়ে নরম উষ্ণ নর-আসনে বসে জিরিয়ে নেয় রাজা।

কথা বলতে বলতে পাইপের ধোঁয়া ঘুমন্ত লোকটার নাকের কাছে ছাড়ছিল কুঈকোয়েগ। ফলে ঘুম ভেঙে গেল তার। চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে জিজ্ঞেস করল—আমরা কে।

পরিচয় দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম—"জাহাজ আজ ছাড়ছে?"

"হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন এসে গেছেন কাল রাতে।"

"কোন্ ক্যাপ্টেন?"

"ক্যাপ্টেন আহাব।"

আওয়াজ শোনা গেল ডেকের ওপর। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, দুজন তিন-জন করে খালাসীরা উঠছে জাহাজে, উঠছে মালপত্র।

ক্যাপ্টেন আহাব কিন্তু অদৃশ্য রইলেন কেবিনের মধ্যে।

### মেরী খৃস্টমাস

দুপুরের দিকে দড়ি-খালাসীদের বিদেয় করা হল। জেটি থেকে 'পিকুওড-কে টেনে গভীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেল ওরা। চীফ মেট স্টারবাক

এসে গেছেন। সেকেণ্ড মেট মিস্টার স্টার-বের জন্তে একটা রাতের টুপী দিয়ে গেলেন চ্যারিটি। ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে বেরিয়ে এলেন পেলেগ এবং বিলডাড।

হাঁক দিলেন পেলেগ—"মিস্টার স্টারবাক, সবাই তৈরী? বুঝেসুঝে নিয়েছেন তো? ডাঙা থেকে আর কিছু আনতে হবে?—ক্যাপ্টেন আহাব তৈরী—এইমাত্র জিজ্ঞেস করে এলাম। সব ঠিক আছে? তবে মারো গুলি—তোলো নোঙর!"

বিড়বিড় করে বললেন বিলডাড—"আস্তে···আস্তে···মুখ খারাপ একদম না।"

দুই অংশীদার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মন দিলেন জাহাজ চালনায়। বিলডাড লাইসেন্সধারী পাইলট—বারদরিয়ায় জাহাজ বার করে নিয়ে যাওয়ার লাইসেন্স আছে তাঁর। কিন্তু পিকুঅড ছাড়া অন্য জাহাজের হাল ধরেন না।

ক্যাপ্টেন আহাবের দর্শন পাওয়া গেল না। পাইলট বারদরিয়ায় জাহাজ নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর দায়ীত্ব শুরু হচ্ছে না বলেই বোধ হয় কেবিন থেকে বেরোলেন না। আশ্চর্য কিছু নয়। এ রেওয়াজ সওদাগরী জাহাজেও আছে।

ক্যাপ্টেন পেলাগ একাই একশ। হুকুমের পর হুকুম দিয়ে যাচ্ছেন। রক্তের মধ্যে নাচন জাগিয়ে ছাড়ছেন। সেই অদ্ভুত চামড়ার কুঁড়ে—তিমির চোয়াল দিয়ে যা তৈরী—নিমেষে উধাও হল ডেক থেকে তাঁর হুকুমে। কেউ ধরল হাল, কেউ তুলল নোঙর, কেউ দড়ি। চেঁচাচ্ছেন, অশ্লীল গালি-গালাজ করছেন, লাথি মারছেন—আমাকেও বাদ দিলেন না, কাউকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দিচ্ছেন না।

চাঁদের আলো ফুটল। বড়দিনের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তরতর করে ছুটে চলল পিকুঅড! মরা আলোয় ঝকঝক করতে লাগল ডেকের দুধারে দাঁতের সারি।

বিলডাড সুর করে শ্লোক আওড়াচ্ছেন। বেশ লাগছে শুনতে। অশ্রাব্য চেঁচামেচি উনি একদম পছন্দ করেন না।

অবশেষে ওঁদের যাওয়ার সময় এল। এবার পাইলটের কাজ ফুরিয়েছে। বিদায়ক্ষণ উপস্থিত হতেই ছটফটানি বেড়ে গেল দুজনেরই। ক্লান্ত বিলডাড অশান্ত হলেন। উদ্বিগ্ন পদক্ষেপে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগলেন ডেকের ওপর; বার বার তাকালেন জলের পানে, দিগন্তের পানে, ডাঙার পানে, ডাইনে-বাঁয়ে—ওপরে নীচে—কিছুই দেখতে বাকী রাখলেন না। অথচ কিছুই দেখলেন না। তারপর অস্থির হাতে এক গাছা দড়ি খুঁটির সঙ্গে

জড়িয়ে ধরে খামচে ধরলেন পেলেগের হাত। আরেক হাতে লণ্ঠন তুলে বুক ফুলিয়ে শুধু চেয়ে রইলেন বন্দর পানে। নীরবে বললেন যেন—"খুব সহ্য করতে পারব পেলেগ। চলো ফিরি।"

অশান্ত পেলেগ কিন্তু শান্ত হয়ে গেলেন দার্শনিকের মত। লণ্ঠনের আলোয় এক ফোঁটা জল চিকমিক করে উঠল গালের ওপর।

দুজনকে নিয়ে নৌকো সরে গেল দূরে। মাথার ওপর আর্ত চেঁচিয়ে উড়ে গেল গাংচিল। ধূ-ধূ আটলান্টিকে ভেসে গেলাম আমরা।

## নিশ্চিন্ত উপকূল

কয়েক অধ্যায় আগে দীর্ঘকায় এক যুবকের উল্লেখ করেছিলাম। নাম তার বার্লিংটন। তাকে এখন দেখলাম জাহাজের ডেকে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে। কনকনে হাওয়ায় মাথার চুল উড়ছে—দূর সমুদ্রের পানে চেয়ে আছে নিষ্কম্প দেহে।

বিস্মিত হলাম। চার বছর একটানা বিপদসংকুল সমুদ্র অভিযান করে ফিরেছিল এই সেদিন। আবার বেরিয়ে পড়েছে তিন বছরের মেয়াদে। ডাঙা কি ওর পায়ের কাঁটা?

ভয়ে বিস্ময়ে আমি দেখতে লাগলাম বার্লিংটনকে। এ সংসারের সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে গেলে সবচেয়ে বেশী বেগ পেতে হয়। এ-অধ্যায় তাই অতি সংক্ষেপে শেষ করছি। কি করে বোঝাবো বার্লিংটনের মানসিকতা? ডাঙায় সুখ, শান্তি, বন্ধুবান্ধব, নিরাপত্তা—অমৃতর স্বাদ তো ডাঙাতেই। কিন্তু জাহাজ চায় না ডাঙায় উঠতে—চায় জলে ভাসতে, ঝড়ে উড়তে—ডাঙা ছুঁলেই কাঁপুনি জাগে তার সর্ব অঙ্গে। ডাঙা ছেড়ে আসবার সময়ে ডাঙা-মুখো হাওয়ার টান কাটিয়ে আসতে কতই না বেগ পেতে হয়—হাওয়াই তার পরম বন্ধু—আবার পরম শত্রু! বারদরিয়ায় হাওয়া ছাড়া কে দেখবে তাকে? কিন্তু ডাঙার কাছে এই হাওয়াই তাকে বার বার টেনে নিয়ে যেতে চায় তীরের দিকে পরম শত্রুর মত!

বার্লিংটন! আমি বুঝেছি তোমায়! বুঝেছি তোমার মনের দ্বন্দ্ব। নশ্বর অথচ অসহ্য সত্য তুমি উপলব্ধি করেছো। আত্মা চায় সীমাহীন সমুদ্রের মতই উদার স্বাধীনতা—কিন্তু স্বর্গ-মর্ত্য বড় করে তাকে আছড়ে ফেলতে চায় সঙ্কীর্ণ মাটির মায়ায়!

তাই তো তুমি অনন্তের পথিক! তীর-হীন ধূ-ধূ জলধি যদি অনন্ত অসীম

দয়াময়ের প্রতীক হয়—তাহলে সেই ভয়ংকরের বুকেই ঝাঁপিয়ে পড়া ভাল—ডাঙার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে আছড়ে পড়ে মাথা কুটে মরার দরকার কি? পোকার মত, কৃমি কীটের মত মাটির মায়ায় কিলবিল করে কি লাভ বন্ধু? অমৃত? সে তো মৃত্যুর মধ্যেই!

### ওকালতি

ডাঙার বন্ধুরা—তিমি শিকারীদের সম্পর্কে আপনাদের হীন ধারণা দূর করার জন্যে দু'চার কথা বলতে চাই। আপনাদের মতে, এ কাজ গন্ধময়, সম্মান-হানিকর। অনেক অবিচার করেছেন—এবার শুনুন আমার ওকালতি।

তিমি শিকারের পেশা পাঁচজনের কাছে নাকি বুক ফুলিয়ে বলা যায় না। সব পেশার আদর আছে—এ পেশার আদর নেই। নাম লেখা কার্ডে যদি লেখা হয়, অমুক ব্যক্তি তিমি মাছের কারবারী, অমনি হাসির হুল্লোড় এবং নাক সিঁটকোনো আরম্ভ হয়ে যাবে।

কেন? এক নম্বর কারণ হল, কাজটা নাকি কশাইয়ের কাজ। কশাই আমরা ঠিকই, কশাই যুদ্ধক্ষেত্রের মেডেলধারী সব সেনাধ্যক্ষই। তাদের কপালে বিশ্বজোড়া সুনাম।

আর একটা কারণ, কাজটা নাকি বড় নোংরা। অনেক কথাই জানেন না এখনো। জানবেন একটু পরে। জানবার পর বুঝবেন, তিমির কারবারের মত পরিচ্ছন্ন কারবার দুনিয়ায় আর দুটি নেই।

তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, তিমি শিকারীদের জাহাজের ডেক অতিশয় নোংরা; মশায়, কোন যুদ্ধ জাহাজের ডেক কম নোংরা দেখাতে পাবেন?

যদি বলেন, সৈন্যদের জীবনে মরণ পদে পদে; তাহলে বলব, অনেক তুখোড় নির্ভীক সৈন্যও ভিরমি খাবে মাথার ওপর দিয়ে স্পার্ম তিমির বিশাল ল্যাজের সাপটানি দেখলে।

যত গালাগালই খাই না কেন, অথচ এই তিমি শিকারীদের জন্যেই সারা দুনিয়ার ঘরে ঘরে এবং উপাসনা মন্দিরের বেদীমূলে লণ্ঠন, মোম এবং বাতি জ্বলছে আজও। তিমির তেলের জয় হোক!

আছে, আছে, আরো আছে। তিমি শিকারীরা জগতের কত কল্যাণ করেছে, শুনুন তার ফিরিস্তি।

বলুন দিকি ডি-উইটের সময়ে ওলন্দাজরা তিমি জাহাজ বাহিনীতে রণদক্ষ সেনাপতি রেখেছিলেন কেন? কেন ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই নিজের খরচে

ভানকার্কে তিমি জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন এবং কেনই বা তিনি এই নানটাকেট থেকে প্রায় দু' কুড়ি তিমি শিকারীর পরিবারকে সবিনয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন? কেন বৃটেন ১৭৮০ থেকে ১৭৮৮ সালের মধ্যে স্বদেশী তিমি শিকারীদের সরকারী সাহায্য দিয়েছিল দশ লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী? আর কেনই বা আমরা—আমেরিকাবাসী তিমি শিকারীরা— দুনিয়ার সব তিমি শিকারীদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী? কেন আমাদের তিমি জাহাজের সংখ্যা সাতশরও বেশী? কেন আঠারো হাজারেরও অধিক আমেরিকান তিমি-শিকার নিয়ে ব্যস্ত? এদের পেছনে বছরে খরচ হচ্ছে ৪০ লক্ষ ডলার, অভিযান শুরুর প্রাক্কালে জাহাজগুলোর দাম দাঁড়াচ্ছে ২ কোটি ডলার এবং অভিযান শেষ করে ঘরে এনে দিচ্ছে খরচ খরচাবাদ দিয়ে ৭০ লক্ষ ডলার! তিমি শিকার যদি এতই জঘন্য তো এসব হচ্ছে কি করে?

এখনো আছে—শেষ হয় নি।

অজানা সমুদ্রে প্রথম পাড়ি জমানোর সাহস দেখিয়েছিল এই তিমি শিকারীরাই। দিকে দিকে রওনা হয়েছে তারা, ছুটে গেছে সাগরে সাগরে তিমির পেছনে—দেখেছে নতুন দ্বীপপুঞ্জ, নতুন দেশ। ম্যাপে যা ছিল না—তারা তা আবিষ্কার করেছে। কিন্তু তাদের নিয়ে পাতার পর পাতা জুড়ে গৌরবময় কাহিনী রচিত হয় নি—তাদের কীর্তি চাপা পড়ে গেছে জাহাজের লগবুকে। অথচ আজকে সাগরে মহাসাগরে আমেরিকা ইউরোপের রণতরী বহর নির্ভয়ে পাড়ি জমাচ্ছে তাদেরই আবিষ্কৃত পথে। কামান দেগে সম্মান জানানো উচিত দুর্দান্ত সেই তিমি শিকারীদের উদ্দেশে—জলযাত্রা এত সহজ করে তোলার জন্যে।

কুক, ভ্যানকুভার আর ক্রুসেন্সটার্ন ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এদের চাইতেও সাহসিকতায় বড় ছিল তিমি শিকারীরা। প্রতিটি তিমি-অভিযানে তারা যা আবিষ্কার করেছে এবং ভাবীকালকে দান করে গেছে - কুক, ভ্যানকুভার, ক্রুসেন্সটার্ন সে তুলনায় কিছুই করতে পারেন নি। হাঙরভরা জলে তারা সাঁতার কেটেছে, মানচিত্র বহির্ভূত দ্বীপে হানা দিয়েছে, নরখাদকদের দ্বীপে পদার্পণ করেছে। এমন অনেক আতংক আর আশ্চর্যর সঙ্গে লড়াই করেছে, যাদের সঙ্গে লড়বার সাহস স্বয়ং কুক-য়েরও হত না— দলবল বন্দুকের ভরসা সত্ত্বেও।

কেপ হর্ন পেরিয়ে প্রথম পথ দেখিয়েছিল তিমি-জাহাজ। তাই ভবিষ্যৎকালে অন্য জাহাজ সাহস পেয়েছিল প্রশান্ত উপকূলে স্পেনীয় দেশগুলিতে হানা দিতে। স্পেন রাজাদের গর্ব খর্ব হয়েছিল এই তিমি শিকারীরা পথ

চিনিয়েছিল বলে—ক্রমে ক্রমে স্পেনের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল পেরু, চিলি, বলিভিয়া।

একজন ওলন্দাজ ভুল করে অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করার পর ওদিকে যেতো না কোনো জাহাজ—নরখাদকের ভয়ে। কিন্তু যেত তিমিশিকারীরা। অস্ট্রেলিয়ায় সভ্যজগতের বার্তা বারবার বয়ে এনেছে এই তিমি জাহাজগুলো। প্রথমদিকে যারা উপনিবেশের পত্তন করেছিল, তাদের ক্ষুধা মিটিয়েছে জাহাজ থেকে বিস্কুট নামিয়ে দিয়ে—নইলে অনাহারেই মারা যেত হতভাগ্যরা। পলিনেশিয়ার অগুন্তি দ্বীপও এই সত্য স্বীকার করবে—তিমি জাহাজের সঙ্গে কারবার করে বেঁচে গেছে সেখানকার বাসিন্দারা। যেখানে কেউ যায় না—সেখানেও ধর্মপ্রচারকদের বয়ে নিয়ে গেছে অথবা ফিরিয়ে এনেছে এই তিমি শিকারীরা। আজকের জাপান অতিথিদের আদর করতে শিখেছে—কিন্তু কৃতিত্ব প্রাপ্য কাদের? এই তিমিজাহাজীদের।

—তা সত্ত্বেও লোকে বলে তিমিজাহাজীদের নিয়ে বিখ্যাত লেখকরা মাথা ঘামায়নি—তাদের কথা ইতিহাসেও নেই।

সত্যিই কি তাই? তিমি-অভিযানের প্রথম বর্ণনা দিয়েছিলেন কে? আলফ্রেড দি গ্রেট স্বয়ং! কে এদের গৌরবময় কাহিনী তুলে ধরেছিলেন পার্লামেন্টের ইতিহাসে?—এডমণ্ড বার্ক!

—তা তো হল। কিন্তু তিমি শিকারীরা জাতে ছোটলোক! ভদ্ররক্ত ওদের শিরায় নেই।

আজ্ঞে না; রাজরক্তর চাইতেও ভালরক্ত যদি কিছু থাকে, তা এই তিমি-শিকারীদের ধমনীতে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ঠাকুমা বিয়ের পর নানটাকেই আসেন এবং আজকের নানটাকেট-য়ে যত হার্পুনার আর তিমি-শিকারী দেখবেন—সবই তাঁর বংশধর—সবারই ধমনীতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের রক্ত রয়েছে!

—বেশ, বেশ! কিন্তু তিমি শিকার মোটেই সম্মানজনক নয়।

উল্টো বললেন। তিমি শিকার রাজকীয় পেশা। ইংরেজদের একটা আইন আছে; তাতে তিমি মাছকে 'রাজা মাছ' বলা হয়েছে!

—উঁহু, রাজা মাছ হলেও তিমিদের মাথায় নিয়ে কেউ কখনো নাচেনি।

ভুল কথা। একজন রোমীয় সেনাপতি দেশজয় করার পর রাজধানীতে প্রবেশ করেছিলেন তিমির হাড়ের শোভাযাত্রা সাজিয়ে। তিমিটা আনিয়েছেন সীরিয়ার উপকূল থেকে।

—তাহলেও তিমি শিকারের মধ্যে খুব একটা গৌরব নেই।

বরং, দশ বিশটা দেশজয় করে যে গৌরব, তার চেয়েও বেশী গৌরবের অধিকারী সেই লোকটা যে সারা জীবনে সাড়ে তিনশ তিমি নিজের হাতে মেরেছে।

সংক্ষেপে, তিমি-জাহাজ আমার কাছে ইয়েল কলেজ আর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান।

## পুনশ্চ

তিমি-শিকারের রাজকীয়তা নিয়ে আরও একটু ওকালতি করছি।

আজকের যুগেও রাজা বা রাণীর অভিষেকের সময়ে একটা অদ্ভুত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়, মেশিনে তেল দিয়ে যন্ত্র চালু রাখার নিয়মের মত রাজার মাথায় তেল মাখানো হয়। উদ্দেশ্যটা বোধহয় মগজের কলকব্জা রাজা হওয়ার পরেও যেন মসৃণভাবে চলে।

কিন্তু তেলটা কিসের? না—অলিভ তেল নয়, ম্যাকাসার তেল নয়, ক্যাস্টর তেল নয়, কড-লিভার তেলও নয়। তবে কিসের?

তিমির। নির্ভেজাল তিমির তেল। যার চাইতে মিষ্টি তেল আর হয় না।

সুতরাং, হে রাজানুগত বৃটিশ! খেয়াল রাখবেন—আপনাদের রাজা আর রাণীদের অভিষেক উপকরণ সরবরাহ করি আমরা—এই তিমি শিকারীরা!

## নাইট এবং স্কোয়ার (১)

পিকুঅডে জাহাজের চীফ মেট-য়ের নাম স্টারবাক। নানটাকেট তাঁর জন্মভূমি। কোয়াকার রক্ত আছে ধমনীতে। ঠাণ্ডা দেশে জন্মালেও গরম দেশে অভ্যস্ত। খটখটে বিস্কুটের মত গায়ের মাংস। বয়স মাত্র তিরিশ। তিরিশটা গ্রীষ্ম শরীর থেকে বাড়তি জিনিস ঝরিয়ে বার করে দিয়েছে। মেদহীন লম্বা শক্ত চেহারায় অপরিসীম শক্তি যেন ঠিকরে পড়ছে। রোগা হলেও কাহিল মনে হয় না—ঠিক উল্টো। ঘড়ির কাঁটার মত যে কোনো ঋতুতে সচল থাকার মত শরীর—অথচ যেন হাড়ের ওপর শুধু চামড়া জড়ানো। মিশরের ম্যমীর মত—কিন্তু চামড়ায় স্বাস্থ্য এবং শক্তির দ্যুতি।

চোখের দিকে তাকালে দেখবেন সহস্র বিপদেও নিশ্চল থাকবার প্রশান্তি।

স্টারবাক বলেন—"তিমিকে যে ভয় পায় না, তাকে আমি জাহাজে রাখি না।" কথাটার তাৎপর্য অনেক। ভয় না পেলে ভয়ের মোকাবিলা করার সাহস আসবে কোত্থেকে ? তাছাড়া, একেবারে নির্ভীক মানুষের সঙ্গে সমুদ্রে পাড়ি জমানো অত্যন্ত বিপজ্জনক।

স্টারবাক অত্যন্ত সাহসী। সাহস আছে, গোঁয়ার্তুমি নেই। তিমি মারতে বেরিয়ে যেন তিমি তাকে মেরে না বসে—সেদিকে হুঁশিয়ার। এই সামান্য হিসেবে ভুল করে শ'য়ে শ'য়ে তিমি শিকারী প্রাণ হারিয়েছে। ওর বাবার বরাতে এই মৃত্যু ঘটেছে—সমুদ্রের অতলে নিপাত্তা হয়েছে ভাইয়ের খণ্ডবিখণ্ড দেহ।

স্টারবাক তাই সাহসী, কিন্তু সংযমী; ডেয়ার ডেভিল—কিন্তু হিসেবী; একরোখা—কিন্তু সতর্ক।

## নাইট এবং স্কোয়ার (২)

সেকেণ্ড মেট-য়ের নাম স্টাব। কেপকড-য়ে জন্ম, তাই সবাই ডাকে কেপকড ম্যান। সদা হাসিখুশী; কাপুরুষ নয়—ডেয়ার ডেভিলও নয়; বিপদকে উদাসীনভাবে আলিঙ্গন করতে অভ্যস্ত; তিমির পেছনে মরণপণ করে ছোটবার সময়ে ধীর স্থির ভাবে হাতের কাজ করে যায় ছুটন্ত বোটে। পরিহাসপ্রিয়, বেহিসেবী, সহজ, সরল; তিমিকে তাড়া করার সময়ে এমনভাবে নৌকো সামলায় যেন ডিনার খেতে চলেছে এবং নৌকোর মাঝিমাল্লারা নিমন্ত্রিত অতিথি। খরদৃষ্টি থাকে যাতে নৌকোয় কারো তিলমাত্র অসুবিধে না হয়—আরামে ব্যাঘাত না হয়। তিমির গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েও খুব ঠাণ্ডা-ভাবে বর্শা হাতে উঠে দাঁড়ায় এবং সুর করে গান গাইতে গাইতে বর্শার পর বর্শা হেনে যায় দুরন্ততম দানব-মাছকেও। দীর্ঘ অভ্যেসের দরুন মৃত্যুর চোয়ালকে মনে করে ইজিচেয়ার—গিয়ে বসে পড়লেই হল। মৃত্যু সম্বন্ধে তার ধারণা কি, কেউ জানে না। কেন না, মৃত্যু নিয়ে কোনো দিন ভাবেনি। তার কাজ শুধু হুকুম তামিল করা—তার বেশী নয়।

স্টাব-য়ের এই আজব চরিত্রের মূল কারণ বোধহয় ওর মুখের পাইপ। অষ্টপ্রহর মুখে লেগেই আছে। নাক ছাড়া স্টাবকে যেমন ভাবা যায় না, পাইপ ছাড়াও তেমনি তাকে দেখা যায় না। তাকের ওপর সারি সারি তামাক ঠাসা পাইপ সাজানো থাকে। ঘুম থেকে উঠে প্যাণ্টের মধ্যে প্রথমে পা না গলিয়ে মুখে পাইপ ঢুকিয়ে দেয়। তারপর একটা থেকে আর একটা

খরিয়ে নিয়ে চলতে থাকে বিরামবিহীন ধূমপান। সঙ্গে সঙ্গে খালি পাইপগুলিও তামাক ঠাসা হয়ে ফিরে যায় তাদের ওপর স্বস্থানে যথাসময়ে ধূমোদগীরণের জন্যে। কলেরা হলে জানি কর্পূর মাখা রুমাল নাকে চেপে ধরে জীবাণু আটকানো হয়। স্টাব তামাকের ধোঁয়া দিয়ে জীবনযুদ্ধের ভয়-ভাবনা-উদ্বেগ-আশংকাকে দূরে রেখে দেয়—মনটাকে হাস্যিখুশী ঠাট্টা তামাসা দিয়ে ভরিয়ে রাখে। মৃত্যু যেখানে পদে পদে, কাঁহাতক মৃত্যু নিয়ে ভাবা যায়? উদাসীন থাকাই ভাল।

থার্ড মেট-য়ের নাম ফ্লাস্ক। বেঁটেখাট, গাঁট্টাগোট্টা, লাল-লাল চেহারা। বয়েসে তরুণ। তিমির ওপর ভীষণ রাগ। বিশালদেহী তিমিজিলরা যেন বংশপরম্পরায় ওর শত্রু এবং ব্যক্তিগতভাবে ওদের ওপর তাই অত আক্রোশ। তাই তিমি নিধন পরমপুণ্য এবং অতীব সম্মানের কাজ তার কাছে। তিমি মাছের প্রকাণ্ড দেহের বহু বিস্ময় ওর চোখে ধরা পড়ে না; তিমির রহস্য ওর চিন্তায় কোনো সাড়া জাগায় না। তিমির গা ঘেঁসে দাঁড়াতে বুক কাঁপে না। তিমিকে মনে করে একটা প্রকাণ্ড ইঁদুর—জলের ইঁদুর—তাই কেটে-কুটে সেদ্ধ করতে সময় লাগে। তিমির পেছনে ধাওয়া করা, তার কাছে মজার খেলা এবং শুধু এই খেলার নেশাতেই তিন তিনটে বছর তিন দিনের মত দেখতে দেখতে কেটে যায় তার কাছে। জাহাজের সবাই ওকে কিঙপোস্ট বলে ডাকে। কিঙপোস্ট একরকম কাঠের বরগা—বরফ ভাঙতে মজবুত। মেরুঅঞ্চলের তিমি জাহাজে লাগানো থাকে।

স্টারবাক, স্টাব আর ফ্লাস্ক—এই তিন মেট-য়ের ওপর ভার থাকে পিকুঅডের তিনটে নৌকোর। ক্যাপ্টেন আহাব পুরো জাহাজের ক্যাপ্টেন—কিন্তু এরা ঐ নৌকো তিনটের সর্দার—হেডম্যান্। তিমিকে ঘিরে ধরে তিন দিক থেকে। উপর্যুপরি হার্পুন চালিয়ে যায়—জোগান দেয় সঙ্গীরা।

পিকুঅড যদি একটা রাজ্য হয়, রাজা হলেন ক্যাপ্টেন আহাব, তাঁর তিন পার্শ্বচর নাইট হল স্টারবাক, স্টাব আর ফ্লাস্ক। নাইটদের স্কোয়ার থাকার রীতি। অধীনস্থ হার্পুনাররা সেই স্কোয়ার।

যেমন, স্টারবাক স্কোয়ার নির্বাচন করেছেন কুইকোয়েগকে। স্টাব-য়ের অধীনের আছে টাশটেগো। ফ্লাস্ক-য়ের নৌকোয় ড্যাগ্গু।

টাশটেগো লাল মানুষ। এদের জাতের প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ হার্পুনার—জাতটা প্রায় লোপ পেতে বসেছে বললেই চলে। মাথায় লম্বা চুল, হনুর হাড় উঁচু, একসময়ে তার পূর্বপুরুষ তীর ধনুক নিয়ে নিউ ইংল্যাণ্ড চষে ফেলেছিল—টাশটেগো চষছে সমুদ্র; বর্শা হাতে তাড়া করে পাহাড়প্রমাণ তিমিদের।

ড্যাগ্‌গু লোকটা একটা সচল পাহাড়। মিশমিশে নিগ্রো বর্বর। চলাফেরা সিংহের মত। দেখতে শুনতে অসুরের মত। দুকানে দুটো বড় বড় সোনালী আংটা। সঙ্গীরা ঠাট্টা করে বলে পালের দড়ি বাঁধবার উপযুক্ত আংটা। অল্প বয়েসে স্বেচ্ছায় তিমি জাহাজে এসেছিল ড্যাগ্‌গু—জীবনে আফ্রিকা, নানটাকেট আর পৌত্তলিকদের কয়েকটা বন্দর ছাড়া কিছু দেখেনি। বর্বর অতীতের কিছুই হারায়নি সে। জিরাফের মত তালঢ্যাঙা—পাক্কা ছ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। সাদা মানুষ সামনে দাঁড়ালে মনে হবে কেল্লার সঙ্গে সন্ধি করতে আসছে উড়ন্ত শ্বেতপতাকা। ফ্লাস্ক-কে এই অসুরের সামনে পিগমির মতই ক্ষুদ্র মনে হয়।

## আহাব

নানটাকেট ছেড়ে আসার পর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল, কিন্তু ক্যাপ্টেন আহাবকে ডেকের ওপর আসতে দেখলাম না।

নীচ থেকে যতবার ডেকে উঠতাম, ভাবতাম এই বুঝি দেখা হয়ে যাবে মানুষটার সঙ্গে। মনের মধ্যে একটা অজানা ভয়, একটা শিহরণ দানা বেঁধে উঠেছিল অজ্ঞাত ক্যাপ্টেনকে ঘিরে—বিশেষ করে এলিজার মুখে গা-শিউরোনো সেই কথাগুলো শোনার পর থেকে। তাই ভয় অথবা অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না কিছুতেই।

মেরু অঞ্চলের কনকনে শৈত্যপ্রবাহ থেকে ক্রমশঃ দূরে যাচ্ছি দক্ষিণ দিকে। দুপুরের বেশ কিছু আগে ডেকে উঠে দেখলাম লাফাতে লাফাতে ছুটছে পিকুঅড।

এমন সময়ে চোখ পড়ল কোয়ার্টার ডেকে। গা ছম ছম করে উঠল একটা নিস্পন্দ মূর্তি দেখে। ক্যাপ্টেন আহাব।

চেহারা দেখে মনে হল না শরীর খুব খারাপ। নিরেট ব্রোঞ্জ মূর্তির মত উন্নত দেহ। ধূসর চুলের মধ্যে থেকে একটা সরু সুতোর মত রেখা রোদে-পোড়া মুখের একপাশ দিয়ে নেমে ঘাড়ের ওপর দিয়ে পোশাকের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। বজ্রাহত বৃক্ষকাণ্ডের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত যে-দাগ মাঝে মাঝে দেখা যায়—এ দাগটা যেন সেইরকমই। কুসংস্কারাচ্ছন্ন একজন খালাসীর মতে, এ-দাগ চল্লিশ বছর পর্যন্ত আহাবের গায়ে দেখা যায়নি। আবার কেউ বলে, দাগটা জন্মসূত্রে পাওয়া। মৃত্যুর পর (যদি উনি কখনো মারা যান) নগ্ন আহাবকে কফিনে শুইয়ে দিলে দেখা যাবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিচিত্র এই দাগটা।

আহাবের এহেন মূর্তি একটা বিচিত্র শিহরণ জাগিয়ে তুলল আমার শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণুতে। এ-অনুভূতি কিন্তু ওঁর হাড়ের পা দেখে নয়। জাপান সমুদ্রে একবার মাস্তুল হারিয়েছিল পিকুঅড—আহাবও তেমনি বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে হারিয়েছেন তাঁর মাস্তুল। কিন্তু দোসরা মাস্তুল লাগিয়েছেন তিমির চোয়ালের হাড় কেটে। পাখানা সেই চোয়াল থেকে তৈরী।

আমি অভিভূত হলাম তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে। কোয়ার্টার ডেকের দুপাশে তক্তার গায়ে আধ ইঞ্চি গভীর দুটো ফুটো আছে। উনি হাড়ের পা-টা একটা ফুটোয় ঢুকিয়ে মাস্তুলের দড়ি ধরে নিষ্কম্প দেহে দাঁড়িয়ে আছেন দূর সমুদ্রের পানে তাকিয়ে। একটা কথাও বলছেন না—অফিসাররাও কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন না! প্রত্যেকেই কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত—ভাবালু ক্যাপ্টেনের উপস্থিতিতে।

সেইদিন থেকে প্রতিদিন কোয়ার্টার ডেকে এসে দাঁড়াতেন ক্যাপ্টেন। কখনো ফুটোয় হাড়ের পা ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কখনো পা টেনে টেনে পায়চারী করতেন, কখনো হাড়ের টুলে বসে থাকতেন। আবহাওয়া গোমড়া হলে ভ্রূকুটি করতেন—আবার ফুরফুরে হাওয়া আর ঝলমলে রোদে মনে হত যেন হাসছেন।

## আহাব আর স্টাব

রাত্রির সঙ্গে বার্ধক্যের সম্পর্ক অতিশয় নিগূঢ়। জীবনের গ্রন্থির সংখ্যা যত বাড়ে, বৃদ্ধবয়েসে রাতের আকাশ আর রাতের হাওয়া ততই চুম্বকের মত আকর্ষণ করে।

ক্যাপ্টেন আহাব তার ব্যতিক্রম নন। রাত হলেই বেরিয়ে আসতেন ডেকে। তখন রাতের পাহারা শুরু হচ্ছে। খালাসীরা সারাদিন হাড়ভাঙা খেটে ডেকের ওপর ঘুমোচ্ছে। পাছে ঘুম ভেঙে যায়। তাই দড়িদড়া আস্তে ফেলা হচ্ছে, আওয়াজ কম করা হচ্ছে।

কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই ক্যাপ্টেনের। হাড়ের পায়ের মাত্র দুইঞ্চি তফাতে ঘুমন্ত নাবিকদের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। খট-খট-খট-খট শব্দে পায়চারী করতেন মাস্তুল পর্যন্ত।

একদিন কৌতুকচ্ছলে বলেছিল স্টাব—"হাড়ের পায়ে দড়ির গোলা বেঁধে নিলে আওয়াজটা কম হত।"

অমনি গনগনে চোখে তাকিয়ে ছিলেন আহাব। বলেছিলেন কর্কশ

কণ্ঠে—"আমি কি কামানের গোলা? খোলের ভেতরে গিয়ে দড়ির পাশে ঘুমোগে যাও—কুত্তা কোথাকার!"

মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল স্টাব-য়ের—"আমি কিন্তু স্যার এ রকম কথা শুনতে অভ্যস্ত নই।"

"দূর হও!" বলে নিজেকে সামলাবার জন্যে সরে গেছিলেন আহাব।

"আজ্ঞে না। ওভাবে কথা বললেন কেন?"

"তবে রে! একশবার বলব! কুত্তা, গাধা, খচ্চর, বাঁদর—"বলতে বলতে গনগনে চোখে তেড়ে এসেছিলেন আহাব। ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল স্টাব।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অপমানাহত মুখে ভেবেছিল—"ক্যাপ্টেন কি পাগল? এত রাতে কি করেন ডেকে? সারারাত তো ঘুমোন না। হ্যামকের বালিশ নাকি মাথার আগুনে তেতে গরম হয়ে থাকে। ব্যাপার কি?"

## পাইপ

আহাব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন গলুইতে। তারপর একজন খালাসীকে ডেকে হুকুম দিলেন কেবিন থেকে তাঁর তামাক-পাইপ আর টুল নিয়ে আসার জন্যে।

হাড়ের টুলে বসে লণ্ঠনের আলোয় পাইপ টানতে লাগলেন ক্যাপ্টেন—সমুদ্রের অধিপতি, দানব তিমিদের প্রভু! পা হাড়ের, সিংহাসনও হাড়ের। শোনা যায় সেকালে সমুদ্র-পাগল ডেন রাজারা নারহোয়ালের খড়্গ খোদাই করে সিংহাসন বানাতেন। আহাব কম যান কিসে?

কিছুক্ষণ গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ার পর অকস্মাৎ ক্ষেপে উঠলেন আহাব—"কই, মাথা ঠাণ্ডা তো হচ্ছে না! তামাক খেয়ে তো আর মগজকে স্থির রাখতে পারছি না। তবে কি হবে পাইপ টেনে? কি দরকার আর পাইপের? আজ থেকে বন্ধ হল ধূমপান! গোল্লায় যাক পাইপ!"

বলেই পাইপটা টান মেরে ছুঁড়ে দিলেন সাগরের জলে। বুদবুদ কেটে জলে তলিয়ে গেল সাধের পাইপ। এবং সেই বুদবুদের ধাক্কায় যেন একলাফে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল পিকুওড।

খটখট শব্দে হেলে বেঁকে পায়চারী করতে লাগলেন আহাব।

## পরীরাণী

পরের দিন সকালে ফ্লাস্ক-কে ডেকে স্টাব বলল—"কাল রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। হাড়ের পা দিয়ে ক্যাপ্টেন আমাকে লাথি মারছেন। দেখতে দেখতে ক্যাপ্টেন একটা পিরামিড হয়ে গেলেন। আমি পিরামিডটাকে লাথি মারব কিনা ভাবছি, এমন সময়ে একটা কুঁজো বুড়ো এসে বললে—কি চাও? লাথি মারবে? আমি বললাম—হ্যাঁ। সে বলল—মারো।—বলে, পেছন ফিরে দাঁড়াল। আমি দেখলাম তার পেছনটা কাঁটা খোঁচায় ভর্তি। বললাম—না, লাথি মারব না। সে বলল—এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা। ক্যাপ্টেন তোমায় লাথি মেরেছে তো কি হয়েছে? জানো না, সেকালে রাণীদের হাতে চড় খেলে জমিদাররা বর্তে যেতেন? সম্মানিত বোধ করতেন? আহাবের লাথিও তেমনি সম্মানের ব্যাপার। ফিরে লাথি মারতে যেও না। পিরামিডের চেহারাটা দেখছ না? এই বলে লোকটা হাওয়ায় উড়তে লাগল। আমার ঘুম ভেঙে গেল। ফ্লাস্ক, স্বপ্নটার মানে কী?"

"জানি না", বলল ফ্লাস্ক।

"ঐ তো আহাব দাঁড়িয়ে আছেন গলুইতে। কি দেখছেন অমন করে? কি যেন বলছেন না?"

চীৎকার শোনা গেল আহাবের—"হেই! মাস্তলে কে আছো? তিমি এসেছে আশে পাশে। সাদা তিমি দেখলেই বলবে।"

বিমূঢ় কণ্ঠে বলল স্টাব—"শুনলে তো? অদ্ভুত! সত্যিই অদ্ভুত! সাদা তিমি!"

## তিমির শ্রেণী বিন্যাস

এককালে গ্রীনল্যাণ্ডের প্রকাণ্ড তিমিদের দাপটে সমুদ্র কাঁপত। ওর চাইতে বড় এবং দুর্দান্ত তিমির খবর কেউ রাখত না। এখন স্পার্ম তিমির খবর পাওয়া গেছে। গ্রীনল্যাণ্ড তিমি সে তুলনায় কিছু না।

খান দুই বইতে ভয়ংকর স্পার্ম তিমি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লেখা হয়েছে। এদের সম্বন্ধে অনেক খবর এখনো অজ্ঞাত।

তিমি ক'রকমের হয়, আগে তা জানা দরকার। এক কথায় যাকে বলে সিটলজি, তা নিয়ে দুচার কথা বলা যাক।

প্রথমে একটা প্রশ্ন। তিমি কি মাছ? কেউ বলেন, না; কেউ বলেন, হ্যাঁ।

তিমিকে মাছ বলতে রাজী নন লিনোস (১৭৭৬)। কারণ, তিমির হৃদপিণ্ড উষ্ণ, ফুসফুস আছে, চোখের পাতা নড়ে, কানে ফোকর আছে ইত্যাদি। ম্যাসি আর কফিন বলেন যুক্তিগুলো অসম্পূর্ণ।

আমি বলব, তিমি আসলে মাছ। অন্য মাছের সঙ্গে তিমির তফাৎ কোথায়? লিনোস যা বলেছেন—সংক্ষেপে তফাৎটা এই: সব মাছের রক্ত ঠাণ্ডা, তিমির রক্ত উষ্ণ। মাছেদের ফুসফুস থাকে না—তিমির আছে।

এতো গেল ভেতরের বৈশিষ্ট্য। বাহ্য বৈশিষ্ট্য কিছু আছে? আছে বইকি। তিমি নাক দিয়ে জল ছাড়ে ফোয়ারার মত এবং তিমির ল্যাজ অনুভূমিক অর্থাৎ জল পৃষ্ঠের সঙ্গে সমান্তরাল।

অন্য মাছেদের ল্যাজ খাড়াই অর্থাৎ ওপর নীচ; নাক দিয়ে জল ছাড়বার ক্ষমতাও নেই।

সিন্ধু ঘোটক নাক দিয়ে জল ছাড়ে। কিন্তু সিন্ধু ঘোটক উভচর জীব—মাছ নয়।

অনেকে ল্যামাটিন আর ডুগংকে তিমির পর্যায়ে ফেলতে চান। আমি রাজী নই; কেন না তারা নাক দিয়ে জল ছাড়তে পারে না।

যাই হোক, আকারে ছোট হলেও এই দুটি বাহ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যারা, তাদেরকেও তিমি শ্রেণীর মাছ বলা উচিত।

তিমিদের মোট তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণীতে:

স্পার্ম তিমি—ভূগোলকের সর্ববৃহৎ জীব। রাজকীয় চেহারা।

স্পার্ম তিমি তাদেরকেই বলে যাদের দেহ থেকে মূল্যবান তেল স্পারমাসেটি পাওয়া যায়। স্পারমাসেটি অতি দুর্লভ বস্তু—ওষুধ আর মলম তৈরী করতে প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও এই দিয়ে আলো জ্বালানো হয়। স্পার্ম তিমি মারা খুব বিপজ্জনক।

রাইট তিমি—এদের তেল নিকৃষ্ট। হোয়েল বোন বা বেলিন এদের মুখ থেকে পাওয়া যায়। সহজে মারা যায়।

ফিন-ব্যাক তিমি—দেখতে অনেকটা রাইট তিমির মত। নাক থেকে বিক্ষিপ্ত জলের ফোয়ারা বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। অনেকটা অলিভ রঙের মত হাল্কা রঙ। ল্যাজটা দেখবার মত—নামকরণ সেইভাবেই হয়েছে। অনেক

মানুষ যেমন মানুষ দেখলেই চটে যায়, এরা তেমনি জাতভাই তিমিদের দেখতে পারে না। একা একা ঘুরে বেড়ায়। ধরা খুব কঠিন।

হাম্প-ব্যাক তিমি—চট করে ধরা যায়। আমেরিকান উপকূলে দেখা যায়। পিঠে কুঁজ আছে, মুখে হাড় আছে। তেল তেমন ভাল নয়। খেলতে ভালবাসে।

রেজর-ব্যাক তিমি—পিঠ ছাড়া কিছু দেখা যায় না। ক্ষুরের মত ধারালো উঁচু পিঠ। এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই।

সালফার-বটম তিমি—কদাচিৎ দেখা যায়—ধরা যায় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসছে মাঝারি সাইজের তিমি।

গ্র্যামপাস—পনেরো থেকে বিশ ফুট লম্বা। নাক দিয়ে শব্দ করে। অনেকে তিমি বলতে নারাজ। দল বেঁধে সাঁতার কাটে। ফেউয়ের ডাক শুনলে যেমন বাঘের আগমন বোঝা যায়, এদের দেখা গেলেই বুঝতে হবে স্পার্ম তিমি পেছনে আছে!

ব্ল্যাক ফিশ—যদিও সব তিমিও কালো, তবুও এদের নাম হয়েছে কালো মাছ। বরং বলুন, হায়েনা তিমি। ষোল থেকে আঠারো ফুট লম্বা। যেন সদা দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে। সস্তা তেলের জন্যে অনেক সময়ে এদের মারা হয়।

নারহোয়াল—এদের খড়্গকে অনেকে নাকের ফুটো মনে করে—নামকরণ সেইভাবেই হয়েছে। লম্বায় ষোল ফুট, খড়্গ পাঁচ ফুট। দুধের মত সাদা গায়ে কালো ফুটকি। খড়্গ অত্যন্ত দামী। পুরাণ বর্ণিত সী-ইউনিকর্নের সঙ্গে মিল আছে—যার খড়্গ থেকে নাকি বিষের প্রতিষেধক তৈরী হত। নারহোয়ালের তেল অতিশয় উৎকৃষ্ট।

কীলার—গ্র্যামপাসের মত লম্বা, কিন্তু অত্যন্ত হিংস্র। প্রথম শ্রেণীর বড় তিমিদের গা কামড়ে ঝুলতে থাকে—মরে না যাওয়া পর্যন্ত ছাড়ে না।

থ্র্যাসার—ল্যাজ দিয়ে চাবুকের মত মারতে পারে—তাই এই নাম। প্রথম শ্রেণীর বড় তিমির পিঠে চড়ে ল্যাজের চাবুক মেরে আরো জোরে ছোটায়।

এবার আসছে তৃতীয় শ্রেণীর তিমি অর্থাৎ শুশুক।

প্রশ্ন উঠতে পারে, চার পাঁচ-ফুট লম্বা জলচরকে তিমি বলা যায় কি?

উত্তর—আকারে যাই হোক না কেন, তিমির যে সংজ্ঞা আমি লিখেছি, সেই অনুসারে শুশুক তিমিশ্রেণীর। কারণ, শুশুক নাক দিয়ে জল ছাড়ে; শুশুকের ল্যাজ অনুভূমিক।

হুজা শুশুক—ভূগোলকের সর্বত্র দেখা যায়। জলে খেলতে ভালবাসে। একটিকে মারলে এক গ্যালন তেল পাওয়া যায়। চোয়াল নিংড়ে যে রস পাওয়া যায়, তার দাম আরো বেশী—লুফে নিয়ে যায় মণিকার আর ঘড়ি নির্মাতারা। মাংস সুস্বাদু। আকারে স্পার্ম তিমির পুঁচকে সংস্করণ।

অ্যালজেরিন শুশুক—বোম্বেটে। ভীষণ বর্বর। প্রশান্ত মহাসাগরে দেখা যায়। ক্ষেপে গেলে হাঙরের মত নিষ্ঠুর।

মিলি-মাউথড্ শুশুক—বৃহত্তম শুশুক। শুধু প্রশান্ত মহাসাগরেই দেখা গিয়েছে। বেশী ছটফটে নয়।

এ ছাড়াও অন্যান্য তিমি আছে। যেমন, নীল তিমি, কামান তিমি, হাতী তিমি, হিমবাহ তিমি ইত্যাদি। সবই কিন্তু উপরোক্ত তিন শ্রেণীর তিমির মধ্যে রয়েছে।

ভবিষ্যতের কথা জানি না।

## চীফ হার্পুনার

জাহাজের নিয়ম হল অফিসাররা থাকেন পেছন দিকে—কর্মচারীরা সামনের দিকে। তিমি জাহাজে শুধু ক্যাপ্টেন নন, তাঁর মেট এবং হার্পুনাররাও থাকে পেছনের দিকে। একই ঘরে খাওয়াদাওয়া চলে। কারণ, তিমি অভিযানে হার্পুনধারীদের গুরুত্ব অপরিসীম।

নাইট এবং স্কোয়ারদের মধ্যে থেকেও ক্যাপ্টেন আহাব তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেন। অনেক রাজামহারাজার কাহিনী শুনেছি। কিন্তু আহাব যেন নগণ্য তিমিশিকারী হয়েও সবার ঊর্ধ্বে। ওকে কিছু দিতে গেলে আকাশ থেকে পেড়ে এনে দিতে হয়, পাতাল থেকে ডুব দিয়ে তুলে আনতে হয়, কায়াহীন বাতাসের অংগে ঝুলিয়ে দিতে হয়।

## কেবিনের টেবিল

দুপুর হল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে স্টুয়ার্ড জানিয়ে গেল খাবার তৈরী।

প্রথমে শুনতে পাননি আহাব, তারপর উঠে দাঁড়ালেন। দড়ি ধরে ডেকের দিকে ঘুরে গিয়ে উত্থান পতনহীন স্বরে বললেন—"ডিনার, মিস্টার স্টারবাক।" বলে নেমে গেলেন কেবিনে।

সুলতানের পদশব্দ মিলিয়ে গেল নীচে। স্টারবাক যখন বুঝলেন, তিনি টেবিলে বসে পড়েছেন—উঠে দাঁড়ালেন। এবার আমীরদের পালা। তিনি প্রথম আমীর। আহাবের কায়দায় দ্বিতীয় আমীর স্টাবকে ডেকে নেমে গেলেন নীচে। স্টাব যাওয়ার আগে খবর দিয়ে গেল তৃতীয় আমীর ফ্লাস্ককে।

একই টেবিলে শুরু হল খাওয়া। ডেকের ওপর যতই কথা কাটাকাটি মনোমালিন্য থাকুক—খাবার টেবিলে ক্যাপ্টেনের সামনে বসতে হয় মেটদের। খাওয়া হয় নিঃশব্দে। আহাব কিন্তু সবাইকে কথা বলতে সুযোগ দেন—নিজে নীরব থাকেন।

ওঠবার সময়ে আগে টেবিল ছেড়ে যায় ফ্লাস্ক। তারপর স্টাব। সবশেষে ক্যাপ্টেন। ফলে অফিসার হয়ে অবধি অর্ধাহারে কাটছে ফ্লাস্ক-য়ের। সবার শেষে এসে সবার আগে উঠলে পেট ভরে ?

টেবিল সাফ হয়ে গেলে আসে তিন হার্পুনার। সশব্দে হাড় চিবোয়, সপাৎ করে ঝোলে চুমুক দেয়, পিপের মত পেট বর্বর কায়দায় বোঝাই করে নেয়।

ক্যাপ্টেনের কেবিনে খাওয়ার সময়ে সবাই সমান—উচ্চনীচ ভেদ নেই।

**মাস্তুলের ডগায়**

শোনা যায় প্রথম পিরামিডের সৃষ্টি হয়েছিল আকাশের তারা দেখবার জন্যে—জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্যে। তাই পিরামিডের গায়ে সিঁড়ির মত খাঁজ-কাটা—যাতে পা ফেলে উঠে যাওয়া যায় ডগায়।

ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ন, নেলসনও অনেক উঁচুতে উঠে চারপাশে নজর রাখতেন।

জাহাজের মাস্তুল তিনটের ডগাতেও খালাসীদের উঠতে হয় সমুদ্রের ওপর নজর রাখবার জন্যে। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। একশ ফুট উঁচুতে ছোট্ট বাক্সর মত বসবার জায়গা। পায়ের নিচে দুলতে থাকে নিস্তব্ধ ডেক; সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এইভাবে পালাবদল করে নজর রাখা হয় সমুদ্রের ওপর।

হিসেব করে দেখা গেছে, তিন-চার বছরের তিমি অভিযানে এক একজন নাবিককে মোট যত ঘণ্টা মাস্তুলে উঠতে হয়—তার যোগফল বেশ কয়েক মাসের সমান।

ক্যাপ্টেন স্লীট মাস্তুলের মাথায় ছোট্ট একটা ঘর বানিয়ে নিয়েছিলেন। তলা দিয়ে উঠতেন। ছাতা, কোট থাকত আসনের তলায়; চামড়ার থাকে—

কথা বলার চোঙা, পাইপ, দূরবীন, কম্পাশ, এমন কি একটা বন্দুক—দূর থেকে নারহোয়াল গুলি করার জন্যে।

আমাদের জাহাজের মাস্তুলে অবশ্য অত আরাম নেই। তাহলেও আমার পালা যখন এল, বড় ভাল লাগল দড়ি ধরে ঝুলে ঝুলে ওপরে উঠতে—বাঁদরের মত।

## কোয়ার্টার-ডেক

সমুদ্রের জলে পাইপ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার দিনকয়েক পরের ঘটনা।

সকালবেলা নিয়মমত কেবিন থেকে বেরিয়ে গ্যাংওয়ে বেয়ে ডেকে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন আহাব। অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলেন ডেকময়। অশান্ত ছন্দের খট-খট শব্দে মুখরিত হল ডেক। চোখ ভ্রূকুটিকুটিল, কপাল কুঁচকোনো।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা গড়িয়ে গেল। গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল সারা জাহাজে। তটস্থ হল মেট-রা। আহাব এইবার ফেটে পড়বেন। সময় হয়েছে—এ তারই লক্ষণ।

সারা দিন গেল। কখনো কেবিনে বন্দী রইলেন ক্যাপ্টেন—কখনো বেরিয়ে এলেন ডেকে।

সন্ধ্যের দিকে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লেন গলুইয়ের সামনে, পাটাতনের ফুটোয় হাড়ের পা গুঁজে খামচে ধরলেন দড়ি এবং সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে হুকুম করলেন স্টারবাককে—"ডেকে আসতে বলো সবাইকে।"

অবাক হলেন স্টারবাক। পরিস্থিতি অসাধারণ না হলে ডেকে সবাইকে ডাকা হয় না।

বললেন বিস্মিত কণ্ঠে—"স্যার!"

"ডেকে আসতে বলো সবাইকে।—মাস্তুলের ডগায় কে আছো? নেমে এসো!"

ক্যাপ্টেন ডেকেছেন? দেখতে দেখতে সবাই এসে জড়ো হল তাঁর সামনে। উনি কিন্তু কারও দিকে তাকালেন না। মাথা নিচু করে পায়চারী করছেন তো করছেনই। খেয়াল নেই মাল্লাদের মধ্যে গুজ গুজ ফুস ফুস আরম্ভ হয়ে গেছে তাঁকে নিয়ে।

আচম্বিতে ফুসফুসের সমস্ত জোর দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন আহাব—"তিমি দেখলে কি করবে তোমরা?"

"চেঁচিয়ে উঠব।" সম্মিলিত কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল ডেকে।

"এই তো চাই!" অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের প্রাণোচ্ছল প্রতিক্রিয়া দেখে খুশীতে যেন ফেটে পড়লেন আহাব।

বললেন—"তারপর কি করবে?"

"নৌকো নামিয়ে তাড়া করব।"

"কেন?"

"মরা তিমি টেনে আনতে।"

প্রতিবার চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে প্রাণের ভেতর থেকে যেন সাড়া দিয়ে উঠল জাহাজশুদ্ধ কর্মচারী। ক্যাপ্টেনের কণ্ঠের উন্মাদনা যেন মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেল প্রত্যেকের শিরা উপশিরায়। বিস্মিত হল খালাসীরা। বুঝল না সহসা সম্মিলিতভাবে কেন উত্তেজিত হল প্রত্যেকে।

এক হাতে দড়ি ধরে আরেক হাতে একটা সোনার মোহর জ্যাকেটে ঘসতে ঘসতে বললেন আহাব—"সাদা তিমি দেখলেই চেঁচিয়ে ওঠার অর্ডার আগে দিয়েছি।—কেমন? যে আগে খবর দিতে পারবে, এই মোহরটা তার। দাম—ষোল ডলার। স্টারবাক—হাতুড়ি!"

চকচক করতে লাগল স্বর্ণখণ্ড পড়ন্ত আলোয়—আহাবের অফুরন্ত প্রাণশক্তি যেন রশ্মিরূপে ঠিকরে পড়ছে টুকরোটা থেকে।

"হুজা! হুজা!" উল্লাসের অট্টরোল শোনা গেল ডেকে।

আহাব চুপ করে আছেন—কিন্তু অদ্ভুত একটা চাপা গুন গুন শব্দ শোনা যাচ্ছে গলার মধ্যে। এ শব্দ যেন তাঁর ভেতরকার প্রাণপ্রাচুর্যময় দেহযন্ত্রের চাকার শব্দ।

স্টারবাকের হাত থেকে হাতুড়ি ছিনিয়ে নিয়ে মোহরটা মাস্তলে পেরেক ঠুকে বসিয়ে দিয়ে উন্মত্ত কণ্ঠে ফের চেঁচিয়ে উঠলেন আহাব—"সাদা তিমি! খেয়াল রেখো—একটা সাদা তিমি! কপাল কুঁচকোনো—চোয়াল হিংস্র!"

টাশটেগো, ড্যাগ্‌গু আর কুইকোয়েগ চমকে উঠল শেষ কথাদুটো শুনে। পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল নীরবে।

এগিয়ে এল টাশটেগো—"ক্যাপ্টেন আহাব, মবি ডিক কি এরই নাম?"

"মবি ডিক! চেনো তুমি?"

"ডুব দেওয়ার আগে বিশেষ কায়দায় ল্যাজ নাড়ে?"

"নাকটা কি অদ্ভুত?" বলে উঠল ড্যাগ্‌গু।

"গায়ের মধ্যে অনেকগুলো হার্পুন ঢুকে আছে—স্ক্রু'র মত পেঁচানো?" বলল কুইকোয়েগ।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ!" অঙ্গারের মত ধক ধক করে দুচোখ জ্বলে উঠল ক্যাপ্টেনের। "গায়ের রঙ সাদা ভেড়ার মত। আস্ত শয়তান···সাক্ষাৎ মৃত্যু! —মবি ডিক! মবি ডিক! মবি ডিক!"

স্টারবাক এগিয়ে এসে বললেন—"ক্যাপ্টেন আহাব, এই মবি ডিক-ই কি আপনার একটা পা নিয়ে গেছে?"

"কে বলেছে?—ঠিকই বলেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই মবি ডিকই জন্মের মত খোঁড়া বানিয়ে দিয়েছে আমাকে। আই! আই! সাত সমুদ্র ঘুরে আসতেও রাজী—কিন্তু তাকে আমার চাই!—পারবে না তোমরা তাকে শেষ করতে?"

"আই! আই! পারবো!" সোৎসাহে ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল তিন হার্পুনার। "মারো মবি ডিককে! মারো সাদা তিমিকে!"

"ঈশ্বর তোমাদের ভাল করবেন!" প্রায় কান্না-বোঁজা গলায় যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন আহাব। "স্টারবাক! মুখটা অমন কেন? মবি ডিককে তাড়া করতে মন চাইছে না?"

"ব্যবসার জন্যে দরকার হলে তাড়া করব বই কি—কিন্তু প্রতিহিংসার জন্যে নয়।"

"স্টারবাক! টাকা দিয়ে যদি আমার প্রতিহিংসাকে মাপতে চাও, তাহলে জেনো সোনার অভাব হবে না।"

"একটা বোবা জানোয়ারের ওপর প্রতিহিংসা!—ক্যাপ্টেন আহাব, ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করবেন না!"

চরম কথা বলে বসলেন স্টারবাক। ক্রোধে, ক্ষোভে, উত্তেজনায়, উন্মাদনায় যেন ফেটে পড়লেন আহাব। নির্বাক মানুষটা ঝড়ের মত অগ্নিগর্ভ ভাষায় এরপর যা বললেন—তার প্রতিক্রিয়া হল অপ্রত্যাশিত। প্রতিটি মানুষের রক্তে নাচন জাগিয়ে দিলেন, প্রতিটি মানুষের মন কেড়ে নিলেন। যাদুমন্ত্র দিয়ে বশীভূত করলেন জাহাজশুদ্ধ মানুষকে—বোবা হয়ে গেলেন স্টারবাক।

সবশেষে উচ্চারিত হল শপথ বাক্য। হার্পুনের ফলা খুলে উল্টো করে ধরল হার্পুনাররা। মেট তিনজন পবিত্র বারি ঢেলে দিল ফাঁপা ফলকের ভেতরে। হাতে হাতে ঘুরে এল ফলক তিনটে—প্রত্যেকে পান করল সেই পবিত্র জল এবং প্রতিজ্ঞা করল—প্রাণ যায় যাক। মবি ডিক নিধন করতেই হবে।

শূন্য হল ডেক। আহাব ফিরে গেলেন কেবিনে।

### সূর্যাস্ত

কেবিনে একাকী বসে আহাব। দৃষ্টি সামনে প্রসারিত।

উনি ভাবছেন—"আমি যাচ্ছি···এগিয়ে যাচ্ছি···আমার পথের দুধারে সাদা ফেনার চিহ্ন রেখে যাচ্ছি। কিন্তু আমার অগ্রগতি কেউ রুখতে পারছে না, পারবে না।

"ঐতো সূর্য ডুবছে সোনার মুকুট পরে···আমার মাথাতেও লোহার মুকুট ···সোনার নয়···আমার দিনও ফুরিয়ে এসেছে···!

"ভবিষ্যদ্বাণী ছিল আমি অঙ্গহীন হব। হয়েছি। ভবিষ্যদ্বাণী আছে—যে আমাকে অঙ্গহীন করেছে, আমিও তাকে অঙ্গহীন করব। করবই করব!

"সবাই আমাকে পাগল মনে করে—স্টারবাক ভাবে আমি বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু আমি পিশাচ···দানব···উন্মত্ত উন্মত্তভা···!

"পা গেছে—যাক!—মবি ডিক, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে!"

### গোধূলি

মূল মাস্তলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে স্টারবাক।

ভাবছেন—"পাগল···পাগল·· বদ্ধ পাগল! কিন্তু ওঁর বিরুদ্ধে যাবার শক্তি আমার নেই! উনি রাজা·· উনি জনগণ নায়ক···ওঁর যুক্তি খণ্ডন করবার সাধ্য আমার নেই। আমাকে উনি বশ করেছেন···ওঁর যা পরিণতি—আমারও সেই পরিণতি! কি ভয়ংকর মানুষ···কি ভয়ংকর কথাবার্তা! ওঁর অসাধু লক্ষ্য আমি বুঝেছি। তবুও ওঁকে ফেরাবার ক্ষমতা আমার নেই! ঈশ্বরকে অপমান করছেন—সব বুঝেও কিছু করতে পারছি না। আমার কলকব্জা সব ভেঙে গেছে—আমি আর আমার বশে নেই!"

রাত নামল। সারা জাহাজ জুড়ে আরম্ভ হল উৎসব। মবি ডিক নিধন-কল্পনায় জাহাজের প্রতিটি মানুষ বুঁদ হয়ে রইল ভোর পর্যন্ত।

### মবি ডিক

সে-রাতে আমার চীৎকার বোধকরি সবার গলাবাজিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অত চেঁচিয়েছিলাম, হাতুড়ি পিটে শপথ নিয়েছিলাম বোধহয়

প্রাণের ভয়ে। কি জানি কেন আহাবের অকাট্য যুক্তি আর আগুনঝরা বক্তৃতা আমার মনের সংগোপনে আতংকের অঙ্কুর বপন করে দিয়ে গিয়েছিল।

বেশ কয়েক বছর ধরে একটা নিঃসঙ্গ সাদা তিমিকে বিচরণ করতে দেখা গিয়েছে সাগরে। নীল সাগরে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করেছে এই শরীরী বিভীষিকা।

তিমি শিকারীরা কখনো দলবদ্ধ হয়ে অভিযানে বেরোয় না। এককভাবে এক-একটি অক্ষাংশ বরাবর এগোতে থাকে অথই জলে নাচতে নাচতে—তাতে পরস্পরে সংঘর্ষ লাগে কম—কাজের সুবিধে হয়।

সাদা তিমিকে এদের কেউ কেউ দেখেছে। খবর এসেছে অনেক পরে। বেশ কয়েকটা জাহাজের সঙ্গে অসাধারণ আকারের পর্বতপ্রমাণ একটা শ্বেত তিমির সম্মুখ সমরও হয়ে গিয়েছে। তিমিটা নাকি কল্পনাতীতভাবে হিংস্র, ক্রূর এবং কুটিল। খলবুদ্ধি ছাড়া এভাবে মানুষের সঙ্গে টক্কর দেওয়া যায় না—বারংবার ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে চম্পট দেওয়া যায় না। তছনছ করে দিয়েছে নৌকো, কামড়ে গুঁড়িয়ে শুধু তক্তাগুলো ভাসিয়ে দিয়েছে জলে—হার্পুন গাঁথা অবস্থায় উধাও হয়ে গিয়েছে সাদা ফেনার মধ্যে দিয়ে। সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে স্পার্ম তিমি শিকারীদের মধ্যে। তার করাল চোয়াল আর অলৌকিক বুদ্ধিমত্তা ইন্ধন জুগিয়েছে বহু কুসংস্কারের পেছনে। মবি ডিক নাকি অজেয়, অমর এবং শরীরী পিশাচ।

কুসংস্কারের কারণ অনেক। গ্রীনল্যাণ্ডে তিমি শিকার করে যারা অভ্যস্ত, তারা পর্যন্ত ভয় পায় স্পার্ম তিমিদের। অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং প্রেতচ্ছায়ার মত সঞ্চরমান এই বিশালদেহী তিমিদের ছায়াপাত ঘটলেই মৎস্যক্ষেত্র শূন্য হয়ে যায়; মাছের ঝাঁক ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেয়—পাতাল-পাহাড়ে আছাড় পড়ে মারা যায়!

এহেন স্পার্ম তিমিদের মধ্যে মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে দেখা দিয়েছে সাদা তিমি মবি ডিক। ঘন নীল সমুদ্রের বুকে রোদ্দুর ঝলমলে দ্বিপ্রহরে যখনি দেখা গিয়েছে একটা পাহাড় সমান চলন্ত বস্তু সাদা ফেনা সৃষ্টি করে ধেয়ে চলেছে জল কেটে, বোঝা গিয়েছে—কে যাচ্ছে অমন রাজকীয় মহিমায়। মবি ডিক-য়ের কপাল সত্যিই অদ্ভুতভাবে গ্রন্থিল, এবং পিঠে একটা পিরামিড সদৃশ প্রকাণ্ড কুঁজ। ডুব দেওয়ার আগে বাতাসে বিচিত্র কায়দায় আন্দোলিত হয় বিশাল ল্যাজ। সারা গায়ে ছিট-ছিট কালো দাগ সাদায় পটভূমিকায়। এক-লহমাতেই মবি ডিককে চিনতে তাই কারো ভুল হয় না।

মবি ডিক দুর্ধর্ষ ; শুধু দুর্ধর্ষ হলেও ভয়ের কিছু ছিল না। অত্যন্ত খলবুদ্ধির অধিকারী সে। যেন স্বয়ং পিশাচ ক্রুর কুটিল বুদ্ধি দিয়ে তাকে অবধ্য করে তুলেছে। তাড়া খেয়ে পালায় ভয়ার্ত তিমির মতই ; সহসা পেছন ফিরে তেড়ে আসে নৌকোগুলোর দিকে। চুরমার করে দিয়ে মানুষ মেরে বা জখম করে দিয়ে উধাও হয়ে যায় নিমেষে।

স্পার্ম তিমিদের গতিবিধি এমনিতেই রহস্যময়। গ্রীনল্যাণ্ডে যে তিমির গায়ে হার্পুন বেঁধানো হয়েছে, পলাতক সেই তিমিকে বহুদূরের অন্য সমুদ্রে এত কম সময়ের মধ্যে দেখা গিয়েছে যে খালাসীদের মনে পুরোনো সেই সন্দেহটা নতুন করে উঁকি দিয়েছে। ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে পাতাল সুড়ঙ্গের সন্ধান কি স্পার্ম তিমিরা জানে? বহুকথিত উত্তর-পশ্চিম পাতাল-পথ কি স্পার্মদের কাছে অবিদিত নয়? পর্তুগালের ষ্ট্রেলো পাহাড়ের ডগায় বদ্ধ লেকের মধ্যে একটা ভাঙা জাহাজ ভাসতে দেখা গিয়েছিল কি এই কারণেই?

সমুদ্রতলের অনেক রহস্যই এখনো অজানা। কত গুপ্ত স্রোত প্রবহমান সেখানে। স্পার্ম তিমিরা কি সহজাত ক্ষমতাবলে সেই সব গুপ্ত স্রোতে গা ভাসিয়ে চকিতে উঠাও হতে পারে দূর সমুদ্রেও?

এহেন অসাধারণ ক্ষমতাধর স্পার্ম তিমিদের বিভীষিকাও ম্লান হয়ে গিয়েছে সাদা তিমি মবি ডিক-য়ের আবির্ভাবে। সে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তার রোষানলে পড়লে রক্ষে নেই তিমি জাহাজের। তাকে মারা যায় না কিন্তু সে সবাইকে মেরে রেখে যেতে পারে অবহেলে, অক্লেশে এবং চক্ষের নিমেষে।

এসব গালগল্প, সত্যমিথ্যায় মিশোনো কিংবদন্তী-কাহিনী সত্ত্বেও একদিন তিনটে নৌকো ঘিরে ধরল মবি ডিককে। হার্পুন বিদ্ধ অবস্থায় মবি ডিককে কায়দায় আনা যাচ্ছে না দেখে ছুরী হাতে জলে দিল ঝাঁপ অসমসাহসিক এক তিমি শিকারী। মাত্র ছ'ইঞ্চি লম্বা ফলা দিয়ে তিমির নিতল প্রাণকেন্দ্র বিদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টায় ঝুলে রইল মবি ডিক-য়ের গায়ে। বেপরোয়া এই মানুষটারই নাম ক্যাপ্টেন আহাব।

মবি ডিক সব দেখল, বুঝল এবং কাস্তেরূপ করাতের মত ধারালো চোয়াল ঈষৎ বেঁকিয়ে কচ করে কেটে নিল একটি পা—তার বেশী নয়।

মাসের পর মাস হ্যামকে একাকী শুয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। অহোরাত্র এক চিন্তা, এক কল্পনা, এক অশান্তি সহস্র বৃশ্চিকের মত কুরে কুরে খেয়ে ফেলল তাঁর মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো। ধীরে ধীরে খণ্ডিত দেহ এবং ভাঙা মন জুড়ে এক হয়ে গেল—মিলেমিশে অভিন্ন হয়ে গেল—ক্যাপ্টেন আহাব পাগল হয়ে গেলেন।

কিন্তু অক্ষম হলেন না। বরং সহস্রগুণে বিবর্ধিত হল তাঁর বুদ্ধিমত্তা, কার্যক্ষমতা এবং মনোবল। সহজ অবস্থায় মস্তিষ্ক যতটা কার্যক্ষম থাকতো— অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তা চূড়ান্ত অবস্থায় গিয়ে পৌছোলো। যাঁর ধীশক্তি অটুট কিন্তু চিন্তাধারা অপ্রকৃতিস্থ—প্রতিহিংসা পাগল সেই মানুষটির সঙ্গে সাধারণ মানুষের তুলনা চলে না কোন মতেই।

এমনও হয়েছে তিমি অভিযানে বেরিয়ে স্পার্ম তিমি এলাকায় গিয়ে পড়লেই পুঞ্জীভূত আক্রোশে, প্রতিহিংসায়, অবর্ণনীয় জ্বালায় পুরোপুরি পাগল হয়ে গিয়েছেন তিনি। তখন মেট-রা তাঁকে বেঁধে রেখেছে কেবিনের মধ্যে। কিন্তু কি আশ্চর্য, কেপহর্ণ ঘুরে এলেই ফের শান্ত হয়ে গিয়েছেন—সহজ হয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ডেকে—শুষ্ক চোখে অনিমেষে চেয়ে থেকেছেন দিগন্ত পানে।

ডাঙার মানুষরা জানত আহাবের এই সাময়িক উন্মাদনায় ইতিবৃত্ত। কিন্তু কেউ জানত না কি কঠোর সংকল্প নিয়ে এবার পিকুঅডে এসে উঠেছেন উনি। জানলে জাহাজের মালিকরা টেনে হিঁচড়ে তাঁকে নামিয়ে দিতেন ডাঙায়। তাঁরা প্রতিটি পাইক্রান্তির বিনিময়ে প্রত্যাশা করেন লাভ—নিছক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে এত ব্যয়ে তিমি অভিযান তাঁরা পাঠান নি।

কিন্তু আহাব বেরিয়েছেন একটি অত্যন্ত অহিতকর অসাধু সংকল্পকে মনের মধ্যে নিয়ে। তাঁর প্রতিটি অনুপরমাণুতে তুষের আগুনের মত অহর্নিশ জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন—যে তাঁকে খঞ্জ করেছে—তার প্রাণপিঞ্জর তিনি শূন্য করবেনই। ব্যবসা? লাভ? গোল্লায় যাক!

ভাগ্য সহায় হয়েছে তাঁর। তাই স্টারবাকের মত বিচক্ষণ অথচ প্রতিবাদে অক্ষম চীফমেট পেয়েছেন, স্টাব-য়ের মত মৃত্যু-উদাসীন সেকেণ্ডমেট পেয়েছেন, ফ্লাস্ক-য়ের মত স্বল্পবুদ্ধি থার্ডমেট পেয়েছেন। পেয়েছেন তিন তিনজন অর্ধসভ্য, অসভ্য এবং নরখাদক হার্পুনার। পেয়েছেন জাহাজভর্তি অন্ধ স্তাবকের দল। এরা একবাক্যে একমনে একপ্রাণে পরিপূর্ণ করতে চলেছে তাঁর মনোগত বাসনা—ধেয়ে চলেছে নীল জল ভেদ করে চলমান এক শ্বেত বিভীষিকার উদ্দেশে—নাম যার মবি ডিক!

## সাদা তিমির সাদাত্ব

আমি কিন্তু মবি ডিক-কে ভয় পেলাম ওর সাদা রঙের জন্যে।

শুভ্র বর্ণ চিরকালই শুভ্রতার প্রতীক—স্বর্গের প্রতীক—যা কিছু শুভময়, মঙ্গলময়, দেবতার আশীর্বাদে ধন্য—তাই শ্বেতবরণ। যেমন পেগু রাজাদের

কাছে শ্বেত হস্তী-দেবতা, শ্যাম রাজাদের শ্বেত হস্তীর প্রতি রাজকীয় মর্যাদা, এমন কি নরকুলেও কালো মানুষের ওপর সাদা মানুষের আধিপত্য—[illegible]

সাদার জয় জয়কার সর্বত্র। তবুও মবি ডিক আমার মনের মধ্যে আতংক সঞ্চার করল শুধু ওর সাদা রঙ দিয়ে। কেন?

বলুন তো বরফপ্রান্তরে সাদা ভালুক দেখলে রক্ত হিম হয়ে যায় কেন? কেন নীল সমুদ্রে সাদা হাঙরের বিদ্যুতগতি শিহরণ জাগায় শিরদাঁড়ায়? কেন শ্বেতবসনা প্রেতিনীর নাম শুনলেই রক্ত ছলকে ওঠে? কেন নিউ হ্যাম্পশায়ারের সাদা পাহাড়ের নামোল্লেখে মনের পটে শ্বেত আতংক ফুটে ওঠে? কেন শ্বেত সমুদ্র দূর বিস্তৃত শ্বেত বিভীষিকারূপে মন মুষড়ে দেয়? কেন হার্জ অরণ্যের দীর্ঘ বিবর্ণ মনুষ্যের কল্পনা ভূতপ্রেতের কল্পনাকেও হার মানায়?

## শোনো!

"কাবাকো, একটা আওয়াজ পাচ্ছো?"

গভীর রাত। নিঃশব্দে জল তুলছে দুজন খালাসী। হাতে হাতে বালতি পাচার হয়ে যাচ্ছে কোয়ার্টার-ডেক থেকে ওপর ডেকে। পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। এমন সময় একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল—"কাবাকো, একটা আওয়াজ পাচ্ছো?"

"কাজে মন দাও হে! কিসের আওয়াজ?"

"ঐ শোনা···আবার···খোলের মধ্যে কে যেন কাশছে না?"

"তোমার মাথা! বালতি দাও!"

"ঐ শোনো···ঐ শোনো···আবার · ঠিক যেন দু-তিনটে লোক পাশ ফিরে শুল!"

"আচ্ছা জ্বালালে তো? বালতি দাও।"

"কানটা খাড়া করো—শুনতে পাবে।"

"তোমার কানের মত? পঞ্চাশ মাইল দূর থেকেও উল বোনার শব্দ শুনতে পাও?"

"হেসে নাও···হেসে নাও···আমার কি মনে হয় জানো? পেছনের খোলে এমন কিছু আছে আজও আমরা যা ওপরের ডেকে দেখিনি বুড়ো ক্যাপ্টেন সব জানে। এই তো সেদিন স্টাব-ও বলছিল ফ্লাস্ককে—ওর মনেও সন্দেহ হয়েছে।"

"রাবিশ! বালতি দাও!"

## চার্ট

উৎসব-মুখর সেই রাতের পরের রাতে ক্যাপ্টেনের কেবিনে গেলে দেখা যেত লণ্ঠনের আলোয় একটা হলদেটে চার্ট টেবিলের ওপর বিছিয়ে পেন্সিল দিয়ে দাগ টানছেন ক্যাপ্টেন। এই প্রথম নয়, প্রতি রাতেই এমনি করে পেন্সিলের দাগ টানেন ক্যাপ্টেন, আবার মুছে ফেলেন। চার মহাসমুদ্রকে সামনে নিয়ে মনে মনে হিসেব করেন কোথায় গেলে পাওয়া যাবে কালান্তক শত্রু মবি ডিক-কে।

স্পার্ম তিমিদের খাদ্যভাণ্ডার নির্দিষ্ট থাকে। কোথায় গিয়ে তারা ক্ষুধা নিবারণ করে, আহাব তা জানেন। তিনি জানেন, এক জায়গায় খাবার খেয়ে আরেক জায়গায় যাওয়ার সময়ে ঈশ্বরদত্ত অনুভূতি বলে স্পার্ম তিমিরা নির্দিষ্ট স্রোতে গা ভাসিয়ে হু-হু করে ভেসে যায় সাগরের বুক চিড়ে। কোথায় কোন্ স্রোত এমনিভাবে বয়ে চলেছে, ক্যাপ্টেন আহাবের তা মুখস্ত।

শুধু তাই নয়; এক ঋতুতে বিশেষ এক জায়গায় খাবার খেয়ে গেছে বলে পরের বছর সেই ঋতুতেই ঠিক সেই জায়গায় বিশেষ সেই তিমিগুলো পুনরাবির্ভূত হবে—এমন কোনো কথা নেই। তবে বেশ কয়েক বছরের হিসেব নিলে দেখা যাবে বছর কয়েকের নির্দিষ্ট ব্যবধানে বিশেষ জায়গায় বিশেষ তিমির ঝাঁক দেখা যায়।

তিমি শিকারীরা এ তথ্য জানে। সেইভাবেই বিশাল দরিয়ায় তিমি শিকারে বেরোয়—কিন্তু হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় না। শূন্য হস্তে ফেরে না।

ক্যাপ্টেন আহাব জানেন এর চাইতেও বেশী কিছু। উনি বছর বছর খবর নিয়েছেন মবি ডিক কোন ঋতুতে কোথায় গুণ্ডামি করে গিয়েছে। তার হিসেব রেখেছেন। চার্ট তৈরী করেছেন, বছর কয়েকের ব্যবধানে ভবঘুরে মবি ডিক-ও বিশেষ বিশেষ জায়গায় হাজির থাকে।

তাই নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছেন উনি—কিন্তু কাউকে জানান নি মূল অভিপ্রায়। বিশেষ সেই জায়গাটিতে মবি ডিক পৌঁছোবে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন বাদে। কিন্তু এতগুলি দিন ঘরে বসে থাকতে রাজী নন প্রতিহিংসা পাগল ক্যাপ্টেন। পথিমধ্যেও সুযোগ নিতে চান। ধুরন্ধর মবি ডিক যদি অলৌকিক বুদ্ধিবলে আসন্ন বিপদ আঁচ করে নিয়ে নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে বিপথেও পরিভ্রমণ করে—তাহলেও যেন তার মুখোমুখি হতে পারেন—তাই অনেক আগেই পিকুওডকে জলে ভাসিয়েছেন ক্যাপ্টেন। পারস্য

উপসাগর, বঙ্গোপসাগর অথবা চীন সাগরে তাকে পাওয়া যাবে না, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না।

প্রতি রাতে লণ্ঠন জ্বালিয়ে সেই হিসেবই রাখেন চার্টের বুকে।

### হলফ-নামা

স্পার্ম তিমিদের অদ্ভুত আচরণ, নৃশংসতা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্বন্ধে যা ঘটনা তা একান্ত অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

হার্পুনবিদ্ধ অবস্থাতেও বছরের পর বছর বহাল তবিয়তে পৃথিবী ভ্রমণ করেছে স্পার্ম তিমি, এ রকম দৃষ্টান্ত আমি নিজে কয়েকটা জানি। একটি ক্ষেত্রে তিন বছর পরে একই লোকের হাতে মরেছিল তিমিটা। এক জোড়া চিহ্নিত হার্পুন পাওয়া গিয়েছিল তার শরীরে। অথচ প্রথমবার হার্পুন গাঁথবার পর তিন বছর অতিবাহিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে হার্পুনার আফ্রিকা গিয়েছে, শ্বাপদ আর জংলীদের সঙ্গে লড়ে গহনতম অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। তিমিটা এরই মধ্যে বার তিনেক পৃথিবী চক্কর দিয়ে এসে ফের পড়েছে তারই সামনে এবং খতম হওয়ার পর পাওয়া গিয়েছে চিহ্ন আঁকা পুরোনো হার্পুন দুটো।

আরো তিনটি ঘটনার সঙ্গে আমি নিজে জড়িত। প্রতিবারেই হাজির ছিলাম আমি নৌকোর মধ্যে। একই তিমি আহত হয়েও বছরের পর বছর পালিয়ে বেরিয়েছে—মরেও মরে নি। একটিকে আমি শুধু দেখেই চিনেছিলাম চোখের নিচে বিশাল আঁচিল দেখে।

স্পার্ম তিমিরা নৃশংস এবং ধুরন্ধর। কিন্তু মাঝে মাঝে এদের মধ্যে থেকে এমন একটি তিমি নামজাদা হয়ে ওঠে—ধড়িবাজিতে যে আর সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। হিমাচল সদৃশ দেহ নিয়ে অপরিসীম নিষ্ঠুরতায় তেড়ে যায় তিমি শিকারীদের—নিজে মরে না—কিন্তু মেরে যায় অনেককে। তিমি ব্যবসায়ীরা এদের নামকরণ পর্যন্ত করে ফেলে এবং দূর থেকে দেখলেই নমস্কার ঠুকে মানে মানে সরে পড়ে। ব্যবসা করতে বসে শক্তি পরীক্ষা করা শোভা পায় না।

এরকম চারটি ইতিহাস বিখ্যাত তিমির নাম আমার জানা আছে। টিমরটম, নিউজিল্যাণ্ড জ্যাক, মাকুয়ান এবং ডন মিগুয়েল।

এরা প্রত্যেকেই হিমবাহ-বপু নিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তিমি-জাহাজীদের দুনিয়ায়। শেষকালে ব্যবসার ক্ষতি বেড়ে যাচ্ছে দেখে তিমি জাহাজীরাই

দলবদ্ধ হয়ে শিকার করতে বেরোলো মারু্য়ান (জাপানের রাজা) এবং ডন মিগুয়েলকে (চিলির আতংক)। দুধর্ষ ক'জন মানুষ জীবন বিপন্ন করেও এই দুটি নরহত্যাকারী তিমিকে যমালয়ে পাঠিয়ে ছেড়েছিল।

এইসব কারণেই মবি ডিক এত নামজাদা হয়ে উঠেছিল তিমি জাহাজীদের মধ্যে। মবি ডিক মানেই সাক্ষাৎ মৃত্যু, শরীরী আতংক। বাঁচতে চাও তো মবি ডিকের ছায়া মাড়িও না! তাকে ঘাঁটাতে যেও না!

কাগজে নাম বেরোয় নি, কিন্তু কত হতভাগ্য মবি ডিকের মত গুণ্ডা তিমির খপ্পরে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে তা অনেকের অজানা। প্রশান্ত মহাসাগরে একবার তেরোটি জাহাজ তিমি ধরতে বেরিয়েছিল। ফিরে আসার পর দেখা গেল, প্রতি জাহাজ থেকেই একজনকে রেখে আসতে হয়েছে সাগরে। আরো বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে তিনটি জাহাজের ক্ষেত্রে। প্রতিটি জাহাজের একটি নৌকো তিমি শিকারী সমেত তলিয়ে গিয়েছে খুনে তিমির পাল্লায় পড়ে।

স্পার্ম তিমিরা শক্তিমান, হিংস্র এবং জিঘাংসা-কুটিল। সোজা তেড়ে এসে তারা নৌকো ডুবিয়ে দিতে পারে। এমন কি আস্ত জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারে।

১৮২০ সালে এসেক্স জাহাজ এইভাবেই তলিয়ে গিয়েছিল। একঝাঁক স্পার্ম তিমিকে তাড়া করেছিল তিনটে নৌকো। বেশ কয়েকটা তিমি জখমও হয়েছিল। হঠাৎ একটা অত্যন্ত বিশাল তিমি দল ছেড়ে বেরিয়ে এল। নৌকোগুলোকে পাশ কাটিয়ে সোজা ছুটে গেল দূরের জাহাজের দিকে এবং খোলের গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে সলিল সমাধি ঘটিয়ে ছাড়ল গোটা জাহাজটার। এ থেকে মনে হয় না কি স্পার্ম তিমিরা প্রতিশোধ নিতে জানে এবং রাগে অন্ধ না হয়ে ধীর 'মস্তিষ্কে' চিন্তা করতে পারে কোথায় গিয়ে আঘাত হানলে চরম প্রতিশোধ নেওয়া হবে?

এই জাহাজেরই ক্যাপ্টেন পোলার্ড প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে আবার জাহাজডুবি হয়ে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রেও পরিকল্পিত পন্থায় গোটা জাহাজটাকে ঢু মেরে ডুবিয়ে দিয়েছিল একটা স্পার্ম তিমি—সঙ্গীদের যন্ত্রণা সইতে না পেরে।

নানটাকেটের ইউনিয়ন জাহাজ ১৮০৭ সালে হারিয়ে গিয়েছিল স্পার্ম তিমির গুঁতোয়।

বছর বিশেক আগে একটি আমেরিকান যুদ্ধ-জাহাজের কমোডোর খুব বড়াই করেছিলেন, তিমির ঠাকুর্দারও ক্ষমতা নেই তাঁর জাহাজ ডুবিয়ে

দেওয়ার। ডাঙায় বসে খুব আস্ফালন করে জলে পাড়ি দিলেন ভদ্রলোক। তিমিদের দেবতা তাঁর গর্ব খর্ব করবার ফন্দী আঁটলেন একটি স্পার্ম তিমিকে লেলিয়ে দিয়ে। ডুবতে ডুবতে কোনমতে বন্দরে এসে ঠেকল অতি-মজবুত মার্কিন রণপোত।

'ন্যাংডর্ফ'স ভয়েজ' থেকে একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। জাহাজের চাইতেও বড় একটা তিমি যাচ্ছিল জলপৃষ্ঠে পিঠ ভাসিয়ে। আচমকা জাহাজ গিয়ে পড়ল তার পিঠে। নির্বিকারভাবে গোটা জাহাজটাকে জল থেকে তিনফুট উঁচুতে তুলে ফেলল সচল পাহাড়টা। মাস্তুল নড়ে উঠল, পাল পড়ে গেল—জাহাজশুদ্ধ লোক ভয়ে দৌড়ে এল ডেকে। তিমির খেয়াল নেই এসব ছোটখাট ব্যাপারে। বিরক্ত হয়ে পিঠের বোঝা জলে নামিয়ে হেলেদুলে চলে গেল নিজের পথে। দেখা গেল, কপাল ভাল। জাহাজ পুরোপুরি অক্ষত।

প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে এক রোমীয় সম্রাটের অগুন্তি জাহাজ ঢুঁ-মেরে জলে ডুবিয়ে দিত বিশেষ এক জল দানো। ঐতিহাসিক লিখেছেন শেষ পর্যন্ত জল-দানবটিকে মারমোরা সাগরে ধরা হয়েছিল। এর বেশী কিছু লেখেন নি। জল-দানবের বর্ণনাও দেন নি। কিন্তু আমি বলতে পারি—স্পার্ম তিমি। যদিও ভূমধ্যসাগরে এদের বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু সমুদ্রের অতলে স্কুইড আর কাটল-ফিশ-য়ের সন্ধান পেয়ে হয়ত একটা স্পার্ম তিমি ছিটকে এসেছিল এদিকে; পেটভরে খেয়েছে ভয়ংকর অক্টোপাসের জ্ঞাতি-ভাইদের এবং গুণ্ডামি করেছে জল পৃষ্ঠে বিরাটকায় জাহাজ দেখলেই!

### অনুমিতি

ক্যাপ্টেন আহাব নির্বোধ নন। মবি ডিক নিধন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে—কিন্তু পিকুঅড জাহাজের মূল লক্ষ্য তো তা নয়। জাহাজে যারা রয়েছে, তাদেরও লক্ষ্য তিমি শিকার—প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ক্যাপ্টেন আহাব তাদের ভুলিয়ে রাখতে পারবেন না। বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। স্টারবাকের মগজে যে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছিল, কুটিলবুদ্ধি আহাব তা যুক্তিতর্ক জালে সাময়িকভাবে নিভিয়ে রেখেছেন। কিন্তু যে 'চুম্বক' স্টারবাকের মাথায় বসিয়েছেন—তার কার্যক্ষমতা অনন্তকাল সমান থাকতে পারে না। বিশেষ করে যে উদ্দেশ্য নিয়ে পিকুঅডে সবাই কাজ নিয়েছে—তা সাধিত না হলেই প্রত্যেকের মাথায় মধ্যেই বিক্ষোভ

দেখা দেবে। লোকজনই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, একা আহাব তো পারবেন না তার প্রাইভেট প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে।

তাই খলবুদ্ধি আহাব হুকুম দিলেন—শুশুক দেখলেও যেন হাতছাড়া করা না হয়! মারো! মারো! তিমির জ্ঞাতিগুষ্টি দেখলেই মারো!

শুনে উল্লসিত হল সবাই। ভাবল, মবি ডিকের প্রতি বিজাতীয় ক্রোধের আরেক অভিব্যক্তি। কেউ বুঝল না বৃদ্ধ আহাব, অর্ধোন্মাদ আহাব অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় তাদের ভুলিয়ে রাখছেন মবি ডিকের সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত।

## মাদুর

ডেকে বসে আমি আর কুঈকোয়েগ মাদুর বুনছি নৌকোয় পাতবার জন্যে। আমি খাটছি কুঈকোয়েগের অনুচর হিসেবে। বুনছি আর ভাবছি—এতো মাদুর নয়, আমাদের ভাগ্য। নিজেরাই রচনা করছি নিজেদের ভবিষ্যৎ। কুঈকোয়েগ অন্যমনস্ক; সারা জাহাজে যেন একটা স্বপ্নকুহেলী ভাসছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে চলেছে পিকুঅড।

অকস্মাৎ গানের সুরের মত একটা হাঁক নেমে এল যেন মেঘলোক থেকে। টাশটেগো চেঁচাচ্ছে। মাস্তুলের ডগা থেকে আধখানা শরীর শূন্যে ঝুলছে—যাদুদণ্ডের মত হাতখানা সামনে প্রসারিত।

"ঐ...ঐ... নাক দিয়ে ফোয়ারা ছাড়ছে!...ঐ ফোয়ারা, আবার ফোয়ারা!"

"কোথায়?"

"পাশের দিকে। অনেকগুলো।"

স্পার্ম তিমিরা ঘড়ির কাঁটার মত থেমে-থেমে ফোয়ারা ছাড়ে। অভিজ্ঞ নাবিকরা তাই দেখেই বুঝতে পারে—স্পার্ম তিমি, অন্য তিমি নয়।

সাড়া পড়ে গেল জাহাজে। টুটে গেল স্বপ্নের জাল।

"ডুব দিয়েছে!" ফের চেঁচিয়ে উঠল টাশটেগো। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল স্পার্ম তিমির ঝাঁক।

"সময় নাও! ধৈর্য ধরো! স্টুয়ার্ড—জলদি!" এবার সাড়া দিলেন আহাব।

হন্তদন্ত হয়ে নেমে এল টাশটেগো। নৌকোয় যাদের ডিউটি নেই, এমন একজন খালাসী উঠে গেল মাস্তুলের ডগায়। কপিকল ঘুরিয়ে নৌকো

লাগানো হল জলে নামানোর জন্যে। ডেকের ধারে উদ্বিগ্ন সেনাদলের মত সারি সারি দাঁড়িয়ে গেল তিমি শিকারীরা শত্রুর প্রতীক্ষায়।

আচম্বিতে একটা চীৎকার শোনা গেল ডেকের ওপর। চকিতে সবার নজর সরে এল সমূদ্রের ওপর থেকে।

ধূলিধূসর প্রেতচ্ছায়ার মত পাঁচটি মূর্তি যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে ডেকের ওপর

## তিমির পেছনে প্রথম ধাওয়া

ডেকের স্টারবোর্ড কোয়ার্টারে সব সময়ে একটা বাড়তি নৌকো রাখা হয় এবং বলা হয় ক্যাপ্টেনের নৌকো। পাঁচ-পাঁচটা ভুতুড়ে মূর্তি দড়িদড়া আলগা করে নামাচ্ছিল সেই নৌকোটা।

গলুইয়ের কাছে যে দাঁড়িয়ে মাথায় বেশ ঢ্যাঙা সে; লোহাপেটা শরীর। গায়ে মিশমিশে কালো চৈনিক জ্যাকেট আর ঢিলে পাৎলুন। মাথায় কিন্তু সাদা চুলের পাগড়ি। ইস্পাত কঠিন ঠোঁটের ওপর চেপে রয়েছে একটি মাত্র কুটিল হিংস্র দাঁত।

সঙ্গীরা সে তুলনায় কম তেজালো। গায়ের রঙ বাঘ-হলুদ। যেন ম্যানিলার সেই কুখ্যাত পিশাচরা—যারা জলদস্যুদের গুপ্তচররূপে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সাগরে সাগরে।

জাহাজসুদ্ধ লোকের অবাক চাহনি নিবদ্ধ রইল ডেক ফুঁড়ে উঠে আসা এই পাঁচটি মূর্তির দিকে। হেঁকে উঠলেন আহাব—"ফেডাল্লা, সবাই তৈরী?"

"হ্যাঁ, তৈরী?" যেন লক্ষ নাগ হিসহিসিয়ে উঠল দীর্ঘকায় একদন্ত মানুষটার কণ্ঠে।

"নামাও, নৌকো।—আহয়,—নামাও নৌকো!"

ঝপাঝপ তিনটে নৌকো গিয়ে পড়ল সাগরের জলে। ডেকের ওপর থেকে সরাসরি লাফ দিয়ে দুলন্ত নৌকোয় নেমে পড়ল, তিমি শিকারীরা। এ রকম লাফ দেওয়া অন্য কোনো জাহাজের খালাসীদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তিমি শিকারীদের চক্ষু কিন্তু তখনো নিবদ্ধ পাঁচটে বাঘ-হলুদ মূর্তির দিকে।

"ক্যাপ্টেন আহাব?" বললেন স্টারবাক।

"ছড়িয়ে পড়ো। হাঁ করে দেখছো কি? ছড়িয়ে পড়ো মেজিক কোথাকার!"

ধমক খেয়ে নিমেষ মধ্যে দাঁড়টানা শুরু হয়ে গেল তিনখানা নৌকোয়। স্টার উল্লসিত কণ্ঠে উত্তেজিত করে চলল দাঁড়িদের। শেষকালে বললে—"হলদে মানুষদের নিয়ে অত মাথা ঘামানোর দরকার কী, আর্চি?"

আর্চি বললে—"মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। ওরা যে জাহাজের খোলে ভাড়া দেওয়ার ভয়ে লুকিয়ে আছে, আমি আগেই জানতাম। কাবাকো, বলিনি তোমাকে? ওদের কাশির আর নড়াচড়ার শব্দ শুনেছি অনেক আগেই।"

"ভালই তো! আমাদের কাজ সহজ করে দিতে আরো পাঁচটা বাড়তি মানুষ।"

"ওরা এসেছে কিন্তু সাদা তিমি মারবার জন্যে।"

"আসুক গে।—চলো তোমরা। মারো দাঁড় হেঁইও!"

স্টারবাক অত চেঁচাচ্ছেন না। কিন্তু কখনো চাপাস্বরে হুকুম করছেন, কখনো মিনতি করছেন—"চলো···চলো· ·আরো জোরে চলো!"

ফ্লাস্ক ক্ষেপে গিয়েছে। লাফাচ্ছে নৌকোর পাটাতনে। হঠাৎ দেখা গেল অসুরাকৃতি ড্যাগ্‌গুর কাঁধের ওপর উঠে বসেছে বেঁটে ফ্লাস্ক। অদ্ভুত কৌশলে ভারসাম্য ঠিক রাখছে ড্যাগ্‌গু। ফ্লাস্কের মুখে তুবড়ি ফুটছে যেন। চাউনি দূরপানে নিবদ্ধ। টুপী ছুঁড়ে দিয়েছে সাগরের জলে।

সহসা দেখা গেল বাড়তি নৌকোটা বেরিয়ে এল জাহাজের পেছন থেকে। হাড়ের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন আহাব, পেছনে ফেডাল্লা। হলুদ-মূর্তিরা ভীমবেগে দাঁড় টানছে। ক্যাপ্টেনের মুখে কথা নেই; চোখে লাল খুন, ঠোঁটে ফেনার আঠা, ললাটে তুফান। শিকারের সন্ধানে ঝাঁপ দিয়েছেন ক্যাপ্টেন।

দূরে দেখা গেল বাষ্পকুহেলী। ফুক ফুক করে ভলকে ভলকে বাষ্পপুঞ্জ ভাসছে নীল জলের ওপর।

"আহয়! ঐ ওরা···ঐ ওরা!"

অনভিজ্ঞ চোখে ঐ বাষ্প দেখে ধরা সম্ভব নয় যে জলের ঠিক তলা দিয়ে ঘাপটি মেরে চলেছে স্পার্ম তিমির দল। কিন্তু তিমি শিকারীরা লক্ষণ চেনে।

চারটে নৌকো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। স্টাব পাইপ ঠেসে নিয়ে মুখে দিয়েছে—হাত আড়াল করে দেশলাই জ্বালিয়েছে, এমন সময়ে শোনা গেল চাপা চীৎকার—"হুঁশিয়ার! তিমির দল সামনে!"

পাইপ ধরানো আর হল না। দাঁড়গুলো শূন্যে উঠে দাঁড়িয়ে গেল। আকাশের ঝড়ো বাতাস জলের মাথায় নাচন জাগিয়েছে। তিমিদের

ফোয়ারা-বাষ্প মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে সেই ঝড়ো মাতলামির সঙ্গে।

সহসা শুরু হল এগিয়ে যাওয়া। আমাদের ডাইনে বাঁয়ে চাপা চীৎকার। তিনটে তিমি পাশাপাশি ছুটছে জলের তলা দিয়ে।

চাপা গলায় গর্জে উঠলেন স্টারবাক—"ঐ তো কুঁজ...ছোঁড়ো!"

মুখের কথা খসবার আগেই কুঈকোয়েগের হাত থেকে সাঁ করে বেরিয়ে গেল হার্পুন। সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে প্রচণ্ড ঝাপটায়, যেন ভূমিকম্পের ধাক্কায় উলটে গেল নৌকো। তিমি, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র আর হার্পুন—তিনে মিলে এক হয়ে গিয়েছে।

হার্পুনটা কিন্তু গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল—অক্ষত দেহে জল তোলপাড় করে ডুব দিল প্রাগৈতিহাসিক মৎস্য।

সাঁতরে গিয়ে দাঁড়গুলো জোগাড় করলাম। নৌকোয় উঠে বসলাম। তখন সন্ধ্যে নামছে। ওয়াটারপ্রুফ লণ্ঠন জ্বাললেন স্টারবাক। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। বিশাল সমুদ্রে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে কাটালাম সারারাত। ভোরের দিকে হঠাৎ কান খাড়া করে উঠে বসল কুঈকোয়েগ। লণ্ঠন কোনকালে নিভে গিয়েছে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মৃদু ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভেসে আসছে না?

সহসা বিরাটকায় একটা বস্তু এসে পড়ল আমাদের ঘাড়ে। তাড়াতাড়ি নৌকো ছেড়ে লাফ দিলাম জলে। পিকুঅড শূন্য নৌকো ডুবিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল সামনে—নৌকো ফের ভেসে উঠল পেছনে।

সাঁতার কেটে গেলাম। নৌকো আর দাঁড় নিয়ে উঠে এলাম পিকুঅডের ডেকে।

## হায়না

জীবন বড় অদ্ভুত। বিশেষ করে তিমি শিকারীদের। এখন যা সঙ্কট, পরে তা হাসির খোরাক। বিশেষ এই দর্শন নিয়ে তিমির চোয়ালের মধ্যে নৌকো নিয়ে প্রবেশ করতে চাই আমরা।

পিকুঅডের ডেকে ওঠবার পর কুঈকোয়েগ, স্টাব এবং ফ্লাস্ককে জিজ্ঞেস করেছিলাম—এইটাই কি নিয়ম? ঝড় উঠুক, নৌকো উল্টে যাক—তবুও তিমি গাঁথতে হবে হার্পুনের ডগায়?

তিনজনেই বললে—হ্যাঁ। এই নিয়ম। জীবনের মায়া থাকে না তিমির পেছনে ধাওয়া করার সময়ে।

শুনে কুঈকোয়েগকে বললাম—"এইবেলা তোমার শেষ উইলটা করে নাও।—আমি তোমার উকিল হচ্ছি।"

### ফেডাল্লা

খঞ্জ মানুষকে নিয়ে তিমির পেছনে তাড়া করা যায় না। পিকুঅড জাহাজের মালিকরা এ প্রস্তাবে রাজী হতেন না। অথচ আহাব পণ করেছিলেন, সমুদ্রের আতংক মবি ডিককে স্বহস্তে নিধন করবেন।

তাই এত লুকোছাপা। ফেডাল্লা এবং তার চার সঙ্গীকে কোত্থেকে জুটিয়েছিলেন, জানা নেই। এ রহস্যের মীমাংসা কখনো হয়নি।

তবে ওরা সত্যিই শরীরী প্রেতচ্ছায়া। আহাবের পৈশাচিক পরিকল্পনায় উপযুক্ত দোসর।

### তিমির প্রেত

বেশ কিছুদিন পরে চাঁদের আলোয় একটা রূপোলী ফোয়ারা দেখা গেল অনেক দূরে।

ফেডাল্লা রাত্রে মাস্তলে উঠে নজর রাখত সমুদ্রের ওপর। কোনো তিমি শিকারীই কিন্তু রাতবিরেতে তিমির ঝাঁকের পেছনে দৌড়োয় না—মাস্তলেও উঠে বসে থাকে না।

থাকত শুধু ফেডাল্লা। চাঁদের আলোয় ঝক ঝক করত ওর সাদা চুলের পাগড়ী।

এই অবস্থায় একদিন হেঁকে উঠল ওপর থেকে। রহস্যময় সাদা ফোয়ারা চোখে পড়েছে তার।

ছুটে এলেন আহাব। কিন্তু চকিতে মিলিয়ে গেল রূপোলী ফোয়ারা।

এরপর থেকে মাঝে মাঝে চন্দ্রালোকিত রাতে ভুতুড়ে ছায়ার মতই দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল রূপোলী ফোয়ারা।

উত্তমাশা অন্তরীপের নাম হওয়া উচিত ছিল নিপীড়ন অন্তরীপ। জল সদা বিক্ষুব্ধ। মোচার খোলার মত দুলতে লাগল পিকুঅড। সাদা হাড়ে বাঁধানো গলুইয়ের ওপর নীল জল আছড়ে পড়ল কতবার।

এখানেও জ্যোৎস্না রাতে অপার্থিব সেই ফোয়ারা দেখা গেল কয়েক রাতে। ভয়ে গা ছম ছম করে উঠল কুসংস্কারাচ্ছন্ন খালাসীদের। ওরা জানে, এ ফোয়ারা কার—মবি ডিকের।

দিনেরাতে সমানে হাড়ের পা নিয়ে ডেকে পাইচারী করতেন আহাব। বৃষ্টির জলেও বসে থাকতেন মাথায় টুপী আর বর্ষাতি চাপিয়ে। এইরকম এক রাতে তাঁর ঘরে ঢুকে বিস্মিত হলেন স্টারবাক। মেঝের সঙ্গে স্ক্রু-আঁটা টুলে বসে আছেন আহাব, টেবিলে খোলা সমুদ্রস্রোতের চার্ট, একহাতের মুঠোয় লণ্ঠন। মাথা পেছনে হেলিয়ে ঘুমোচ্ছেন ক্যাপ্টেন—কিন্তু মুদিত চোখদুটি উর্ধ্বদিকে নিবদ্ধ—যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কড়িকাঠে আঁটা কম্পাসের কাঁটা দেখছেন—জাহাজের গতিপথ নজরে রেখেছেন!

### অ্যালবেট্রস

অন্তরীপ থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাওয়ার সময়ে অ্যালবেট্রস জাহাজকে দেখলাম।

অনেক বছর সমুদ্রে থাকলে জাহাজের রঙ উঠে যায়, পাল জলে যায়। বিবর্ণ অ্যালবেট্রস তার ব্যতিক্রম নয়। মাস্তলের গায়ে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া পোশাকপরা তিন জন মেট। কারো মুখে কথা নেই। পিকুঅডের এত কাছে এসে পড়ল যে, ইচ্ছে করলে আমরা লাফ দিয়ে অ্যালবেট্রসের ডেকে উঠতে পারতাম। তা সত্ত্বেও নীরব মেট তিনজনের কণ্ঠে ভাষা ফুটল না।

আচমকা চীৎকার শোনা গেল নিচের কোয়ার্টার ডেক থেকে।

"আহয়! সাদা তিমি দেখেছো?"

সাদা তিমির নাম শুনেই নামহীন আতংকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমরা। অ্যালবেট্রসের বিষাদ-বদন মেটরা কিন্তু সাড়া দিল না।

হঠাৎ আহাবের হাত ফস্কে কথা বলার চোঙাটা পড়ে গেল জলে। জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ছাপিয়ে কণ্ঠস্বর পৌঁছোলো না অ্যালবেট্রসে। আহাবের ইচ্ছে ছিল বোধহয় নৌকো নামানোর। কিন্তু সাহস পেলেন না ঢেউয়ের চেহারা দেখে।

ঢেউয়ের উল্টোপাল্টা ধাক্কায় চোঙাটা ফের এসে গেল নাগালের মধ্যে। তুলে নিলেন আহাব। হেঁকে বললেন—"আহয়! নিশ্চয় নানটাকেই ফিরছো তোমরা। সেখানে বলো, পিকুঅড পৃথিবী প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে—চিঠিপত্র যেন প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিকানায় পৌঁছোয়।"

পৃথিবী প্রদক্ষিণ! কার পেছনে?

মবি ডিক! মবি ডিক! শরীরী রহস্য মবি ডিক বধ, অর্ধোন্মাদ আহাবের একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবী প্রদক্ষিণেও রাজী—কিন্তু চাই মবি ডিককে!

## গ্যাম

গ্যাম শব্দটা কোনো অভিধানে নেই, কিন্তু হাজার পনেরো ইয়াঙ্কি তিমি-শিকারী জানে 'গ্যাম' মানে কি। শব্দটা সওদাগরী জাহাজে চালু নয়। দাস জাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ বা বোম্বেটে জাহাজে এ শব্দ শুনলে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে উঠবে। কারণ ওরা প্রত্যেকেই তিমি শিকারকে নীচু পেশা মনে করে। বোম্বেটে জাহাজের পেশা যেন কত মহান!

'গ্যাম' মানে হল সমুদ্রে তিমি শিকারে বেরিয়ে দুই তিমি জাহাজে দেখা হলে সামাজিকতা। দুই ক্যাপ্টেন এক জাহাজে থাকেন—দুই চীফ মেট আরেক জাহাজে। সংবাদ বিনিময়, কুশল প্রশ্ন এবং আরো দরকারী কথার অবতারণা ঘটে এই সময়ে।

অ্যালবেট্রস-কে দেখে আহাবও 'গ্যাম' করতেন। কিন্তু জলের অবস্থা দেখে সাহস পেলেন না।

## টাউন-হো'র গল্প

উত্তমাশা অন্তরীপকে চৌরাস্তার মোড় বলা যায়। একটা না একটা জাহাজের সঙ্গে দেখা হবেই।

কিছুদিন পরেই তাই গৃহাভিমুখী জাহাজ 'টাউন-হো'র সঙ্গে গ্যাম হল পিকুঅডের। অদ্ভুত এই গল্পটা শোনা গিয়েছিল তখন। কিন্তু ক্যাপ্টেন আহাবের কানে তোলা হয়নি।

গল্পটা মবি ডিক সম্পর্কে।

'টাউন-হো' শব্দটা বুড়ো তিমি শিকারীদের কাছে পরিচিত। এ শব্দের মানে—ঐ দেখো তিমি! তিমি দেখলেই চীৎকার উঠত—টাউন হো! টাউন হো!

টাউন-হো জাহাজটাও তিমি ধরতে বেরিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা চোরা ফুটো দেখা দিল খোলের মধ্যে। দিনরাত পাম্প করে জল বার করে দিয়েও নিশ্চিন্ত হলেন না ক্যাপ্টেন—জাহাজ নিয়ে চললেন সবচেয়ে কাছের বন্দরের দিকে।

এমন সময়ে বিদ্রোহ শুরু হল জাহাজে। র‍্যাডনী নামে এক নীচমনা মেট ডেক ঝাঁট দিতে হুকুম করল স্টীলকিল্টকে। স্টীলকিল্টকে দেখতে পারত না

র‍্যাডনী। অথচ লোকটা কাজের লোক। সারাদিন পাম্প চালিয়ে ক্লান্ত। তাই বললে—ডেক ঝাঁট দেওয়ার জন্যে ঐ তো ছেলেগুলো বসে রয়েছে। সারাদিন কুটোটি নাড়েনি। ওদের বলা হোক না কেন।

র‍্যাডনী হাতুড়ি নিয়ে মারতে গেল স্টীলকিল্টকে। স্টীলকিল্ট ঘুসি মেরে চোয়াল ভেঙে দিল র‍্যাডনীর।

খোলের মধ্যে বন্দী করে রাখা হল স্টীলকিল্টকে। তারপর মাস্তুলে বেঁধে চাবকানো হল অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত। র‍্যাডনী ভাঙা চোয়াল নিয়েও চাবুক হাঁকড়ালো স্টীলকিল্টের পিঠে।

গোপনে ঠিক হল, বন্দরে পৌঁছেই সদলবলে জাহাজ ছেড়ে চলে যাবে স্টীলকিল্ট। ইতিমধ্যে তিমি দেখা গেলেও হাঁক দেবে না কেউই।—

স্টীলকিল্ট আরেকটা ফন্দী আঁটল। টোয়াইন সুতোর জাল জড়িয়ে একটা লোহার বল রাখল পকেটে। ও দেখেছিল, গলুইয়ের কাছে বসে ঢোলে র‍্যাডনী। খুন করতে হবে তখনি।

কিন্তু এক মূর্খের চীৎকারে বানচাল হয়ে গেল পরিকল্পনা।

ভোররাতের দিকে আচমকা সে চেঁচিয়ে উঠল সাদা তিমি মবি ডিককে দেখে। মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে তুষার ধবল পিঠ তুলে স্বচ্ছন্দ গতিতে ভেসে চলেছে শ্বেত বিভীষিকা। মাস্তুলের ডগা থেকে তাকে অনেক আগেই দেখা গিয়েছিল—কিন্তু কেউ চেঁচায়নি পূর্ব পরিকল্পনা মত!

মূর্খটার অকস্মাৎ চীৎকারে তাই সোরগোল উঠল জাহাজে। তড়িঘড়ি বোট নামানো হল জলে। ভাগ্যের কি পরিহাস—র‍্যাডনীর পাশেই বসতে হল স্টীলকিল্টকে। হার্পুনের দড়ি তার হাতে—হুকুমমত দড়ি টানবে, নয়তো ছাড়বে। হার্পুন রইল র‍্যাডনীর হাতে।

আচমকা বোট যেন জলতলের তাকে উঠে পড়ল—ঠিকরে গিয়ে র‍্যাডনী পড়ল মবি ডিকের পিচ্ছিল পিঠে—হড়কে নেমে গেল অপর পাশে। মবি ডিক তাকে দেখল। প্রাণপণে র‍্যাডনী সরে যেতে চাইল তার দৃষ্টিপথ থেকে।

কিন্তু সহসা ঘূর্ণি তুলে পাকসাট খেল মবি ডিক। খপ করে কামড়ে ধরল র‍্যাডনীকে এবং নিমেষে ডুব দিল জলে।

নৌকোর ওপর দড়ি ধরে বসেছিল স্টীলকিল্ট। হঠাৎ দড়ির হ্যাঁচকা টানে নৌকো ডুবু-ডুবু হতেই ছুরী বার করে কেটে দিল দড়ি। মুক্ত মবি ডিক ডুব-সাঁতার কেটে বেশ কিছুদূরে গিয়ে যখন মাথা তুলল—দেখা গেল তার কষাল চোয়ালে ঝুলছে র‍্যাডনীর লাল উলের সার্ট!

## তিমিদের দানবিক চিত্র

দৈত্য-মাছেদের দানবিক চিত্র কোনদিনই নিখুঁতভাবে আঁকা সম্ভব হবে না। হাতীকে সঠিক আঁকা যায়; কারণ হাতী চোখের সামনে থাকে। কিন্তু তিমি জলে ডুবে থাকে। তিমিকে জল থেকে আস্ত তুলে আনাও সম্ভব নয়। জাহাজে বসে চিত্রশিল্পীর পক্ষে ভাসমান তিমির ছবি আঁকাও অসম্ভব ব্যাপার। তিমি ঢু মেরে ডুবিয়ে দেবে জাহাজকে।

হিন্দুরা এলিফ্যাণ্টা গুহায় বিষ্ণুর মৎস্য-অবতারের ছবি এঁকেছেন। অর্ধেক মানব, অর্ধেক তিমিরূপে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীবিষ্ণু। কিন্তু গলদ রয়ে গেছে তিমির ল্যাজে। ঠিক যেন দক্ষিণ আমেরিকার অ্যানাকোন্ডা সাপের ল্যাজ—খাঁটি তিমির চ্যাপ্টা ল্যাজ নয়।

ওল্ড গ্যালারীতে খৃস্টানদের আঁকা মৎস্য-চিত্রও হিন্দুদের তুলনায় এমন কিছু নিখুঁত নয়। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী গাইডো এঁকেছেন, কিভাবে সাগর-অথবা তিমির খপ্পর থেকে অ্যানড্রোমেডাকে উদ্ধার করা হচ্ছে। কিন্তু এ মডেল পেলেন কোথায় গাইডো?

হোগার্থের ছবিতেও দেখি এক কিম্ভূতকিমাকার সাগর-দানোর ছবি—পিঠে একটা হাওদার মত বস্তু—মুখে হাতীর দাঁতের মত দাঁত।

ওল্ড বাইবেলে আঁকা জোনার তিমির ওকি মূর্তি আঁকা হয়েছে?

একটি ওলন্দাজ বইতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিমি সম্বন্ধে লিখতে যে ছবিটি আঁকা হয়েছে—তা ভুল। তিমির ল্যাজ কখনো খাড়া হয়?

ইংরেজ ক্যাপ্টেন কলনেট কেপহর্ণ ঘুরে এসে স্পার্ম তিমির যে ছবি আঁকলেন, তাতে শুধু চোখটার মাপই হল পাঁচ ফুট জানলার মত!

তিমির কংকাল থেকে কি তিমির চেহারা আঁকা সম্ভব? মোটেই নয়। যেমন, তিমির হাড়-সংযোগ অদ্ভুত। দুপাশের দুটি পাখনার হাড়ে চারটি করে আঙুল—অবিকল মানুষের আঙুলের মত—শুধু বুড়ো আঙুল আর তালু নেই। চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে বলে বোঝা যায় না।

## ছবি—তিমি অভিযানের এবং তিমির

মোটামুটি নিখুঁত ছবি যে একেবারেই নেই, তা নয়। রাইট তিমির সবচেয়ে ভাল ছবি এঁকেছেন স্কোর্সবি। স্পার্ম তিমির ওপর হামলা চালানোর

সময়ে যে লণ্ডভণ্ড ভয়ানক দৃশ্য দেখা যায় সমুদ্রবক্ষে, তার দুটি তৈলচিত্র এঁকেছেন ফরাসী চিত্রকর গার্ণারী। গার্ণারী সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। তবে তিনি যে তিমি অভিযান সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা রাখেন অথবা তিমি শিকারীদের কাছে খুঁটিনাটি অনেক কিছু শিখে নিয়েছেন—তাতে সন্দেহ নেই।

ফরাসীরা চিরকালই ভাল ছবি আঁকেন। গার্ণারী ছাড়াও ডুরাণ্ডের দুটি তৈলচিত্র আমার ভাল লেগেছিল সেই কারণেই। রাইট তিমি নিধনের অদ্ভুত ছবিটা ভোলবার নয়। সে কী দৃশ্য! হার্পুন গেঁথে আছে, বাল্তি ভাসছে, মানুষগুলো তিমির চারধারে সাঁতরাচ্ছে! দূরে তিমিজাহাজে তিমি ফুটছে কড়াইতে—ধোঁয়া উঠছে আকাশে। ঠিক যেন কামারের কারখানা!

## তিমির ছবি—দাঁতে, কাঠে, লোহার পাতে, পাথরে, পাহাড়ে, তারকায়, রঙে

লণ্ডনের টাওয়ার-হিলে গেলে খঞ্জপদ এক ভিখারী আপনার সামনে একটা রঙকরা বোর্ড এনে রাখবে। তাতে দেখবেন শোচনীয় এক দৃশ্য—কিভাবে তিন তিনটে তিমির সঙ্গে লড়ছে তিনটে নৌকো এবং এই হতভাগ্যের পা খানা কড়মড় করে কামড়াচ্ছে একটি তিমি।

এ ছাড়াও তিমির ছবি খোদাই করা হয়েছে স্পার্ম তিমির দাঁতে, রাইট তিমির চোয়ালের হাড়ে। জাহাজে বসেই নাবিকরা ছুরী দিয়ে খোদাই করে এই ছবি—ভরিয়ে রাখে অলস মুহূর্ত। খুব সুন্দর না হলেও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বর্বরদের মত আমরা হাঙরের দাঁত খুদে এমন অদ্ভুত শিল্পসামগ্রী তৈরী করতে পারি যা গ্রীক বর্বর আর্চিলের ঢালের সমান সুন্দর হতে পারে।

সাউথ-সী যুদ্ধ-কাঠের ওপর তিমির ছবি আকছার দেখতে পাবেন মার্কিন তিমি শিকারীদের কাছে।

মান্ধাতা আমলের কোনো কোনো গির্জের চূড়ায় হাওয়ার গতি-নির্দেশকটি কিন্তু লোহার পাত কেটে তৈরী তিমি!

অনেক পাহাড়ের গায়ে ঘাস-সবুজ তিমির চেহারাও দেখা যায় বহু দূর থেকে।

## বৃট

উত্তর-পূর্ব দিকে যেতে যেতে আমরা এসে পড়লাম যেন একটা ভাসমান গমের ক্ষেতের মধ্যে। ঝকঝকে হলুদ পাকা গম যেন হাওয়ায় দুলছে মাইলের পর মাইল জুড়ে।

এর নাম বৃট। অতি সূক্ষ্ম হলদে পদার্থ। রাইট তিমির খাদ্য। দলে দলে রাইট তিমি গোগ্রাসে গিলতে আসে বৃট। সচল পাহাড়ের মত জল কেটে এগিয়ে যায়—ঝাঁঝরির মত মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়—থাকে শুধু বৃট। ঘাস কাটার মত ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দ উঠতে থাকে বিরামবিহীন ভাবে, অলস দেহ সচল পাহাড়ের মত ভেসে যায় হলুদক্ষেত্র ভেদ করে—পেছনে পড়ে থাকে নীল জলের রেখা।

স্পার্ম তিমিশিকারীরা রাইট তিমির পেছনে ধাওয়া করে না। পিকুঅড স্পার্ম তিমিশিকারী। তাই এই মহান্ দৃশ্য দুচোখ ভরে দর্শন করলাম— রক্ত-লাল করলাম না।

## স্কুইড

বৃট-ক্ষেত্র ভেদ করে এগিয়ে চললাম জাভার দিকে। এইসময়ে মাঝে মাঝে গভীর রাতে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল রহস্যময় সেই রূপোলী ফোয়ারা।

কিন্তু একদিন ভোরে একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল। ঊষার সোনালী কিরণ নীল সাগরকে অপরূপ সুষমায় ভরিয়ে তুলেছে। তরঙ্গে তরঙ্গে কানাকানি চলছে মৃদু শব্দে। এমন সময়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল ড্যাগ্‌গু মাস্তলের মাথা থেকে।

দেখল, একটা প্রকাণ্ড সাদা বস্তু ভাসছে নীল জলের ওপর।

চোখ কচলে নিয়ে ফের তাকাল ড্যাগ্‌গু। মবি ডিক নাকি?

হঠাৎ শ্বেত বস্তুটা ডুবে যেতেই আর স্থির থাকতে পারল না ড্যাগ্‌গু। চেঁচিয়ে উঠল বিষম তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—"সাদা তিমি···সাদা তিমি!"

সাড়া পড়ে গেল নিচের ডেকে। পা খটখটিয়ে বেরিয়ে এলেন আহাব। সাদা তিমি দেখতে পেলেন না। কিন্তু বসে থাকতেও পারলেন না। তক্ষুণি চারটে নৌকো নামিয়ে চললেন তিমির সন্ধানে।

কিছুদূর গিয়ে দাঁড় তুলে নিয়ে সবাই দাঁড়িয়ে আছি সাদা তিমির ভেজে

ওঠার প্রতীক্ষায়—এমন সময়ে দেখলাম সেই দুর্লভ দৃশ্য!—এ দৃশ্য সচরাচর কোনো নাবিক দেখতে পায় না!

বিরাটকায় একটা সাদা বস্তু ভেসে উঠল জলের ওপর। গায়ের রঙ ঠিক সাদা নয়—ঘি রঙের। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কয়েক ফার্লং। অপার্থিব আকারহীন বীভৎস বপুর ওপর কিলবিল করছে যেন অগুন্তি অ্যানাকোন্ডা সাপ—লক্ষ্য-হীনভাবে শুঁড় নাড়ছে নাগালের মধ্যে যাকে পাবে তাকে নাগপাশে বাঁধবার জন্যে। মুখটা ঠিক কোথায় দেখা যাচ্ছে না।

এই হল স্কুইড—স্পার্ম তিমির একমাত্র খাদ্য। এদের কামড়ে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যেই বিধাতা ওদের দাঁতের সারি দিয়েছেন—জ্ঞাতিভাইদের দেননি। অন্য তিমিরা খাদ্য আহরণ করে জলপৃষ্ঠে—মানুষ গিয়ে খাদ্যবিতরণ করছে এমন দৃশ্যও দেখা গিয়েছে। কিন্তু স্পার্ম তিমি অতল সমুদ্রের নিতল অঞ্চল থেকে তুলে আনে আপন খাদ্য। তাড়া খেয়ে বিশ তিরিশ ফুট লম্বা স্কুইডের শুঁড় উপড়ে দেয় জলপৃষ্ঠে—যা দেখেই শিকারীরা বোঝে ওদের খাদ্য কি।

এহেন বিরাটকায় স্কুইড দেখে একটি কথাও বললেন না আহাব। নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দিলেন জাহাজের দিকে।

কুঈকোয়েগ কিন্তু সেদিনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল—স্কুইড যখন দেখা গেছে—স্পার্ম তিমির সঙ্গে মোকাবিলা আসন্ন।

## লাইন

'লাইন' শব্দটার মানে জানা দরকার এবার। হার্পুনের পেছনে যে দড়ি, তারই নাম লাইন। এক ইঞ্চির দুই তৃতীয়াংশ মোটা, লম্বায় দুশ ফ্যাদমেরও বেশী (এক ফ্যাদম ছফুটের সমান)। আগে তৈরী হত পাট দিয়ে—তাতে থাকত আলকাতরার বাষ্প। বেশী আলকাতরা দিলে দড়ি টেঁকে না—বরং শক্ত হয়ে যায়। অল্প আলকাতরায় দড়ি নরম থাকে, অল্প জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা যায়—তিমি শিকারীদের নৌকোয় যা একান্ত দরকার একজন খালাসীর সারা সকালটা যায় এই কাজে।

ইদানীং ম্যানিলা দড়ি চালু হয়েছে। দেখতে সোনালী—আরো নরম। পাটের লাইন কালচে—ভারতীয়। ম্যানিলা লাইন সোনালী—মার্কেসিয়ান।

লাইন অত্যন্ত মজবুত দড়ি। এর একান্নটি ফেঁসোর প্রত্যিটি একশ কুড়ি

পাউণ্ড ঝুলিয়ে রাখতে পারে। তার মানে একটা লাইন তিন টন ওজনের ভার সইতে পারে।

নৌকোর ওপর একটা কাঠের বালতির মধ্যে কুণ্ডলী আকারে রেখে দেওয়া হয় বারশ ফুট লম্বা লাইন। তলার প্রান্ত ফাঁসের আকারে বেরিয়ে থাকে একটা ফুটো দিয়ে—যাতে এক নৌকোর লাইন টেনে নিয়ে তিমি পালালে আরেক নৌকোর লাইনে শেষ প্রান্তটা লাগিয়ে দেওয়া যায়

কাঠের বালতিতে রাখা হয় নিরাপত্তার খাতিরে। এলোমেলো ভাবে দড়ি পড়ে থাকলে পায়ে, হাতে, গায়ে জড়িয়ে যেতে পারে; মুমূর্ষু তিমি উল্কা বেগে দড়ি সমেত টেনে নিয়ে যেতে পারে বোটের মানুষদের।

ইংরেজ তিমি শিকারীরা দুটো ছোট বালতি রাখে—একই দড়ি দুটো বালতিতে থাকে। তাতে সুবিধে অনেক। স্বল্প পরিসর নৌকোয় একটি বড় বালতি অত্যন্ত অসুবিধাজনক। আমেরিকানরা তা সত্বেও একটা বালতিই পছন্দ করে।

লাইনের ওপরের প্রান্ত কিন্তু পুরো নৌকোকে বেষ্টন করে রাখে। দড়িটা প্রতি দাঁড়ির দাঁড়ের ওপর দিয়ে কব্জি ঘেঁসে গলুই ঘিরে আসে এদিকের গলুইতে। সেখানে ষাট সত্তর ফুট লাইন আলাভাবে পড়ে থাকে বাক্সের ওপর এবং ডগাটা বাঁধা থাকে হার্পুনের পেছনে।

অর্থাৎ হার্পুনে টান পড়লে বিপদ প্রত্যেকের। প্রত্যেকেই হ্যাঁচকা টানে ছিটকে যেতে পারে জলে। এই কারণেই প্রায় খবর আসে ধাওয়া করতে গিয়ে অমুক জাহাজের অমুক ব্যক্তি জলে তলিয়ে গিয়েছে।

তাতে কি? জীবন দর্শনই তো তাই! চকিত বিপদের করাল ছায়া কি শুধু একজনের ওপরেই পড়ে? অনেককেই গ্রাস করে!

## স্টার মারল একটা তিমি

দুপুর। রোদ্দুর ঝলমল করছে। কিন্তু ভ্যাপসা গরমে আইঢাই করছে প্রাণটা।

আমার ডিউটি পড়েছে গলুই থেকে সমুদ্রে নজর রাখার। ঠায় বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি আসছে। ঢুলছে মাস্তুলের মাথায় যারা আছে, তারাও।

আচমকা যেন বুদবুদ ফেটে পড়ল আমার চোখের পাতায়। শক্ত মুঠোয় দড়ি খামচে ধরলাম এবং চোখ খুলেই দেখলাম একটা স্পার্ম তিমি।

মাত্র পঞ্চাশ ফ্যাদম দূরে ভাসছে চকচকে কালো তিমিটা। রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে আয়নার মত ঝকমকে পিঠ থেকে।

নিমেষে জেগে উঠল ঘুমন্ত জাহাজ। সাজসাজ রব পড়ে গেল। সচকিত তিমি ঈষৎ সরে এল জাহাজের পাশে। ঝপাঝপ নেমে এল নৌকো চারখানা। আওয়াজ করতে বারণ করলেন আহাব। বন্ধ রইল দাঁড়টানা—এমন কি কথাবার্তাও।

আচম্বিতে চল্লিশফুট উর্ধ্বে ল্যাজ তুলে গোঁৎ মেরে ডুব দিল তিমি। সঙ্গে সঙ্গে ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে পাইপ ধরিয়ে নিল স্টাব। শুরু হল হাস্য পরিহাস। এখন কথা বললে ক্ষতি নেই।

নির্দিষ্ট সময় অন্তে ফের ভেসে উঠল স্পার্ম-তিমি—স্টাবের নৌকোর খুব কাছে। অর্থাৎ জল্লাদ হতে হবে তাকেই।

আর নীরবতার দরকার নেই। কারণ, তিমি বুঝতে পেরেছে পেছনে শিকারী লেগেছে। ঝপাঝপ শব্দে দাঁড় পড়তে লাগল, পাইপ কামড়েও বচনের তুবড়ি ছোটাল স্টাব—উল্কা বেগে নৌকোখানা গিয়ে পড়ল ভাসমান তিমির সমীপে।

পরক্ষণেই হুকুম দিল স্টাব—"ছোঁড়ো টাশটেগো!"

নিক্ষিপ্ত হল হার্পুন। সাঁৎ করে দাঁড়িদের কব্জির ওপর দিয়ে ছুটে গেল লাইন। শেষ মুহূর্তেও খোঁটার গায়ে লাইনটা দুপাক জড়িয়ে দিয়েছিল স্টাব—তাই পাটের ফেঁসো রেণু আকারে উঠতে লাগল শূন্যে—মিশে গেল স্টাবের পাইপের ধোঁয়ার সঙ্গে। একজন তাড়াতাড়ি টুপী খুলে নোনা জল তুলে ঢেলে দিল বালতির লাইনে।

দড়ি ছুটছে, দড়ির টানে হাঙরের মত জল ছিন্নভিন্ন করে ছুটছে নৌকো। স্পার্ম তিমিদের মাথা প্রকাণ্ড হলেও হাল্কা—সহজে জলে ভাসে। পাইলট-বোটের মত মাথা উঁচিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটতে পারে। এখনও ছুটছে সেইভাবে চলার পথে যেন গোটা প্রশান্ত মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে এলাম। তারপর আস্তে আস্তে ঢিলে হয়ে এল টান-টান লাইন—তিমির বেগ কমছে।

স্টাবের হুকুমে এবার নৌকো এগিয়ে চলল তিমির কাছে। ফুক-ফুক পাইপের ধোঁয়া আর ভলকে ভলকে জলবাষ্প যেন তালে তাল মিলিয়ে উঠছে ঢেউয়ের ওপর। হাঁটু গেড়ে বসে একটার পর একটা বল্লম নিক্ষেপ করছে স্টাব। নীল জল লাল হয়ে গেল তিমির রক্তে।

আচ্ছন্নের মত ভাসছে মহাকায় তিমি। আরো কাছে গেল নৌকো।

পাইপ কামড়ে ধরে লম্বা বর্শাটা ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল স্টাব—হেঁট হয়ে আস্তে আস্তে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঢোকাতে লাগল ভেতরে।

ঠিক যেন সোনার ঘড়ি খুঁজছে। তিমিটা গিলে পালিয়েছিল—পাছে ভেঙে যায়, তাই সন্তর্পণে বল্লমের ডগা দিয়ে অন্বেষণ করছে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু সোনার ঘড়িটা তিমির প্রাণ কেন্দ্র। অচিরে বল্লমের ডগা পৌঁছে গেল সেখানে।

সশব্দে নিঃশ্বাস নিতে লাগল মুমূর্ষু—রন্ধ্রপথে জল-ফোয়ারার বদলে ঠিকরে এল চাপ চাপ রক্ত—শূন্য হতে ঠিকরে পড়ল কালো গায়ে—গড়িয়ে পড়ল জলে।

"সব শেষ, মিস্টার স্টাব," বলল টাশটেগো। "হৃদপিণ্ড ফেটে গেছে!"

"হ্যাঁ, দুটো পাইপই শেষ," বলে পাইপের ছাই লোনা জলে ঝেড়ে ফেলে এই প্রথম চিন্তাকুটিল চোখে চেয়ে রইল প্রাণহীন জলদানবের পানে।

**বল্লম**

বল্লম, বর্শা, হার্পুন নিক্ষেপ সম্বন্ধে দু'চার কথা এই বেলা বলে নিই।

রেওয়াজ হল, নৌকো জলে ভাসিয়েই নৌকোর মাথায় বসবে হার্পুনার স্বয়ং এবং সবাইকে তাতিয়ে তোলার জন্যে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড় টেনে নিয়ে যাবে নৌকোকে তিমির কাছে।

এ অবস্থায় অসুরও বেদম হয়ে পড়ে। কিন্তু ঠিক তখনি হুকুম হবে—ছোঁড়ো হার্পুন।

বিশ তিরিশ ফুট দূর থেকে অত ভারী হার্পুন নির্ভুল লক্ষ্যে ছোঁড়া কি সোজা কথা? বিশেষ করে বেদম হয়ে যাওয়ার পর?

তারপর মজা দেখুন। যেই হার্পুন লক্ষ্যে গিয়ে গাঁথল—অমনি স্থান বদল করল হার্পুনার আর মেট। শেষ কেরদানি দেখানোর পালা তখন মেটের!

এ কি রকম ব্যবস্থা! হার্পুনারের কখনো উচিত নয় দাঁড় টানা—তার ওপরেই তো নির্ভর করছে তিমি নিধন!

এই কারণেই নৌকোর ওপরই শিরা ছিঁড়ে মারা গেছে কত হার্পুনার—অনেকে অকর্মণ্য হ'য়ে গিয়েছে ডাঙায় ফেরার পর।

### ক্রচ-

নৌকোর গলুইয়ের কাছে একটা ফুট দুয়েক লম্বা কাঠ আড়াআড়িভাবে লাগানো থাকে পাটাতনে। একে বলে ক্রচ। পাশাপাশি দুটো হার্পুনের কাঠের হাতল এই ক্রচের গায়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়।

এ ছাড়াও বাড়তি বল্লম থাকে নৌকোয়।

দুটো হার্পুনের দড়িই কিন্তু বাঁধা থাকে একই লাইনের সঙ্গে। নিয়ম হল, প্রথম হার্পুন ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়টি ছুঁড়তে হবে যাতে ছোটার সময়ে টানের চোটে একটি খুলে গেলেও অপরটি লেগে থাকে।

কার্যক্ষেত্রে ক্ষিপ্রতম হার্পুনারের পক্ষেও দ্বিতীয় হার্পুন ছোঁড়া সম্ভব হয় না। এদিকে উল্কাবেগে ছুটছে তিমি—লাইন বেরিয়ে যাচ্ছে হু-হু করে। তাই চকিতে দ্বিতীয় হার্পুন ফেলে দিতে হয় জলের মধ্যে—নইলে প্রাণ সংশয় ঘটতে পারে নৌকোর প্রত্যেকেরই।

তাহলেই বুঝে দেখুন অবস্থাটা। অতি দুর্ধর্ষ একটিমাত্র তিমিকে যদি চারটে নৌকো ঘিরে ধরে চারদিক থেকে এবং প্রতি নৌকোয় রাখা বাড়তি বল্লম ছুঁড়ে ঘায়েল করে আনে তিমিকে—তাহলেও জানবেন জলের মধ্যে, বিপজ্জনক ভাবে ছুটছে আট দশটা ধারালো হার্পুন। এ অবস্থায় নৌকো উল্টে জলে ঠিকরে পড়লে পরিণতিটা কল্পনা করতে পারেন?

### স্টাবের নৈশভোজ-

মরা তিমিকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হল জাহাজের পাশে। মাথা রইল সামনের গলুইয়ের দিকে—ল্যাজ পেছনের গলুইয়ের দিকে। যেন একজোড়া প্রকাণ্ড ষাঁড়। একটা ঘুমোচ্ছে—আর একটা দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাপ্টেন আহাব তিমি শিকারে বেরিয়েছিলেন সোৎসাহে—কিন্তু মরা তিমিটার দিকে উদাস চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সেই যে কেবিনে ঢুকলেন—বেরোলেন পরের দিন সকালে। মৃত তিমি দেখে বোধ হয় ওঁর মনে পড়েছিল মবি ডিকের কথা এখনো তাকে দেখা যায় নি—গায়ে আঁচড় কাটা তো দূরের কথা।

স্টারবাক যদিও চীফ মেট, কিন্তু শান্ত গম্ভীর ভাবে স্টাবের হাতে সব ভার দিয়ে তিনিও চলে গেলেন।

কারণটা বুঝলাম স্টাবের হাঁক ডাক শুনে। মহা পেটুক সে; তিমি-রসিক ব্যক্তি। লণ্ঠন জ্বালিয়ে সেই রাতেই কাটা হল তিমির মাংস—স্টিক রান্না হল মাঝরাত নাগাদ।

ক্যাপস্টান মানে যে উলটোনো ড্রামের গায়ে দড়িদড়া জড়ানো থাকে। তার ওপর থালা সাজিয়ে তিমির তেলের বাতির সামনে স্টিক খেতে বসল অত রাতে। ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে ঘুম থেকে তুলে আনল বুড়ো নিগ্রো রাঁধুনীকে। হাজার হাজার হাঙর কেন অত আওয়াজ করে তিমির গা খুবলে চর্বি নিয়ে যাচ্ছে—তাই নিয়ে বকাবকি করতে লাগল তাকে। খাচ্ছে খাক, কিন্তু আওয়াজ হবে কেন? তাছাড়া এই কি মাংস রান্না হয়েছে? বেশী রান্নার ফলে তো শক্ত হয়ে গিয়েছে 'স্টিক'—হাঙরেও চিবুতে পারবে না। কালকের রান্নায় যেন এই ভুল না হয়। ব্রেকফাস্টে যেন তিমির চপ থাকে, রাত্রে কাটলেট। মাছটা কাটবার সময়ে যেন পাখনার ডগা কেটে নিয়ে আচার করা হয়। ল্যাজের শেষ দিয়েও ভাল আচার হয়!

"অ্যাভাস্ট! ভুল যেন না হয়। স্টিক করতে শেখোনি এখনো! শিখে নাও! এক হাতে মাংস, আরেক হাতে গনগনে কয়লা—চেপে ধরো মাংসর ওপর—দাও থালায় ফেলে! তোফা! তোফা!...এই কি স্টিক হয়েছে? খাও! খাও! খেয়ে দেখো! কি বললে? তোফা? সেরা স্টিক? মিথ্যেবাদী! গির্জেতেও কখনো যাসনি? যা—যা...আবার গিয়ে একবার জন্ম নে ...!"

## খাদ্য হিসেবে তিমি

তিমির তেলের বাতি জ্বালিয়ে তিমির মাংস খাওয়ার বিবরণ শুনে যাঁরা নাক সিঁটকোচ্ছেন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে যৎকিঞ্চিৎ ইতিহাস এবং দর্শন নিবেদন করছি।

তিনশ বছর আগে ফ্রান্সে রাইট তিমির জিভ চড়া দামে বিকোতো অতীব সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে। অষ্টম হেনরীর আমলে জনৈক রাঁধুনীকে মোটা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল পরম উপাদেয় একটি ভোজ্যবস্তু আবিষ্কারের জন্যে। বলাবাহুল্য খাবারটি শুশুকের মাংস থেকে তৈরী এক জাতীয় সস—শুশুক কিন্তু তিমির জাতিভাই—মনে আছে, তো?

শুশুকের মাংসের বড়া আজও অনেকের জিভে জল এনে দেয়।

তিমির মাংস খেতে ভাল, কিন্তু একশ ফুট লম্বা একটা তিমির সামনে বসে

তার মাংস খাওয়া কি সোজা কথা! স্টাবের অত ছুঁৎমার্গ নেই; নেই এস্কিমোদেরও। কে না জানে তিমির মাংস নইলে চলে না তাদের! তিমির তেল থেকে তৈরী অতি উৎকৃষ্ট সরাব কিন্তু এই এস্কিমোদেরই আবিষ্কার। এস্কিমোদের বিখ্যাত ডাক্তার জোগরানদা তো বলেই দিয়েছেন—কচি বাচ্চাদের তিমির চর্বি পাতলা করে কেটে খেতে দিও—রসালো এবং পুষ্টিকর শিশু খাদ্য হিসেবে যা অতুলনীয়। অনেক বছর আগে বেশ কিছু ইংরেজ গ্রীনল্যাণ্ডে আটক পড়ে কিন্তু মরা তিমির মাংস খেয়েই বেঁচেছিল! তিমিটার চর্বি কেটে নিয়েছিল এস্কিমোরা।

চর্বির মাত্রা বেশী থাকার জন্যেই তিমির মাংস খেতে এত ভাল। সমুদ্রের ষাঁড় বললেই চলে তিমিকে। কুঁজটাই দেখুন না—চর্বির ডেলা বইতো নয়—ঠিক মোষের কুঁজের মত সুস্বাদু। তাছাড়া শুধু স্পারমাসেটি জিনিসটাই ক্রীমের মত নরম, নির্ভেজাল—তিন মাসের নারকেলের শাঁসের মত তলতলে, স্বচ্ছ, অর্ধ-জেলী—অথচ এত গুরুপাক যে মাখনের বদলে আহার করা সম্ভব নয়। তিমি শিকারীরা এমন একটি উপাদেয় বস্তুকে কিন্তু অন্যভাবে উদরস্থ করে। ফুটন্ত তেলের মধ্যে সমুদ্র-বিস্কুট ভেজে নিয়ে খায়। আমি নিজে খেয়েছি। অপূর্ব স্বাদ!

বাচ্ছা স্পার্ম তিমির ব্রেন আরো ভাল খেতে। কুঠার দিয়ে করোটি ফুটো করে কেকের মত মগজের টুকরো দুটো বার করে আনতে হয়; তারপর তাতে ময়দা মেখে ভেজে নিন—মনে হবে যেন বাছুরের মাথা খাচ্ছেন, এত উপাদেয়!

বর্বরতা? কে বর্বর নয় বলতে পারেন? মাংসের দোকানে গিয়ে ঝুলন্ত চতুষ্পদগুলোর পানে লোলুপ নয়নে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা করে না? তখন তো বোঝা যায় না কে নরখাদক, আর কে সভ্যমানুষ?

তিমির তেলের বাতি জালিয়ে তিমির মাংস খাওয়া? আপনি নিজে কি সে দোষে দোষী নন? ঐ যে ছুরীটা ধরে রয়েছেন, ওর বাঁট মোষের শিংয়ের—যার জাতভাইয়ের মাংস এই মাত্র খেয়ে এলেন। হাঁসের মাংস খেয়ে দাঁত খুঁটছেন কি দিয়ে? হাঁসেরই পালক দিয়ে নয়? লিখছেন কিসের কলমে? তারই পালকের কলমে নয়?

## হাঙর হত্যা

মরা তিমিকে রাত্রে কাটা হয় না; বাঁধা থাকে জাহাজের গায়ে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসমুদ্রে এ নিয়ম খাটে না। সেখানে এত হাঙর ভোজ খেতে ছুটে

আসে যে রাত ভোর হলে দেখা যায় ছ'ঘণ্টার মধ্যেই শুধু কংকালটা রেখে গিয়েছে জলের নেকড়ে।

তাই এই প্রশান্ত মহাসাগরেরই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সারা রাত জেগে হাঙর তাড়ানো হয় জলে খোঁচা মেরে।

পিকুঅডের ক্ষেত্রে সে রকম অবস্থা দেখা না গেলেও স্টারের নৈশভোজ শেষ হতেই কুঈকোয়েগ এবং আরেকজন মাচা ঝুলিয়ে বসল জলের ওপরে—ঝুলতে লাগল লণ্ঠন। শুরু হল তিমি-কোদাল দিয়ে হাঙর বধ পর্ব। তিমি কোদাল মাটিকাটা কোদালের মত নয়। চ্যাপ্টা, ক্ষুরের মত ধারালো, মুখটা সরু। হাতলটা বিশ থেকে তিরিশ ফুট লম্বা। এই কোদাল দিয়ে হাঙর মারার নিয়ম: ফলাটা মাথায় ঢুকিয়ে দাও। নইলে হাঙর মরবে না। উল্টে বিপত্তি ঘটাবে। নিজেই নিজের কাটা জায়গা কামড়ে খাবে—অন্য হাঙরও দাঁত বসাবে।

লণ্ঠনের আলোয় সে দৃশ্য দেখলে মনে হবে যেন গোটা সমুদ্রটা একটা চীজ—হাজার হাজার হাঙর পোকার মত কিলবিল করছে তার মধ্যে।

হাঙর কিন্তু মরেও মরে না। প্রাণপিঞ্জর শূন্য হলেও কিছুটা তড়িৎ শক্তি অবশিষ্ট থেকে যায় অস্থিসন্ধি এবং হাড়ের মধ্যে—এ যেন সেই অদ্বৈতবাদী প্রাণসত্তা—যা প্রতিটি অণুপরমাণুতে বিদ্যমান। তাই চামড়া ছাড়ানোর লোভে একটা মরা হাঙরকে ডেকে তুলে আর একটু হলে হাতটা খোয়াত কুঈকোয়েগ। করাত-চোয়াল বন্ধ করতে গিয়েছিল এক হাতে—সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে ঝপাং করে নেমে এসেছিল মারণ-চোয়াল—অল্পের জন্যে ফস্কে গিয়েছিল হাতটা!

## কাটাকুটি

সেদিন ছিল শনিবারের রাত। পরের দিন রোববার সকাল থেকে শুরু হল যেন শয়তানের উপাসনা। প্রতিটি নাবিক কসাই হয়ে গেল। যেন সহাজার লাল বণ্ডকে বলি দেওয়া হল সাগরদেবতার সামনে।

প্রথমে ভারী ভারী অনেকগুলো বোঝা জড়ো করা হল মূল মাস্তলের মাথায়। কপিকল বাঁধা হল তাতে। একশ পাউণ্ড ওজনের আঁকশিটা নামিয়ে আনা হল তিমির ঘাড়ের কাছে।

স্টারবাক আর স্টাব নেমে গিয়ে কোদাল দিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ল পাখনার

ঠিক ওপরে। তারপর গর্তের তলা দিয়ে একটা চক্রাকার রেখা কেটে দিল তিমির গায়ে। সব শেষে আঁকশিটা ঢুকিয়ে দেওয়া হল গর্তের মধ্যে।

চালু হয়ে গেল কপিকল। মচ মচ করতে লাগল মাস্তুল—মনে হল যেন সব কটা পেরেক খুলে বেরিয়ে যাবে। মাস্তুলের ডগা হেলে পড়ল একপাশে—কাৎ হয়ে গেল জাহাজ।

আচমকা চড়াং শব্দে কাটা দাগ বরাবর কুঁজটা ছিঁড়ে নিয়ে উঠে গেল আঁকশি। সিধে হয়ে গেল জাহাজ।

এইভাবে খাবলা খাবলা মাংস ঘাড় বরাবর ছিঁড়ে ছিঁড়ে উঠতে লাগল ডেকের ওপর—আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল তিমির দেহ—মাথার দিক উঠতে লাগল ওপরে—উঠতে উঠতে মাস্তুল বরাবর উঠে রইল তিমির মাথা। লম্বা-লম্বিভাবে ঝুলতে লাগল দেহটা।

এবার এগিয়ে গেল হার্পুনার। দক্ষ হাতে তরবারি চালিয়ে একটা ফুটো করল ল্যাজের কাছে চর্বির স্তরে। আর একটা কপিকলের আঁকশি আটকে দেওয়া হল সেখানে। তারপর ঘচাঘচ কোপ মেরে ঠিক মাঝখান থেকে চিড়ে বার করে আনল বিরাট এক্কালি চর্বি—নেমে গেল জাহাজের খোলে আঁকশিতে ঝুলতে ঝুলতে—সেখানে মাংস কাটা হতে লাগল পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে।

এবার কোদাল দিয়ে চর্বি কেটে ঝোলানো হতে লাগল দ্বিতীয় কপিকলের আঁকশিতে। অদ্ভুত সুরেলা কোরাস গানে মুখরিত রইল ডেক।

### কম্বল

তিমির চামড়া কোনটা, এই নিয়ে মতভেদ আছে অভিজ্ঞ তিমি শিকারীদের মধ্যেও।

তিমির চর্বি কাকে বলে আগের অধ্যায়ে তা দেখিয়েছি। আট-দশ ইঞ্চি থেকে বারো-পনেরো ইঞ্চি পুরু চর্বির স্তরে আবৃত থাকে তিমি দেহ। একেই কি তিমির চামড়া বলব?

আমি কিন্তু সদ্য-মরা তিমির গায়ে খুব পাতলা একরকম পদার্থ দেখেছি। হাত দিয়ে রগড়ালে হাতে উঠে আসে। শুকিয়ে যাওয়ার আগে জিনিসটা অতি সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ এবং অভ্রের পাতের মত। যেন মাছের পটপটি দিয়ে তৈরী শিরিষের আঠা। কিন্তু নমনীয় এবং সাটিনের মত কোমল। শুকিয়ে গেলে এই জিনিসই কিন্তু সঙ্কুচিত এবং শক্ত হয়ে ওঠে; তখন তা ভঙ্গুর। এরকম শুকনো পদার্থ আমার বুক মার্ক হিসেবে রেখেছি। দেখেছি,

এর মধ্যে দিয়ে অক্ষরগুলো ঈষৎ বিবর্ধিত আকারে পড়া যায়। তিমির চশমা দিয়ে তিমির বই পড়া আর কি!

কিন্তু এ জিনিসকে কি চামড়া বলা যায়? এত বড় একটা প্রাণীর ত্বক বাচ্চা ছেলের চামড়ার চাইতেও সূক্ষ্ম?

চর্বির স্তরটাকে চামড়া বললেও হিসেবে গরমিল থেকে যায়। একটা মস্ত স্পার্ম তিমির চর্বির স্তর থেকে এক শত পিপে তেল পাওয়া যায়। ওজনের দিক দিয়ে কিন্তু তা পুরো স্তরের তিন চতুর্থাংশ।

তিমির গায়ে অদ্ভুত আঁকিবুঁকি দেখা যায়। মিশরের পিরামিডের দেওয়ালে যে সব গুপ্ত সংকেতলিপির অর্থ আজও মনুষ্যবুদ্ধির অতীত, তিমি-গাত্রের জটিল সংকেতলিপি তার চাইতে কম দুর্বোধ্য নয়। আমার মনে হয় এগুলো আঁচড়ের দাগ। হিমবাহের গায়ে গা ঘসে, চোরা পাহাড়ে আছড়ে পড়ে অথবা তিমি মহলে দাঙ্গা করে গা ক্ষতবিক্ষত করার চিহ্ন।

চর্বির স্তরটা কিন্তু তিমির গায়ে কম্বলের স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে। এই স্তরের জন্যেই সবরকম আবহাওয়ায় তিমি এত নিরাপদ। গ্রীনল্যাণ্ডের কনকনে জলে উষ্ণ রক্ত জমে যায়—মানুষ মারা যায়। মাছেদের কথা বাদ দিন—তাদের রক্ত ঠাণ্ডা, ফুসফুস নেই। কিন্তু তিমির রক্ত অত গরম থাকে কি করে? বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে কি করে? পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মেরু-তিমির রক্ত গ্রীষ্মকালে বোর্ণিও-নিগ্রোর রক্তের চাইতেও অধিক উষ্ণ!

হে মানব! তিমি-কায়দায় নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন! বরফের মধ্যেও উষ্ণ থাকুন! নিরক্ষীয় অঞ্চলে শীতল থাকুন! সর্ব ঋতুতে সর্ব দেশে তিমির মত স্বচ্ছন্দে বিহার করুন!

## অন্ত্যেষ্টি

মুণ্ডহীন ধড়টা ভাসিয়ে দেওয়া হল সাগরে। মাংসখেকো ফাউল ধারালো চঞ্চু বাড়িয়ে কর্কশ চীৎকারে আকাশ থেকে ছোঁ মারল তার মরা দেহে—জল থেকে উঠে এল হাঙরের দল। বহু দূর পর্যন্ত এই দৃশ্য দেখলাম আমরা।

এরপর জানি নামহীন আতংকে পরিবৃত থাকব সবাই। এ তল্লাট মাড়াব না দীর্ঘকাল। পাশ কাটিয়ে যাব—তবু ঠিক যেখানে তিমিটাকে মেরেছি—সেখান দিয়ে যাব না।

ভূত কি শুধু স্থলেই থাকে?

মরুভূমিতেই কেবল নরসিংহ মূর্তি দেখা যায়? জলে নয়? পিকুঅডের ডেকে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নই মনে জাগল সেদিন।

তিমির ঘাড় ঠিক কোথায়, তা না কাটলে বলা যায় না। মাথা আর ধড় যেখানে মিলেছে, সেই জায়গাটাই সবচেয়ে মোটা। অথচ এইখান থেকেই মাথা কেটে বার করতে হয় ডুবন্ত অবস্থায়।

সার্জনের পক্ষেও না দেখে ছুরী চালানো সম্ভব হয় না। কিন্তু স্টারবাক মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন মুণ্ডটা। কপিকলে ঝুলতে লাগল রক্ত ঝরা মাথা।

তখন ভরদুপুর। খাওয়ার সময়। ডেক ফাঁকা হয়ে যেতেই ক্যাপ্টেন আহাব এসে দাঁড়ালেন ঝুলন্ত তিমি-মুণ্ডর সমীপে। স্টাবের কোদাল তুলে নিয়ে ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিলেন মুণ্ডর গায়ে—হাতলটাকে খঞ্জযষ্টির মত বগলে চেপে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন মুণ্ডের পানে!

সমুদ্রের অতলে অজ্ঞাত অঞ্চলে যার অবাধ গতি, তার প্রেতাত্মার কাছে যেন জানতে চাইলেন অজানা সেই তলভূমির খবরাখবর—যেখানে বহু নাবিক চিরনিদ্রায় শুয়েছে—বহু জাহাজ তলিয়েছে—যেখানে আজ পর্যন্ত ডুবুরী যায়নি—যাবে না!

## জেরোবোয়ামের গল্প

আচমকা চীৎকার শোনা গেল মাস্তুলের মাথা থেকে—"জাহাজ! জাহাজ!"

অনেক দূরে ভাসছে একটা জাহাজ। তিমি জাহাজ। জল এত বিক্ষুব্ধ যে কাছে আসা সম্ভব নয়। তবুও সংকেত জ্ঞাপন করলেন ক্যাপ্টেন।

প্রত্যেক আমেরিকান তিমি জাহাজের একটা নিজস্ব সংকেত থাকে। একটা বইতে সব সংকেত দেওয়া থাকে এবং প্রত্যেক ক্যাপ্টেন কাছে রাখেন বইয়ের কপি। ফলে, বহু দূর থেকেও শুধু সংকেতের সাহায্যে জানা যায় জাহাজের নাম কি।

পিকুঅডের সংকেতের প্রত্যুত্তরে জানা গেল আগন্তুক জাহাজের নাম জেরোবোয়াম—নানটাকেট ফিরছে।

একটা নৌকো নামল জাহাজ থেকে। এগিয়ে এল কাছে। হেঁকে বলল—জাহাজে মড়ক লেগেছে। তাই বেশী কাছে যাওয়া হবে না। যদিও এই বোটের কেউ এখনো মড়কে আক্রান্ত হয়নি।

বক্তার নাম ক্যাপ্টেন মেহিউ। পাশেই দাঁড়িয়ে অদ্ভুত তেজদৃপ্ত এক মূর্তি। হলদে চুল হাওয়ায় উড়ছে। চোখে উন্মত্ত দৃষ্টি। বয়স অল্প।

ওকে দেখেই স্টারবাক ফিসফিসিয়ে উঠলেন—"এর কথাই টাউন-হো নাবিকদের কাছে শুনেছিলাম। চিনি ওকে। গ্যাব্রিয়েল!"

হ্যাঁ, গ্যাব্রিয়েল! ভণ্ড প্রতারক গ্যাব্রিয়েল! চোরাসিঁড়ি দিয়ে মন্দিরে উঠে দৈববাণী শোনাত। তারপর কাজ নিল জাহাজে। স্বমূর্তি ধরল জাহাজ জলে ভাসতেই। তার তেজালো বক্তৃতা, অভিশাপ আর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভয়ে কুঁকড়ে গেল একদল নাবিক—স্বীকার করল বশ্যতা; কোণঠাসা হয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন।

এই সেই গ্যাব্রিয়েল! ক্যাপ্টেন মেহিউ বললেন তাঁর দুর্দৈবের কথা। মড়ক লাগতেই সুবিধে হয়ে গেল গ্যাব্রিয়েলের—বিশেষ করে তাকে মড়ক না স্পর্শ করায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিকরা তাকে মহাপুরুষ বলেই মেনে নিলে।

ক্যাপ্টেন আহাব বললেন—"চুলোয় যাক সে কথা। মবি ডিককে দেখেছেন?"

জবাবে মেহিউ যা বললেন, তা আরো ভয়ংকর! গ্যাব্রিয়েলের আরেক ভবিষ্যদ্বাণী সফল করেছে মবি ডিক। বারণ করেছিল সে, মাস্তুলে উঠে অভিশাপের পর অভিশাপ বর্ষণ করেছিল—কিন্তু চীফ মেট ম্যাসি কর্ণপাত না করে এগিয়ে গিয়েছিল নৌকো নিয়ে—একটা হার্পুন বসিয়েও ছিল—তারপর যেন প্রলয় ঘটে গেল। জাহাজ থেকেই দেখা গেল সেই দৃশ্য!

আচম্বিতে জল ফুঁড়ে উঠে এল একটা সাদা ছায়া—নিমেষে বোটের ডগা থেকে ম্যাসিকে কামড়ে ধরে ছুঁড়ে দিল শূন্যে—পঞ্চাশ ফুট দূরে অর্ধবৃত্তাকার পথে ঝপাৎ করে জলে পড়ে তলিয়ে গেল ম্যাসি—আর পাওয়া গেল না!

সফল হল গ্যাব্রিয়েলের ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণী—মবি ডিক তিমিরূপী উপদেবতা—যে এগোবে, সে মরবে!

আহাব বললেন—"আমি এগোবো—দেখতে পেলেই মারব!"

"মরবি তুই! মরবি তুই! মরবি তুই!" দাঁত খিঁচিয়ে বজ্রগর্জন করে উঠল গ্যাব্রিয়েল।

ভ্রূক্ষেপ করলেন না আহাব। হেঁকে বললেন—"ক্যাপ্টেন মেহিউ, আপনাদের একটা চিঠি এনেছি—নিয়ে যান।"

সব জাহাজেই এরকম অনেক চিঠি থাকে। দৈবাৎ সেই জাহাজের দেখা পেলে চিঠি দেওয়া হয়—নইলে তিন চার বছর পরে ফিরে যায়।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে তিমি-কোদালের হাতলে ফুটো করে ঢুকিয়ে দিতে গিয়ে চমকে উঠলেন আহাব।

চিঠির গায়ে মেয়েলী ছাঁদে লেখা চীফ মেট ম্যাসির নাম!

ম্যাসির বিধবা স্ত্রীর লেখা চিঠি!

## বাঁদুরে দড়ি

আগেই বলেছি, কপিকলের আঁকশিতে চর্বির স্তর আটকে দিতে হয় গর্তের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে। কিন্তু আটকায় কে?- হার্পুনার।

কুঈকোয়েগকে নামতে হল জলে। কখনো ডুবে, কখনো ভেসে লেংটি পরে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে সাঁতরায় সে নির্ভীকভাবে। তার সঙ্গে একটা দড়ির সংযোগ রইল আমার—প্রধান সহযোগীর। দড়িটার দু'প্রান্ত বাঁধা রইল দুজনের কোমরের ক্যানভাস বেল্টের সঙ্গে। তার টানে আমি হুমড়ি খেলাম, আমার টানে তাকে সরে আসতে হল।

অন্য দুই হার্পুনার—ট্যাশটেগো আর ড্যাগ্‌গু— ঝুলন্ত মাচায় বসে তিমি-কোদাল দিয়ে হাঙর মেরে গেল আশেপাশে। মরা তিমির উপাদেয় মাংস না থাকলে হাঙরের ঝাঁক কুঈকোয়েগকেই ছিঁড়ে খেত। কিন্তু তারা নির্বিকার —বরং কুঈকোয়েগকে লাথি মেরে সরিয়ে দিতে হল আগুয়ান হাঙরদের। সবার ওপরে ঝপাঝপ তিমি-কোদালে দ্বিখণ্ডিত হতে থাকল হাঙরদের মাথা।

দৃশ্যটা গা শিউরোনো! কিন্তু আমাদের প্রত্যেকেরই জীবন তাই নয় কি? জল মানেই তো এই সংসার··· এই জীবন; হাঙর হল শত্রুর দল; কোদালগুলো আপনার বন্ধু। হাঙর, কোদাল আর সংকটের আচারে আমরা নিমজ্জিত।

কুঈকোয়েগের একমাত্র ভরসা কিন্তু ওর দারুদেবতা—য়োজো!

## রাইট তিমি বধ

ভুললে চলবে না, এত কাণ্ডের মধ্যেও স্পার্ম তিমির ভয়ংকর মুণ্ডটা ঝোলানো ছিল জাহাজের পাশে। অলৌকিক শক্তি বলে বলীয়ান গ্যাব্রিয়েল পর্যন্ত ক্ষণেকের জন্তে সিঁটিয়ে গিয়েছিল ঝুলন্ত মুণ্ডর চেহারা দেখে।

কেন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল মুণ্ডটা, সে রহস্য পরিষ্কার হল অচিরে।

আবার সেই হলুদ ক্ষেত্র দেখা দিয়েছে জাহাজ চলার পথে। অর্থাৎ রাইট তিমি আশেপাশেই আছে। আমরা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। কারণ রাইট তিমি নিধন আমাদের লক্ষ্য নয়—হলে অনেক আগেই ও কাজ করতাম।

তা সত্ত্বেও যখন হুকুম হল দেখলেই যেন রাইট তিমি মারা হয়। অবাক হলাম বইকি।

যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই লম্বা ধাঁচের স্পাউট অর্থাৎ জল নিক্ষেপক ফুটো দেখা গেল জলপৃষ্ঠে—সারি সারি রাইট তিমি চলেছে।

স্টাব আর ফ্লাস্ক নৌকো নিয়ে তেড়ে গেল—দেখতে দেখতে দুটো নৌকোই মিলিয়ে গেল দিগন্তে। সহসা প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখে বুঝলাম, নৌকো ছুটেছে তিমির টানে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম, সাদা জলের ফেনা ঘুরে এগিয়ে আসছে জাহাজের দিকে। ব্যাপার কি? ঢুঁ মারবে নাকি? দেখতে দেখতে আহত তিমি জাহাজের সন্নিকটে এসে পড়ল এবং পলক ফেলার আগেই গোঁৎ মারল জলতলে।

চীৎকার উঠল জাহাজ থেকে—"দড়ি কাটো! দড়ি কাটো!"

কিন্তু দড়ি কাটবার সময় তখন নেই। তাছাড়া তিমিটাও খুব বেশী ডুব দেয়নি। তাই হু-হু করে দড়ি ছাড়া হতে লাগল নৌকো থেকে এবং সেইসাথে সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড় টেনে সংঘর্ষ এড়ানোর চেষ্টা করে চলল দাঁড়িরা।

আচমকা দড়ি উঠে এসে লাগল জাহাজের তলায়। তিমিটা মাথা তুলছে জাহাজের অপর পাশে। মাথা তুলেই ছুটেছে পেছনের গলুইয়ের দিকে।

ছুটল নৌকোদুটো পেছন পেছন। চক্রাকারে পিকুঅডকে পাক খেতে খেতে পর্যায়ক্রমে বর্শা নিক্ষেপ করে চলল স্টাব আর ফ্লাস্ক। অবশেষে স্পাউট ফুলিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল তিমি।

ছুটে এল হাঙরের দল। টাটকা রক্ত পান করতে লাগল উপোষী ছারপোকার মত।

দড়ি দিয়ে ল্যাজটা বাঁধতে বাঁধতে স্টাব বললে—"বুড়ো ক্যাপ্টেন নিরীহ তিমিটাকে মারতে বলল কেন বলো তো?"

"মাথাটা জাহাজের অপর পাশে ঝোলাবে বলে।" বললে ফ্লাস্ক। "কেন জানো? একদিকে স্পার্ম তিমির মাথা, আরেক দিকে রাইট তিমির মাথা ঝুলোলে জাহাজ কখনো ডুববে না।"

"কেন ডুববে না?"

"জানি না। পিশাচ ফেডাল্লাকে বলতে শুনছিলাম, তাই বললাম। ও ব্যাটা অনেক ম্যাজিক জানে। সাক্ষাৎ শয়তান! শিংজোড়া পাগড়ী দিয়ে ঢেকে রাখে!"

"মারো ব্যাটাকে! শয়তান··খোদ শয়তান··ল্যাজটা পর্যন্ত গুটিয়ে লুকিয়ে রেখেছে পকেটের মধ্যে!"

"কোথায় ঘুমোয় জানো? দড়ির ওপর।"

"ল্যাজ থাকলে ঐভাবে ঘুমোনই তো সুবিধে!"

"বুড়ো ক্যাপ্টেন কেন আনল ওকে?"

"চুক্তি হয়েছে—সাদা তিমি মেরে দেবে—বিনিময়ে ক্যাপ্টেনের সর্বনাশ করে যাবে।"

"ক্যাপ্টেনকে গায়েব করবে না তো?"

"কে জানে! আমি কিন্তু ওর ল্যাজটা কেটে নেব।"

"কি করবে ল্যাজ নিয়ে?"

"চাবুক বানাবো।"

ফ্লাস্কের অনুমান কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। রাইট তিমির ঠোঁট আর জিভ কেটে নেওয়ার পর মাথাটা ঝুলিয়ে দেওয়া হল ডেকের অন্য পাশে।

ধড়টা জলে ভাসিয়ে দেওয়ার পর দেখা গেল, নির্নিমেষে রাইট তিমির মুখের রেখার সঙ্গে নিজের হাতের রেখা মিলিয়ে দেখছে ফেডাল্লা।

## স্পার্ম তিমির মাথা

জাহাজের দুপাশে ঝুলছে দুজাতের দুই তিমির মাথা। স্পার্ম তিমি আর রাইট তিমি। এত কাছ থেকে মাথাদুটো মিলিয়ে দেখার সুযোগ আর মিলবে কি?

তিমিগুষ্টির বিবরণ আগেই দিয়েছি। সেখানেই দেখেছেন, আমরা তিমিশিকারীরা, এই দুই তিমি ছাড়া অন্য কোনো তিমিকে বিশেষ পাত্তা দিই না। মানুষ এদেরকেই শিকার করে।

স্পার্ম তিমির মাথা যেন গাণিতিক সমতায় সুগঠিত—রাইট তিমির মাথায় তার অভাব বড় দৃষ্টিকটু। স্পার্ম তিমির মাথার মধ্যে ব্যক্তিত্ব আছে, খানদানী ভাব আছে, বয়স্ক ছাপ আছে। যে কারণে স্পার্ম তিমিদের 'সাদাচুলো তিমি' বলা হয়। এদের মাথার কাছে অনেক সময়ে সাদাটে ভাব দেখা যায়।

দুজনের মাথায় কিন্তু একটা বিষয়ে কোনো অমিল নেই। দুজনেরই চোখ এবং কান মাথার একদম পেছন দিকে—চোয়ালের কোণে। এত ছোট যেন বাচ্চা ঘোড়ার চোখ। এত বড় মাথায় এত ক্ষুদে চোখ একেবারেই বেমানান।

মাথার দুপাশে দুটো চোখ থাকে বলেই তিমি সামনে বা পেছনে কিচ্ছু দেখতে পায় না। তিমির দুপাশে দুটো দৃশ্য ব্রেনের মধ্যে প্রবেশ করে—দুটো দৃশ্যই কিন্তু অন্যরকম—দুচোখের মাঝে বেশ কয়েক ঘনফুট মাংসের পাহাড় আড়াল করে মাঝের দৃশ্য। দুটো দুরকম দৃশ্য ব্রেনের ওপর কি গোলমেলে ছাপ ফেলে না?

আমার মনে হয়, এই কারণে তাড়া খেয়ে এত হকচকিয়ে যায় তিমি; ঐ রকম এলোমেলোভাবে ছুটতে থাকে—যেন মাথার ঠিক রাখতে পারছে না। পারবে কি করে? দুপাশে তিনচারটে নৌকোর দুরকম দৃশ্য মাথায় প্রবেশ করলে মাথা ঠিক রাখা যায়?

তিমির কান কিন্তু চোখের মতই অদ্ভুত যন্ত্র। আকারে এত সরু যে পালকের কলমও ঢুকবে না। স্পার্ম তিমির কানের ফুটো দেখতে পাবেন, কিন্তু রাইট তিমির মাথায় কোনো ফুটোই দেখতে পাবেন না। পাতলা আচ্ছাদনে ঢাকা থাকে কান।

কি আশ্চর্য বলুন তো! পাহাড়ের মত দেহে এত পুঁচকে কান আর চোখ? কিন্তু মশাই খুব বেশী বড় চোখ আর বড় কান থাকলেই কি বেশী দেখা আর বেশী শোনা যায়?—মোটেই না। সেই কারণেই তো আমরা আমাদের মনের পরিধি বাড়াতে এত চেষ্টা করি।

স্পার্ম তিমিকে চিৎ করে শুইয়ে মই বেয়ে উঠুন চোয়ালের কাছে; লণ্ঠন নিয়ে এক হাতে একটা দাঁত ধরে ঝুঁকে পড়ুন নীচে। কি দেখছেন? ঠিক বিয়ের কনের সাদা সাটিনের মত চকচকে আস্তরণে মেঝে থেকে ছাদ আবৃত—তাই না?

নেমে আসুন। তলার চোয়ালটা দেখেছেন? পনেরো ফুট লম্বা নস্যির ডিবের মত—ঢাকনীর কব্জা কিন্তু এক কোণে। বিয়াল্লিশ দাঁতের মাড়িটা দেখেছেন? ঐ দাঁত তিমি-কোদাল আর কপিকল দিয়ে উপড়ে আনা হবে—রকমারি জিনিস তৈরী হবে। চোয়ালটা করাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে তুলে রাখা হবে—বেতের হাতল, চাবুকের হাতল, এবং আরো বিচিত্র বস্তু খোদাই করার জন্যে।

## রাইট তিমির মাথা

আসুন এবার ডেকের এদিকে। কি দেখছেন? f আকারের জল ছোঁড়ার ফুটো দুটো? খেয়াল রাখবেন—স্পার্ম তিমির জল নিক্ষেপক ফুটো কিন্তু একটাই—দুটো নয়। এদের নাম স্পাউট।

মাথাটা একটু সবুজ, তাই নয়? ঠিক যেন মুকুট পরেছে। ঐ জন্যেই অনেকে ওকে মুকুটধারী তিমি আখ্যা দিয়েছে।

তবে গোমরা মুখো রাজা। তলার ঠোঁটটা কি রকম ঝুলছে দেখেছেন? লম্বায় বিশ ফুট গভীর। শুধু ঐখান থেকেই মিলবে ৫০০ গ্যালন তেল।

খরগোশের মত ঠোঁটটা কাটল কেন, সেও এক রহস্য। এই কাটা ঠোঁটের ওপর দিয়ে মুখগহ্বরে ঢুকুন—চমকে উঠলেন? বারো ফুট উঁচু ছাদ? দুপাশে শ'তিনেক হাড় কিরকম ঝাঁঝরির মত নেমে এসেছে দেখেছেন? ঐখান দিয়েই জল বার করে দেয় রাইট তিমি—কিন্তু ঝাঁঝরির মুখে অজস্র চুলে আটকে যায় ছোট মাছ আর বৃট।

সংক্ষেপ, স্পার্ম তিমির মাথায় স্পার্মের যে চৌবাচ্চা—রাইট তিমির মাথায় তা নেই, সাদা দাঁতও নেই, চোয়ালটাও অমন হিংস্র লম্বা নয়। রাইট তিমির মত স্পার্ম তিমির হাড়ের ঝাঁঝরি নেই, বিশাল ঠোঁট নেই, জিভও নেই। রাইট তিমির জল নিক্ষেপক ফুটো (স্পাউট) দুটো—স্পার্ম তিমির একটা।

## পাঁচিল ভাঙবার ঢেঁকি-কল

স্পার্ম তিমি যখন সাঁতরায়, মাথাটি খাড়াইভাবে উঠে থাকে জলের ওপর। যদিও তিমিদের বাইরের দিকে কোনো নাক থাকে না; নাক বলতে যা বোঝায়, সেই স্পাউট থাকে মাথার ওপর। হাঁ অথবা মুখগহ্বর মাথার তলায়। চোখ আর কান মাথার দিক থেকে শরীরের একতৃতীয়াংশ পেছনে। মাথার সামনে কোনো হাড় নেই—বিশ ফুট পেছনে কপালের কাছ থেকে আরম্ভ হয়েছে করোটি। এতখানি জায়গা বিলকুল হাড়শূন্য এবং অত্যন্ত মূল্যবান তেলে ভর্তি। হাড়ের বদলে যা থাকে তা চর্বির স্তর—যে চর্বি কম্বলের মত ঢেকে রয়েছে সর্বাঙ্গ। মাথার সামনেও সেই চর্বি—তবে তা এত শক্ত যে খুব শক্তিমান হার্পুনারের হার্পুনও ছেঁদা করতে অক্ষম। কিন্তু অত্যন্ত নমনীয়। সেই কারণেই কি অন্যান্য মাছেদের মত পটপটি না থাকা

সত্ত্বেও যথেচ্ছ জলে ভাসতে বা ডুবতে পারে তিমি? কে জানে ওদের ফুসফুসের মধ্যে আরও কারসাজি আছে কিনা…হয়তো হাওয়াকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করে পটপটির অভাব মিটিয়ে নিতে পারে—ভাসতে পারে, বা ডুবতে পারে।

চামড়ার ঢাল দিয়ে বর্শা, তরোয়াল, তীরও আটকায় জংলীরা। স্পার্ম তিমির নমনীয় কিন্তু কঠিন মাথায় সেই জোর আছে বলেই কি ওদের ঢুঁ অত সর্বনাশা?

## হাইডেলবার্গ মদের চৌবাচ্চা

হাইডেলবার্গ শহরের বিখ্যাত মস্ত-চৌবাচ্চায় মদ ধরত ২৫২ গ্যালনেরও বেশী। স্পার্ম তিমির মাথার চৌবাচ্চায় তেল থাকে ৫০০ গ্যালনের মত।

অস্থিহীন সুবৃহৎ ঐ চৌবাচ্চার মধ্যে আছে দশ হাজার কোষময় এক প্রকাণ্ড মৌচাক—প্রতিটি কোষে রয়েছে টলটলে সুগন্ধ স্পার্ম তেল। তিমি-দেহের অন্যত্র কিন্তু এ-তেল এক ফোঁটাও পাবেন না। জ্যান্ত অবস্থায় তেলটা তরল, কিন্তু মৃত অবস্থায় এবং হাওয়ার সংস্পর্শে এলেই তেল জমতে থাকে অতি সুন্দর ক্রস্ট্যালের মত—ভেসে ওঠে সদ্য জমা বরফের মত।

এ তেল বার করা খুব কঠিন কাজ। অভিজ্ঞ, দক্ষ অপারেটর ছাড়া কারও হাতে এ-দায়ীত্ব দেওয়া হয় না।

## সিসটার্ন আর বালতি

পিকুঅড জাহাজে ঝুলন্ত স্পার্ম তিমির মাথা থেকে তেল বার করার কাজ শুরু হল সাড়ম্বরে। ট্যাশটেগো দড়ি বেয়ে উঠে গেল কপিকলের আংটায়। ফুটো করল তেলের চৌবাচ্চার মাথায়। তারপর বিশ ফুট লম্বা ডাণ্ডার ডগায় বাঁধা লোহার বালতি ডুবিয়ে তেল তুলে নামিয়ে দিতে লাগল নীচে।

দুর্ঘটনাটা ঘটল আঠারো বালতি নামানোর ঠিক পরেই।

তেল হড়হড়ে দড়ি হাত পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার জন্মেই বোধহয় ফুটো দিয়ে ঝুপ করে তেলের মধ্যে গিয়ে পড়ল ট্যাশটেগো।

আতংকিত সোরগোল উঠল ডেকে। বেশ কয়েকজন উঠে গেল মাথার ওপরে—উঁকি মেরে দেখতে লাগল ধীরে ধীরে হাত পা নাড়তে নাড়তে তলিয়ে যাচ্ছে ট্যাশটেগো।

এইসময়ে এক লাফে আংটা ধরে ঝুলে পড়ল ড্যাগ্‌গু। একহাতে তেল-চুড়চুড়ে দড়ি লাফ করে আরেক হাতে বালতিসমেত ডাণ্ডাটা নামিয়ে দিল ট্যাশটেগোর দিকে।

কিন্তু ঠিক তখনি ভীষণ চীৎকার শোনা গেল ডেকে—"সরে দাঁড়াও কপিকলের তলা থেকে!"

পট-পট পটাস করে দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে তিমির মাথা ঝুলতে লাগল ডেকের বাইরে—আংটায় ড্যাগ্‌গু।

পরমুহূর্তেই দড়ি ছিঁড়ে মাথাটা তলিয়ে গেল জলে—তেলের খাঁচায় বন্দী হইল ট্যাশটেগো।

চোখের পলক ফেলার আগেই তরবারি হাতে জলে ঝাঁপ দিল কুঈকোয়েগ।

ভীষণ উৎকণ্ঠায় কাটল কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর শোনা গেল ড্যাগ্‌গুর উল্লসিত চীৎকার—"ঐ! ঐ! দুজনেই!"

রেড ইণ্ডিয়ান ট্যাশটেগোর লম্বা চুল ধরে ভেসে উঠেছে কুঈকোয়েগ। নৌকো গিয়ে তক্ষুণি তুলে নিয়ে গেল দুজনকে।

ট্যাসটেগোর জ্ঞান ফিরতে সময় লাগল। তার আগেই কুঈকোয়েগ বলল তার ভয়ংকর অভিযানের কাহিনী।

মাথার তেল বেশ খানিকটা বার করে আনার পরেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল বলে হাল্কা মাথাটা ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছিল জলতলে—কুঈকোয়েগ সাঁতরে নেমে গেল তলার দিকে—তলোয়ারের কয়েক কোপে নতুন ফুটো করে হাত বাড়িয়ে দিল ট্যাশটেগোর পানে।

বেরিয়ে এল একটা পা। কিন্তু কুঈকোয়েগ জানে, এ সময়ে পা ধরে টানতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। তাই পা-টা ঠেলে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে চেপে ধরল লম্বা চুলের গোছা—একটানে বেরিয়ে এল পুরো দেহটা।

তারপর? দাঁতে কামড়ে চুলের গোছা ধরে দুহাত চালিয়ে বাতাসের জগতে ফিরে এল বিদ্যুৎগতি, ক্ষিপ্রবুদ্ধি, অসমসাহসিক কুঈকোয়েগ!

যদি সে ব্যর্থ হত? যদি ট্যাশটেগো থেকেই যেত স্পার্ম তেলের মধ্যে?

আহা! কি সুখের সেই মৃত্যু! সুরভিত মহামূল্যবান স্পার্ম কফিনে সমুদ্র-সমাধি কজনের ভাগ্যে ঘটে?

মুখের রেখা দেখে চরিত্র বলা যায়, করোটির গড়ন থেকে বুদ্ধিমত্তা নির্ণয় করা যায়। এ বিদ্যায় যাঁরা বিদ্বান, তাঁদের যথাক্রমে বলা হয় ফিজিঅগনমিস্ট এবং ফ্রেনলজিস্ট। অতীব দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত এ দের কেউ তিমিঙ্গিলের ললাট বা করোটি নিয়ে মাথা ঘামাননি। অগত্যা আমাকেই ঘামাতে হচ্ছে।

ফিজিঅগনমির দৃষ্টিকোণ থেকে স্পার্ম তিমির নাক বলে কোনো প্রত্যঙ্গ নেই। অথচ নাক ছাড়া মুখ হয় না।

তবে হ্যাঁ, কপাল বটে স্পার্ম তিমির। হাতীর কপালে রাজার ছাপ—স্পার্ম তিমির কপালে প্রতিভার ছাপ (ল্যাভাটার বর্ণিত লক্ষণ যদি ধরেন)। সেক্সপীয়রের মত উঁচু ললাট কজনের আছে? যেন পাহাড়—চোখদুটি টলটলে পাহাড়ি সরোবর। স্পার্ম তিমির কপালে শুধুই পাহাড়—চোখ, কান, নাক কিছুই দেখতে পাবেন না।

কিন্তু স্পার্ম তিমির কি প্রতিভা থাকে? ক'খানা গ্রন্থ রচনা করেছে? বক্তৃতা দিয়েছে? এগুলো করেনি বলেই কিন্তু স্পার্ম তিমি প্রতিভাবান। ওর মৌনতাই ওর ধীশক্তির লক্ষণ। জিভ নেই বলে কুমীরকে দেবতার আসন দেওয়া হয়েছে নীলনদের দেশে। স্পার্ম তিমিরও জিভ নেই—থাকলেও দৃষ্টিগোচর নয়—জিভ দেখাতেও অক্ষম—সুতরাং সেরকম সুযোগ এলে স্পার্ম তিমিকেও দেবতা করা হবে না কেন?

কুঞ্চিত গ্র্যানাইটের সংকেতলিপি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন চ্যামপোলিয়ন। কিন্তু মানুষের মুখের মিশরীয় সংকেতের রহস্য আজও কোনো চ্যামপোলিয়ন ধরতে পারেননি। তিরিশটা ভাষা পড়তে পেরেও স্যার উইলিয়াম জোন্স যদি সরল চাষার কপালের ভাষা পড়তে অক্ষম হন—নিরক্ষর ইসমাইল কি পারবে স্পার্ম তিমির ললাট-লিপি পাঠ করতে?-ও কাজ আপনার। দেখুন, পারেন কি না।

## মাথা

ফিজিঅগনমিস্টের কাছে স্পার্ম তিমি যদি স্ফিংক্স হয়, ফ্রেনলজিস্টের কাছে তার ব্রেন কিন্তু এমন একটা জ্যামিতিক বৃত্ত যাকে চৌকো করা অসম্ভব।

প্রাপ্তবয়স্ক স্পার্ম তিমির করোটির দৈর্ঘ্য বিশ ফুট। নীচের চোয়াল বাদ

দিলে ওপরের সুবৃহৎ আধারে সদা টলমল করছে তরল স্পার্ম। করোটির অন্য কুঠরিতে—লম্বায় এবং গভীরতায় যা দশ ইঞ্চিও নয়—রয়েছে দানব তিমির ক্ষুদ্রকায় মগজ—যা কিনা মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। কপাল থেকে কুড়ি ফুট পেছনে মগজের অবস্থান—যেন কিউবেকের কেল্লার গহনতম অন্দরে লুকোনো দেবালয়। এইভাবে গুপ্ত থাকার জন্যেই অনেক তিমিশিকারী বলেন, স্পার্ম-আধারটাই নাকি স্পার্ম তিমির আসল মগজ। দশ হাজার কোষের জটিলতা দেখে মনে হয় যত রহস্য ঐখানেই—ধীশক্তির মূল কেন্দ্রও ঐখানে।

সংক্ষেপে, করোটি বিশারদের চোখে স্পার্ম তিমির করোটি একটা প্রহেলিকা। আসল মগজের চিহ্ন নেই। দুনিয়ার সব শক্তিমানের মতই স্রেফ ভ্রূকুটি করেই বাজিমাৎ করছে সে।

স্পার্ম-মৌচাক নামিয়ে যদি করোটির পেছন দিকে নজর দেন, অবাক হবেন নরকরোটির সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখে। মনে মনে এই অংশটি যদি ছোট করে মানুষের খুলির ওপর ফেলেন, সত্যিই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে আপনার। করোটির দাবানো ঊর্ধ্বাংশ দেখে ঝানু করোটি বিশারদের মত বলেও বসবেন—লোকটার আত্মসম্মান জ্ঞান একদম নেই—শ্রদ্ধাভক্তিও কেউ করে না।

যে কোনো চতুষ্পদের মেরুদণ্ড লক্ষ্য করুন। প্রতিটি কশেরুকা যেন একটি ক্ষুদ্রকায় করোটি এবং পুরো পৃষ্ঠবংশটি একটি করোটিমালা। একজন জার্মান চিন্তাবিদও বলেছিলেন, কশেরুকাগুলো আসলে অনুন্নত করোটি ছাড়া কিছুই নয়। জংলীদের মধ্যেও অনেকে এ তত্ত্ব জানে।

ফ্রেনলজিস্টরা যদি করোটির মধ্যে গবেষণা সীমিত না রেখে পৃষ্ঠবংশের দিকেও নজর দিতেন—অনেক আবিষ্কার করতে পারেন। আমার বিশ্বাস, মানুষের শিরদাঁড়া দেখেই তার চরিত্র বলা সম্ভব। যার শিরদাঁড়া শক্ত, মজবুত, সরল, উন্নত নয়—সে শুদ্ধ সুন্দর আত্মার অধিকারী হবে কি করে?

স্পার্ম তিমির শিরদাঁড়া দেখেছেন? মেরুমজ্জা প্রথম কশেরুকা থেকে শেষ কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম কশেরুকা-মধ্যস্থ সুড়ঙ্গ উচ্চতায় আট ইঞ্চি—লম্বায় দশ ইঞ্চি। আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গ সরু হয়ে গিয়েছে ল্যাজের দিকে। কিন্তু বেশ কিছুদূর পর্যন্ত সুড়ঙ্গপথের পরিসর কমেনি। আগাগোড়া সুড়ঙ্গটা কিন্তু তন্তুময় বিচিত্র মেরুমজ্জা দিয়ে ভরাট—যা মগজেরই অংশ—মগজের সঙ্গেই যার সরাসরি সম্পর্ক। মগজ থেকে বেরিয়েও বেশ কিছুদূর পর্যন্ত মগজের মতই মোটা থেকেছে মেরুমজ্জার পরিধি।

এবার তাহলে বলুন, স্পার্ম তিমির মেরুদণ্ডকে ব্রেন হিসেবে গণ্য করা হবে না কেন? তার ব্রেন ছোট হতে পারে—কিন্তু ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছে সুদীর্ঘ সুপুষ্ট মেরুমজ্জা।

স্পার্ম তিমির বিপুল কুঁজ ঠেলে উঠেছে বৃহত্তম কশেরুকার ঠিক ওপরেই। এই কুঁজ কিন্তু তার দৃঢ় এবং অজেয় চরিত্রের দেহযন্ত্র বিশেষ।

## পিকুঅড বনাম কুমারী

এককালে ওলন্দাজ আর জার্মান তিমি জাহাজের খুব প্রতাপ ছিল তিমি-মহলে—এখন সেদিন গিয়েছে। তবুও প্রশান্ত মহাসাগরে দেখা সাক্ষাৎ হয় মাঝে মাঝে।

তাই জাঙফ্রু জাহাজখানা দেখে অবাক হলাম না। জার্মান জাহাজ। জাঙফ্রু মানে কুমারী।

দূর থেকে দেখলাম, নৌকো নামিয়ে ক্যাপ্টেন আসছেন—একহাতে তেলের বাতি এবং তৈলাধার। নিশ্চয় তেল ফুরিয়েছে। তেলের জাহাজেও তেল ফুরোয় বই কি।

তেল নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময়ে কিন্তু এক ঝাঁক তিমি দেখা গেল। মোট আটটা তিমি।

তেলের বাতি হাতে নিয়েই জার্মান ক্যাপ্টেন নৌকো চালালেন তিমির দলের দিকে। আমাদের জাহাজ থেকেও নেমে এল তিনখানা নৌকো। বিপদ সমাসন্ন বুঝে তিমিগুলোও তীরবেগে সাঁতরে চলেছে হাওয়ার বিপরীত মুখে। যেন অনেকগুলো ঘোড়া দৌড়োচ্ছে। পেছনে ধুলোর মেঘের পরিবর্তে জলকণার মেঘ ভাসছে। তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে নীল জল।

সবার পেছনে সাঁতরাচ্ছে একটা প্রকাণ্ড তিমি। বুড়ো তিমি, বিশাল কুঁজ। পিঠ জুড়ে অদ্ভুত হলদেটে আস্তরণ। যেন জনডিস হয়েছে। আসলে বুড়িয়ে যাওয়ার ফলে চামড়ার চেহারা পাল্টে গিয়েছে—গতিবেগও শ্লথ হয়ে এসেছে। ছোট স্পাউট দিয়ে অতি কষ্টে ছোট্ট ছোট্ট জলফোয়ারা ঠেলে উঠছে। হাঁফাচ্ছে যেন—দম আটকে আসছে দৌড়োতে গিয়ে; তাই পেছনের বিক্ষুব্ধ জলে অত বুদবুদের সমারোহ।

ছুটন্ত বোটে দাঁড়িয়ে স্টাব বললে—"পেট কামড়াচ্ছে নাকি? অত কষ্ট কিসের?...আরে...আরে একটা পাখনা নেই দেখছি!"

সত্যিই তাই! একটা পাখনা দিয়ে জল কাটতে হচ্ছে বলেই এত কষ্ট তিমিটার। গেল কোথায় আর একটা পাখনা?

এরপর থেকেই শুরু হয়ে গেল পিকুঅড আর জাঙ্গফ্রর মধ্যে রেষারেষি। বলবান চটপটে তিমিগুলো টেনে চম্পট দিচ্ছে দেখে পিছিয়ে পড়া বুড়োটার পেছনে তেড়ে গেল জাঙ্গফ্র নৌকো। আমরাও ছুটে গেলাম একই লক্ষ্যে।

আমাদের দেওয়া তেলের বাতি শূন্যে নাড়তে নাড়তে অনর্গল টিটকিরি দিয়ে চললেন জার্মান ক্যাপ্টেন। স্টারবাক তো রেগে আগুন! স্টাব দাঁত কিড়মিড় করে বললে—"বেইমানের বাচ্চা! জার্মান রাস্কেল—তোকে চিবিয়ে খাব!—চালাও নৌকো!"

সেকি প্রতিযোগিতা! জার্মান নৌকো কিন্তু এগিয়ে গেছে অনেকটা। হার্পুন ছুঁড়তে যাবে—এমন সময়ে নৌকো টলমল করে উঠতে বসে পড়ল হার্পুনার। সেই অবসরে বেশ খানিকটা এগিয়ে এল পিকুঅড নৌকোর দল। তুবড়ির মত বকে চলেছে স্টাব আর ফ্লাস্ক। পাগলের মত লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, খেপাচ্ছে দাঁড়িদের। মাথায় যেন আগুন ধরে গেছে প্রত্যেকের।

কি ভয়ংকর সেই দৃশ্য! কি উন্মত্ত পশ্চাদধাবন। কণ্ঠনিঃসৃত জলফোয়ারা ভলকে ভলকে বেরোচ্ছে তিমির স্পাউট দিয়ে—একটি মাত্র পাখনা যেন আর নাড়তে পারছে না। যে পাখীর ডানা ভেঙে যায়, এমনি ভাবে কষ্টেস্থষ্টে সে আকাশে ওড়ে। আহারে! দেখেও মায়া হয়! কিন্তু আমাদের মায়া নেই! ব্যবসার দিক দিয়ে অত বড় একটা তিমি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। কত বাতি জ্বলবে, কত মোম পুড়বে, কত উপাসনা সাঙ্গ হবে, কত বিবাহের রাত ভোর হয়ে যাবে—মরবে শুধু একটা তিমি। মরুক!

জার্মান বোট বুঝতে পেরেছে আর দেরী করলে পিকুঅড টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাবে। ক্যাপ্টেনের হুকুমে হার্পুনার উঠে দাঁড়াল গলুইয়ের ওপর।

কিন্তু সে হাত তোলার আগেই বাঘের বাচ্চার মত তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল কুইকোয়েগ, ট্যাশটেগো এবং ড্যাগ্‌গু—তিন-তিনটে হার্পুন বাতাস কেটে গিয়ে জার্মান বোটের মাথার ওপর দিয়ে ঢুকে গেল তিমির দেহে।

সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টান পড়ল তিন তিনটে নৌকোয়। ছিটকে সামনে এগিয়ে গেল নৌকো তিনটে—যাবার পথে ধাক্কা মেরে উল্টে দিয়ে গেল জার্মান নৌকোটা।

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল স্টাব—"ভয় নেই···ভয় নেই, ননীর পুতুলরা! হাঙররা এল বলে!"

তিমি ছুটছে—ছুটছি আমরা। কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য গতি কমে এল বুড়োর। আচমকা গোঁৎ মেরে ডুবে গেল তলায়। ডুবছে তো ডুবছেই!

কম করে দড়ি ছাড়া হচ্ছে—তবুও ফুরিয়ে এল লাইন। তবুও ডুবছে… ডুবছে…সহসা ডোবা বন্ধ করল তিমি।

কিন্তু ভেসে উঠল না। দড়ি টান হয়ে রইল। যেন তিনটে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছি একটা তিমিকে। সামনের গলুই নীচু হয়ে জলে গিয়ে ঠেকেছে—পেছনের গলুই উঁচু হয়ে আকাশের দিকে উঠে গেছে। দড়ি দেখাই যাচ্ছে না।

আহত তিমি যতক্ষণ জলে ডুবে থাকে, ততই সে বেদম হয়ে পড়ে। এই তিমিটার সারা দেহের ক্ষেত্রফল দুহাজার বর্গফুটের কম নয়। এত বড় দেহের ওপর দু'শ' ফ্যাদম মহাসমুদ্রের চাপ কতখানি কল্পনা করতে পারেন ?—কামান, সৈন্য, ভাঁড়ার, মালপত্র সমেত কুড়িটা রণপোতের সমান! ২০০০×১২০০

চিরন্তন নীল সমুদ্রে মুখ গুঁজে ভাসছে তিন তিনটে নৌকো। আচমকা শিথিল হল লাইন। তাড়াতাড়ি দড়ি পাকিয়ে গুটিয়ে রাখা হল বালতির মধ্যে।

ভেসে উঠল তিমির দেহ। সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর যেন নড়তে পারছে না। স্থলচর জন্তুদের প্রায় প্রত্যেকের দেহে শিরার মধ্যে ভালভ জাতীয় এমন একটা ব্যবস্থা থাকে যে আহত হলে অন্ততঃ কিছু মাত্রায় রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায় সেখানে। কিন্তু তিমির দেহে সে ব্যবস্থা নেই। কোনো ভালভ বা ফ্লাড গেটের ব্যবস্থা নেই রক্তবহা নালীর মধ্যে। তাই হার্পুনের মত ক্ষুদে ক্ষত মারাত্মক ক্ষত হয়ে ওঠে—হু-হু করে রক্ত বেরিয়ে যায় সারা শরীরের ধমনী থেকে। তার ওপর যদি জলের চাপ পড়ে, তাহলে তো মণিকাঞ্চন যোগ ঘটে—অঝোর ধারায় প্রাণ বেরিয়ে যায় ঐটুকু ক্ষতমুখ দিয়ে। কিন্তু রক্ত তো কম নয় অত বড় দেহে—তাই লড়ে যায় অনেকক্ষণ।

এক্ষেত্রেও মুমূর্ষু তিমির ওপর উপর্যুপরি বর্শা নিক্ষেপ করেও স্পাউট দিয়ে রক্ত বার করা গেল না। প্রাণকেন্দ্র তার এখনো অক্ষত!

নৌকোগুলো আরো কাছে গিয়ে পড়েছে বলে দেখা গেল চোখের কাছে চোখ নেই—কিন্তু বীভৎস কতকগুলো মাংসপিণ্ড থলথলে আকারে ঠেলে বেরিয়ে আছে সেখানে। একে বুড়ো তায় একটা হাত নেই, উপরন্তু একচোখ কানা—তবুও তাকে মরতে হবে মানুষের ঘরে ঘরে আলো জ্বালানোর জন্যে।

হেঁকে উঠল ফ্লাস্ক—"বাঃ, খাসা জায়গা! দেখি খুঁচিয়ে!"

"না!" কড়া গলা স্টারবাকের—"শুধু শুধু মেরো না!"

কিন্তু স্টারবাকের কথা শেষ হওয়ার আগেই বর্শা বেরিয়ে গিয়েছে ফ্লাস্কের হাত থেকে। বীভৎস ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্তধারা এবং

তীব্র যন্ত্রণায় এই প্রথম স্পাউট দিয়ে রক্তের ফোয়ারা উঠল আকাশপানে। মরণ মার খেয়েছে বুড়ো। অন্ধ রাগে, মৃত্যু যন্ত্রণায় ছিটকে গেল নৌকোর দিকে—উল্টে গেল নৌকো।

কিন্তু রক্তক্ষয়ে ক্লান্ত সে—এর বেশী আঘাত হানার সাধ্য নেই। উলটোনো নৌকো, ভাসমান দাঁড় আর মানুষের মাঝে অসহায় ভাবে ভাসতে ভাসতে সাদা পেট ওপরে তুলে শেষ হয়ে গেল সে।

দড়ি বেঁধে তিমিটাকে টেনে আনলাম জাহাজের গায়ে। বেঁধে রাখতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। অদ্ভুতভাবে তলিয়ে যেতে চাইল বুড়ো তিমি। যেন লোহার মত ভারী হয়ে গিয়েছে।

এই ফাঁকে দুটো আবিষ্কার করলাম তিমির সেই থলথলে মাংস পিণ্ডের মাঝে। একটা মর্চে ধরা হার্পুন পেলাম। আর পেলাম একটা পাথরের বল্লম!

পাথরের বল্লম! কাদের? কোন জংলীদের? বয়স কত তিমিটার? আমেরিকা আবিষ্কারের আগেই কি এই বল্লম গেঁথেছিল তার চোখে?—কে জানে!

তিমিদেহের আরো রহস্য শেষ পর্যন্ত অজানাই রয়ে গেল। সব তিমি মরে গেলেও ভেসে থাকে। এ কিন্তু পাহাড়ের মত ডুবতে চাইল। জাহাজে বাঁধতে গেলাম- জাহাজ হেলে পড়ল, ডেক খাড়া হয়ে গেল—শেষ মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে দড়িদড়া ছিঁড়ে রহস্যময় বৃদ্ধ তিমির লাশ তলিয়ে গেল অথই জলে।

## তিমিশিকারের গৌরব আর সম্মান

যুগ যুগ ধরে তিমি শিকার করে এসেছেন মহাবীররা। পুরাণে লেখা আছে তাঁদের অমর কাহিনী। যেমন, পারসিয়াস; যেমন, সেণ্ট জর্জ; যেমন, হারকিউলিস; যেমন, জোনা; যেমন, ভগবান বিষ্ণু।

পারসিয়াস ছিলেন জুপিটারের ছেলে—প্রথম তিমি শিকারী। সুন্দরী অ্যানড্রোমেডাকে তিমি নিতে আসছে শুনে ছুটে গিয়ে একাই বধ করেছিলেন তিমিকে—বিয়ে করেছিলেন অ্যান্ড্রোমেডাকে।

সেণ্ট জর্জ লড়েছিলেন ড্রাগনের সঙ্গে। কিন্তু জলের ড্রাগন আর তিমির চেহারায় এত মিল কেন?

সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর হিন্দু শাস্ত্রের গল্প। দেবতাদের দেবতা বিষ্ণু এক-এক

কল্প অন্তে নতুন করে জগৎ সৃষ্টি করছিলেন। তাই সৃষ্টি হল ব্রহ্মার। তিনি গূঢ় শাস্ত্র বেদ অধ্যয়ন করতে চাইলেন—নিশ্চয় তাতে সৃষ্টি তত্ত্বের বাস্তব পথ নির্দেশ ছিল—কিন্তু বেদ রয়েছে জলের তলায়। তাই তিনি অবতারের রূপ ধরে জলতল থেকে পবিত্র বেদগ্রন্থ উদ্ধার করলেন তিনি। আমি তো বলব বিষ্ণু আসলে একজন তিমি শিকারী।

## জোনার গল্প

জোনার গল্প আর হারকিউলিসের গল্প অনেকে অবিশ্বাস করে।

কিন্তু হিব্রুদের একটা পুরোনো বাইবেলের ছবিতে জোনা আর তিমির যে ছবি আছে, তাতে দেখা যায়, তিমিটার স্পাউট সংখ্যা দুই। সুতরাং সে তিমি নিঃসন্দেহে রাইট তিমি। রাইট তিমির মুখ গহ্বরে টেবিল সাজিয়ে বসে থাকা যায় এবং তার দাঁত থাকে না। তবে কি জোনা একটা মরা রাইট তিমির মুখে বসে সমুদ্র বিহার করেছিল?

তুর্কীরা কিন্তু বিশ্বাস করে জোনার গল্প। তিনশ বছর আগে একজন ইংরেজ পর্যটক একটি তুর্কী মসজিদে গিয়ে জোনার স্মৃতিসৌধে ঢুকে একটা আশ্চর্য প্রদীপ দেখেছিলেন। তেল ছাড়াই জ্বলে সেই প্রদীপ।

## পিচপোলিং

গাড়ীর চাকায় তেল দিলে গাড়ী ভাল চলে। সুতরাং নৌকোর তলায় চর্বি ঘসলে নৌকো ভাল ছুটবে না কেন?—এই বিশ্বাস নিয়ে নৌকোয় চর্বি ঘসতে বসল কুঈকোয়েগ। ঘসা শেষ হওয়ার আগেই দেখা দিল তিমির দল।

তৎক্ষণাৎ নৌকো নামিয়ে তেড়ে যাওয়া হল একটা তিমির পেছনে। কিন্তু অসম্ভব গতিবেগ তিমিটার। অতিকষ্টে ট্যাশটেগো একটা হার্পুন গাঁথল বটে—কিন্তু ডুব না দিয়ে আরো জোরে ছুটতে লাগল তিমিটা। এখন ওকে ঘায়েল করতে হলে কাছে গিয়ে উপর্যুপরি বর্শা মারা দরকার! কিন্তু ল্যাজের ঘায়ে জল যেখানে তোলপাড়, সেখানে কাছে গেলেই মৃত্যু।—এখন উপায়?

উপায়—পিচপোলিং, অর্থাৎ একটা পাইন কাঠের হাল্কা বর্শা—লম্বায় দশ বারো ফুট। হার্পুনের চেয়ে হাল্কা—কিন্তু লম্বা। পেছনে বাঁধা দড়ি—দড়ি ধরে বর্শাটাকে ফের টেনে আনা যায়। ছুটন্ত দুলন্ত নৌকো থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে ধাবমান তিমিকে বারবার মারা যায়।

স্টাব দাঁড়িয়ে উঠল নৌকোর ওপর। তিমি রয়েছে চল্লিশ ফুট সামনে। পনেরো ফুট লম্বা বর্শাটা হাতলের ওপর খাড়াই ভাবে দাঁড় করাল হাতের তালুতে—দড়ির কুণ্ডলি রইল আর এক হাতে।

পরমুহূর্তে শূন্যপথে অর্ধবৃত্তাকার পথে ঘুরে গেল চকচকে ফলাটা এবং তীর-বেগে চল্লিশ ফুট ব্যবধান টপকে গিয়ে ঢুকে গেল তিমির গায়ে।

দড়ি ধরে টেনে আনল স্টাব। আবার ছুঁড়ল। আবার! আবার!

রক্তফোয়ারা বেরিয়ে এল স্পাউট দিয়ে। শেষ হয়ে এসেছে দুর্দান্ত জল-দানব।

পিচপোলার নামিয়ে রেখে দুহাত একত্র করে মৃত্যু যন্ত্রণা দেখতে লাগল স্টাব—একটি কথাও আর বলল না।

## ফোয়ারা

তিমির স্পাউট নিঃসৃত ফোয়ারা কি জলের ফোয়ারা, না, বাষ্পের?

এ প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয় নি। তিমি কিন্তু নিঃশ্বাস নেয়। নিঃশ্বাস না নিলে ফুসফুস চালু থাকবে কি করে? মাছেদের না হয় কানকো আছে—জলের মধ্যে থেকেই জলের সঙ্গে বাতাস গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে—যে জন্যে কর্ড বা হেরিং একশ বছর জলের তলায় থাকতে পারে—হাওয়ার জগতে আসার দরকার হয় না।

কিন্তু তিমির ফুসফুস আছে; তিমিকে হাওয়া নিতে আসতে হয় জল পৃষ্ঠে। কিন্তু জলের তলায় হাওয়া না নিয়ে থাকে কি করে?

তিমির পাঁজরার দুপাশে সীমুউয়ের মত সরুসরু অথবা রুটান গোলক ধাঁধার মত অনেকগুলো নলিকা আছে। অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তে এই দুটি জায়গা ফুলে ওঠে জলে ডুব দিলে। এই তার অক্সিজেন রিজার্ভার। ঘণ্টা খানেক একশ ফ্যাদম নীচেও থাকতে পারে। কিন্তু ফের উঠে আসতে হয় বাতাস নিতে।

তখনি দেখা যায় ফুক ফুক করে ফোয়ারা ছাড়ছে তিমি। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ফোয়ারা উঠছে—থামছে—উঠছে। মাঝখানে বাধা পেলেই ডুব দিচ্ছে জলে। কিন্তু রিজার্ভার ভর্তি না থাকায় ফের উঠে আসতে হচ্ছে। এ ছাড়া তিমিকে মারবার আর সময় নেই। জলের তলায় জাল ফেলে ধরা কি সম্ভব?

বাতাস গ্রহণের সময় কিন্তু বাঁধা। ধরুন কাউকে দেখলেন এগারো

মিনিটে সত্তর বার ফোয়ারা ছাড়ল। ডুব দিয়ে ওঠার পর দেখবেন সেই তিমিই ফের এগারো মিনিটে সত্তর বার ফোয়ারা ছাড়বে, একটুও হেরফের হবে না।

তা সত্ত্বেও আমাদের চেয়ে কম সময় নেয় তিমিরা এ-ব্যাপারে। নিঃশ্বেস না নিলে আমরা বাঁচব না। একবার নিঃশ্বেস নিলে দুতিনবার নাড়ী স্পন্দন ঘটবে। দিনেরাতে সমানে তাই নিঃশ্বেস নিই।

তিমিরা কিন্তু ওদের সমস্ত সময়ের সাত ভাগের মাত্র একভাগ নিঃশ্বেস নিতে ব্যয় করে! অর্থাৎ নিঃশ্বেস নেওয়াটা ওদের কাছে রোববারের সামিল!

কিন্তু নিঃশ্বেসটা ফুসফুসে যাচ্ছে কোন পথে? শ্বাসনালী মুখের মধ্যে নেই—থাকলে, আট ফুট জলের তলায় ডুবন্ত মুখের মধ্যে দিয়ে শ্বাসনালীতে জল ঢুকে যেত—জল তলে খাবার খেতে গিয়েও সেই বিপত্তি হত।

না মশাই, বাতাস যাচ্ছে মাথার ওপরকার ফুটো দিয়ে—স্পাউট দিয়ে।

স্পাউট জিনিসটা কয়েক ফুট লম্বা একটা নল। যেন একটা গ্যাসপাইপ মাঝে ভালভ আছে—বাতাস ঢোকার সময়ে খুলে যায়—আবার জল ঢোকার সময়ে বন্ধ থাকে। তিমির এই স্পাউট দিয়েই কিন্তু ফোয়ারা বেরোয়। ফোয়ারাটা তাহলে কি জল? জল কিভাবে যাবে ফুসফুসের মধ্যে? মুখ গহ্বরের সঙ্গে তো শ্বাসনালীর সংযোগ নেই? তবে কি জল-বাষ্প? স্পাউটের চারধারের খোঁদলে সবসময়েই জল জমে থাকে। ভীষণ বেগে বাতাস ছাড়বার সময়ে এই জলই কি বাষ্প হয়ে যায়?

প্রমাণ করতে পারব না—তবে আমার তাই মনে হয়।

একটা ব্যাপারে সাবধান! স্পাউটের ফোয়ারায় মুখ বাড়িয়ে কিন্তু বাষ্প জিনিসটা কি জানতে যাবেন না। গাল মুখের চামড়া উঠে যাবে। তিমি শিকারীরা বলে ওদের ফোয়ারায় বিষ আছে! ড্রাগনের কল্পনা কি সেই কারণেই?

আর একটা কথা। স্পাউটের সঙ্গে মুখের সংযোগ না থাকায় তিমি কথা বলতে পারে না—ভেতরে পাল্লা থাকায় গন্ধ শুঁকতেও পারে না। কিন্তু তার দরকার কি? বহুদর্শী কি কথা বলে? সুগন্ধ-বিলাসী হয়?

### ল্যাজ

হরিণের চোখ আর পাখীর পালক নিয়ে ঢের কবিতা লেখা হয়েছে—আমি লিখব তিমির ল্যাজ নিয়ে।

ল্যাজটার ওপরের অংশ টুকুর ক্ষেত্রফলই কম করেও পঞ্চাশ বর্গফুট। শেষ অংশটা পাখীর ডানার মত দুপাশে ছড়িয়ে পড়েছে—যার আড়াআড়ি মাপ

বিশফুট। ইংরেজীতে একেই বলে ব্লক। অত্যন্ত স্পর্শ সচেতন আগাগোড়া শক্ত মাংসপেশী দিয়ে মোড়া। কাটলে দেখা যাবে তিন থাক তন্তু ; প্রথম এবং তৃতীয় থাক লম্বালম্বি এবং অনুভূমিক ; মাঝের থাকটা খাড়াই। এই কারণেই তিমির ল্যাজ এত মজবুত। ল্যাজের ঝাপটা খেলে নৌকো ভেঙে যায়, মানুষের পাঁজরা খসে যায়। এই ল্যাজ তলা দিয়ে গুটিয়ে সামনের দিকে নিয়ে আসে তিমি—তারপর সবেগে কুণ্ডলী খুলে দেয় পেছনের দিকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় এগিয়ে যায় সামনে—পাখনা দুটোর কাজ শুধু গতি নির্দেশ করা—আসল প্রপেলার ঐ ল্যাজ। ধাক্কা মেরে মেরে চলে বলেই দূর থেকে তিমির দৌড় অমন অদ্ভুত মনে হয়।

ল্যাজের কাজ মোট পাঁচ রকম। এক—এগোনো। দুই—লড়াই। তিন—আন্দোলন। চার—খেলা। পাঁচ—গোঁৎ মারা।

এক—তিমি ল্যাজ নাড়তে পারে না। নিকৃষ্ট মানুষ বা মাছই ল্যাজ নাড়ে। কিন্তু তিমি ল্যাজ গুটিয়ে এনে পেছনে ছুঁড়ে দেয়।

দুই—দুটো স্পার্ম তিমির সঙ্গে লড়াই হয় মাথা আর চোয়াল দিয়ে। কিন্তু মানুষকে অবজ্ঞা করে বলেই বোধ হয় ল্যাজের বাড়ি মারে। জলের মধ্যে দিয়ে বাড়ি আসে বলেই রক্ষে—তাতেও পাঁজরা ভাঙে, নৌকোর পাটাতন খসে যায়।

তিন—দু পাশের ফ্লুক নাড়িয়ে তিমি যখন জলে সাঁতরায়, মনে হয়, আহা রে! ঐ ল্যাজের যদি আঁকড়াবার ক্ষমতা থাকত, তাহলে ফুল তুলে মেয়েদের চুলে গুঁজে দিত পারত! মোলায়েম সেই ফ্লুক আন্দোলন যে না দেখেছে, সে বুঝবে না।

চার—আড়াল থেকে দেখুন। দেখবেন, চওড়া ফ্লুক ঝপাং করে জলে আছড়ে কি ভয়ংকর সুন্দর খেলায় মেতেছে তিমি। সে খেলছে আপন মনে—আপনার কিন্তু মনে হবে যেন কামান গজরাচ্ছে এবং বাষ্প মেঘ আকারে বহুদূর পর্যন্ত লাফিয়ে উঠছে।

পাঁচ—জলে গোঁৎ দেওয়ার সময়ে পেছন দিকের তিরিশ ফুট দেহ নিমেষে আকাশমুখো হয়ে কাঁপতে থাকে থরথর করে। তারপরেই অদৃশ্য হয় জল তলে। লাল সূর্যের পটভূমিকায় এই দৃশ্য অবিস্মরণীয়।

## গ্র্যাণ্ড আর্মাডা

১৫৮৮ সালে স্পেন বিশাল রণতরী বহর পাঠিয়েছিল ইংল্যাণ্ড বিজয়ের জন্য। এরই নাম আর্মাডা। অনুরূপ সেই দৃশ্যই দেখলাম সুন্দা অন্তরীপে—তিমি বাহিনীর মহান আর্মাডা।

ক্যাপ্টেন আহাব হিসেব ঠিক রেখেছেন। ওঁর লক্ষ্য প্যাসিফিক লাইন। মবি ডিক সেখানে থাকবেই। কিন্তু মাঝপথে যে সব জায়গায় স্পার্ম তিমিদের বিরাট জটলা, সেখানেও হানা দিতে দিতে চলেছেন। ওঁর মতলব সুমাত্রা থেকে সুন্দা অন্তরীপের মধ্যে দিয়ে জাভা সমুদ্রে গিয়ে পড়বেন। সেখান থেকে উত্তর দিকে যাবেন—স্পার্ম তিমিদের মিছিল দেখা যায় এসব অঞ্চলে। যাবেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে। তারপর জাপান উপকূলে—তিমিমেধ মহাযজ্ঞ শুরু হবে ঠিক তখনি সেখানকার জলে। এইভাবে সারা পৃথিবীতে চক্কর দিয়ে স্পার্ম তিমিদের সব কটা ঘাঁটিতে হানা দিয়ে পৌঁছাবেন প্যাসিফিক লাইনে—আর কোথাও না গেলে মবি ডিক সেখানে থাকবেই।

সুমাত্রার খণ্ডবিখণ্ড দ্বীপগুলোয় কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকে জলদস্যুর উপদ্রব লেগেই আছে। এই দ্বীপগুলোই ওদের ঘাঁটি। অন্তরীপ দিয়ে জাহাজ গেলেই ছোঁ মারে, লুঠ করে, নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

ফুরফুরে হাওয়ায় পিকুঅড ছুটে চলল এই সুন্দা অন্তরীপের দিকেই। এতখানি পথ একটানা চলা অন্য কোনো জাহাজের পক্ষে সম্ভব হত না। জল নিতেও অন্ততঃ বিভিন্ন বন্দরে থামতে হত; নিউইয়র্ক থেকে বেরিয়ে চীনদেশে যেতে হত। কিন্তু পিকুঅডের জঠরে রয়েছে এক বছরের মত জল—গোটা একটা সরোবর বোতল ভর্তি করে রাখা হয়েছে। খাবার দাবার যন্ত্রপাতি জিনিসপত্র—কিছুরই অভাব নেই। সুতরাং চালাও চালাও···পাল তুলে ভেসে যাও অসীম দরিয়ায়।

এই সুন্দা অন্তরীপে ঢুকতেই সহসা দেখা গেল সেই মহান দৃশ্য—তিমি বাহিনীর গ্র্যাণ্ড আর্মাডা।

একটা কথা বলে রাখি। চার সমুদ্রে তিমি নিধন ব্যাপক ভাবে চলায় তিমিরাও এখন চালাক হয়ে গেছে। দলছাড়া ভাবে বা ছোট ছোট দলে না থেকে বিরাট দল বেঁধে জল যাত্রা করে। তাই দিনের পর দিন একটি তিমিও দেখা যায় না। সহসা আবির্ভূত হয় দল বেঁধে।

মাস্তুলের মাথা থেকে সহসা চীৎকার ধ্বনি শোনা যেতে আমরা সচকিত হয়ে দেখলাম এমনি এক সুবিপুল তিমির দঙ্গল। গলুইয়ের দুদিকেই মাইল দুতিন দূরে অর্ধচন্দ্রাকারে তিমি ফোয়ারা উঠছে···উঠছে··· উঠছে। দুপুরের রোদ সহস্র রামধনু হয়ে ঠিকরে যাচ্ছে স্পার্ম তিমিদের একটি মাত্র ফোয়ারার গাঢ় বাষ্পের মধ্যে দিয়ে। রাইট তিমি হলে জোড়া ফোয়ারা দেখা যেত।

নীলাভ কুয়াশার মধ্যে যেন হাজার হাজার চিমনী মাথা তুলে আছে আকাশ পানে। কুচকাওয়াজ রত সৈন্যবাহিনীর মতই অর্ধচন্দ্রের প্রান্ত দুটি

গুটিয়ে আনল বিশাল তিমি বাহিনী এবং নিরেট লাইনে দ্রুতবেগে প্রবেশ করল অন্তরীপের অভ্যন্তরে। কিন্তু মাঝখানে অব্যাহত রইল অর্ধচন্দ্রাকার তিমিসজ্জা।

সব পাল তুলে দিয়ে সবেগে তাড়া করল পিকুঅড। হুল্লোড় উঠল জাহাজে। নৌকো নামানোর এখন দরকার নেই। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলেও হতে পারে। কালো তিমির কেন্দ্রে ওদের সাদা রাজা মবি ডিক যদি থাকে? শ্যামদেশের সাদা হাতীর মত রাজকীয় মিছিলের কেন্দ্রে সম্রাট মবি ডিকও তো থাকতে পারে!

হঠাৎ পেছনে নজর পড়তে দেখা গেল সেখানেও সাদা বাষ্প দেখা যাচ্ছে। উঠছে আর পড়ছে বাষ্পমেঘ—কিন্তু মিলিয়ে যাচ্ছে না—একনাগাড়ে ভেসে রয়েছে জলের ওপর।

চোখে দূরবীন লাগিয়ে হেঁকে উঠলেন ক্যাপ্টেন—"বোম্বেটে!"

হ্যাঁ, বোম্বেটেই বটে। এতক্ষণ ঘাপটি মেরে ছিল। এবার বেরিয়ে এসেছে। সুন্দা অন্তরীপের মধ্যেই ঘায়েল করতে চায় আমাদের।

আহাব হাড়ের ঠ্যাং কাঠের গর্তে রেখে চেঁচিয়ে উঠলেন তারস্বরে—"পালে জল ঢালো! মালয় বোম্বেটে!"

মজা মন্দ নয়। আমরা তাড়া করেছি তিমিদের—আবার আমাদের তাড়া করেছে হার্মাদ।

এই সময়ে হাওয়া নতুন তেজে আছড়ে পড়ল পালে। আহাব পায়চারী করতে লাগলেন ডেকে! চোখ রইল সামনে আর পেছনে। কপালের ভ্রূকুটিতে পরিস্ফুট হল ভেতরের উদ্বেগ।

ভীমবেগে ছুটে চলার দরুণ ক্রমশঃ পেছিয়ে পড়ল বোম্বেটে জলপোত। রক্তলোলুপ মালয়রা পারবে কেন তিমি জাহাজের বেগের সঙ্গে?—তীরবেগে ঝকঝকে সবুজ ককাটু পয়েন্ট পেরিয়ে বার সমুদ্রে পড়ল পিকুঅড।

তাড়া খেয়ে তিমি বাহিনীর আরো কাছে এগিয়ে এসেছি আমরা। হার মেনে চম্পট দিয়েছে নেকড়ের মত হিংস্র মালয়রা।

তিনখানা নৌকো নামানো হল জাহাজ থেকে। তিমিরা কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে বুঝল—শত্রু লেগেছে পেছনে। নিমেষে আগের মত ব্যূহ রচনা করে দ্বিগুণ করল গতিবেগ।

বেশ কিছুক্ষণ তাড়া করার পর লক্ষণ দেখে বুঝলাম ওরা ভয় পেয়েছে। দলবদ্ধ ভাবে না থেকে এলোমেলো ভাবে ছুটছে—এগোচ্ছে না, পেছোচ্ছেও না—একই জায়গায় ঘুরছে।

বিশ্বের যে কোনো দলবদ্ধ জীবের মধ্যে কিন্তু এই সাময়িক ভীতির বিস্ফোরণ ঘটতে দেখা যায়। আতংকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে পুরুর হাতীর দল পাগল হয়ে যায়নি? দশ হাজার কেশরযুক্ত ঘোষকে আতংকে উন্মাদ করে দেয় না একজন মাত্র অশ্বারোহী? থিয়েটারে একটু আগুন লাগলেই মানুষগুলো একে ওকে মাড়িয়ে ফেলে পাগলের মত ছুটোছুটি করে না?

এই অবস্থায় নৌকোদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ার নিয়ম। আমাদের তিনখানা নৌকো ধেয়ে গেল তিনটে তিমির দিকে। কুঈকোয়েগের হার্পুন গাঁথল একজনের পিঠে। উল্কাবেগে টেনে নিয়ে চলল সে আমাদের কাতারে কাতারে তিমিদের মধ্যে দিয়ে আরো ভেতরে!

সর্বনাশ! আশেপাশে বিশাল ফ্লুক উঠছে, পড়ছে; কখনো অন্য তিমি নৌকোর সামনেই চলে আসছে। নীল জলে সাদা ক্ষত সৃষ্টি করে নৌকোখানা কিন্তু বিপন্নভাবে উড়ে চলেছে এদের মধ্যে দিয়ে। যে কোনো মুহূর্তে সংঘর্ষ লাগতে পারে—গুঁড়িয়ে ছাতু হয়ে যেতে পারি।

কিন্তু বুকের পাটা বটে কুঈকোয়েগের। হাল ধরে আশ্চর্য কায়দায় নৌকো কাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাথার ওপর লটপটে ফ্লুকের তলা দিয়ে, ছুটন্ত তিমির পাশ দিয়ে। কখনো গা ঘসটে, কখনো ঘুরে, কখনো সোজা—ক্ষুরের মত জল কেটে ছুটেছে নৌকা। দাঁড়িদের আর কোনো কাজ নেই—কিন্তু চেঁচাচ্ছে সমানে। আর, আগাগোড়া নিথর দেহে বর্শা হাতে গলুইয়েতে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছেন স্টারবাক।

সব তিমি নৌকোতে অদ্ভুত কতকগুলো কাঠের ব্লক থাকে। নানটাকেট বাসিন্দাদের আবিষ্কার এই জিনিস। নাম, ড্রাগ। চৌকোণা দুটো কাঠের টুকরো কোণাকুণি ভাবে সংলগ্ন এবং তাতে বাঁধা হার্পুনের লাইনের শেষ প্রান্তটা বাঁধা। তিমির দলে গিয়ে পড়লে যখন অনেকগুলো তিমিকে একটা নৌকোর পেছনে তাড়া করা সম্ভব হয় না, তখন এই ড্রাগ লাগানো হার্পুন ছুঁড়ে ঘায়েল করা হয় একাধিক তিমি। ছুটে পালায় পালাক। কিন্তু কাঠের ব্লক ভাসতে থাকে জলে। পরে আহত তিমিকে বাগে আনা যায়—অন্য কোনো জাহাজ লাভবান হয়।

আমাদের নৌকোতেও তিনটে ড্রাগ ছিল। প্রথম দুটি নিক্ষিপ্ত হল নির্ভুল লক্ষ্যে—কিন্তু তৃতীয়টি ছুঁড়তে গিয়ে ড্রাগটা নৌকোর সিটের তলায় আটকে যাওয়ায় নৌকোর খানিকটা তক্তা উপড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি শার্ট খুলে ফুটো বন্ধ করলাম।

ইতিমধ্যে নৌকোর গতি কমে এসেছে—তিমি হাঁপিয়ে উঠেছে নিশ্চয়। কিন্তু এসে পড়েছি তিমি বাহিনীর একদম কেন্দ্রে। দুটো পাহাড়প্রমাণ তিমির মাঝখানের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলাম, সরোবরের মত শান্ত জল। বাইরে অত দাপাদাপি—এখানে তার লেশমাত্র নেই। ঠিক যেন উপত্যকার কেন্দ্রে শান্ত হ্রদে পৌঁছেছি। আট দশটা প্রকাণ্ড তিমি গায়ে গা লাগিয়ে চক্রাকারে ঘুরছে সার্কাসের ঘোড়ার মত—এত ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘুরছে যে ইচ্ছে করলে ওদের গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত যাওয়া যায়। ওরা ঘুরছে তো ঘুরছেই—যে পথে ঢুকেছিলাম, সে পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জীবন্ত প্রাচীরের জেলখানায় বন্দী হয়েছি আমরা। একেবারে কেন্দ্রে শান্ত জলে শান্তশিষ্ট কয়েকটি গাভী আর বাছুর নিরীক্ষণ করছে আমাদের নৌকো—অচঞ্চল চোখে।

বাচ্চা তিমিগুলোর মনে এতটুকু প্যানিক নেই, আতংক নেই, ভয়ডরের লেশমাত্র নেই। নির্ভীকভাবে ভেসে এল নৌকোর কাছে পোষা কুকুরের মত—এত কাছে এল যে কুঈকোয়েগ ওদের কপাল চাপড়ে আদর করল, স্টারবাক বর্শা দিয়ে পিঠ চুলকে দিলেন—কিন্তু ছোঁড়বার সাহস হল না। তিমির দল ইচ্ছে করেই এই গোলাকার শান্ত সরোবর বানিয়ে রেখেছে শিশু আর মায়েদের জন্যে। এখানে রক্তপাত ঘটলে আর রক্ষে নেই। এ যে তাদের আঁতুড় ঘর!

কি আশ্চর্য দৃশ্য! অদ্ভুত! অদ্ভুত! সত্যিই অদ্ভুত! তিমি মায়েরা ভাসছে এবং দুধ খাওয়াচ্ছে বাচ্চাদের। মানুষ-মায়ের কোলে শুয়ে শিশু যেমন অন্য দিকে তাকিয়ে মায়ের দুধ খায়, তিমি-শিশুরাও আমাদের দিকে তাকিয়ে মায়ের দুধ খাচ্ছে। মায়েরাও চোখ রেখেছে আমাদের ওপর—প্রশান্ত চাহনি। একটা বাচ্চার বয়স খুব জোর একদিন—লম্বায় প্রায় চোদ্দ ফুট, পেটটা ফুট ছয়েক মোটা।

জল এখানে নিস্তরঙ্গ এবং স্বচ্ছ টলটলে। তাই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কুঈকোয়েগ—"লাইন! লাইন!...বাচ্চা তিমি...মা তিমি! কে মেরেছে?... কে বেঁধেছে?" বলেই আঙুল দিয়ে দেখাল জলের মধ্যে।

ফলে, দেখতে পেলাম এমন এক দৃশ্য যা প্রাণী জগতের মধ্যে গুপ্ত রহস্য—মানুষ যা সচরাচর দেখতে পায় না। দেখতে পেলাম, শ্রীমতী তিমিঙ্গিলের নাড়ী এখনো কাটা হয়নি—বাচ্চার সঙ্গে দীর্ঘ রজ্জুর মত নাড়ী সংযুক্ত রয়েছে এবং ভাসছে জলের মধ্যে—যেমন করে ঘায়েল তিমি-সংলগ্ন একশ ফ্যাদম লম্বা লাইন কুণ্ডলী পাকিয়ে ভাসে জলের মধ্যে। তিমি মায়ের কোলে শুয়ে এখনো খেলায় মত্ত শিশু।

তিমির বাচ্চা বছরের যে কোনো সময়ে জন্মায়। যমজ বাচ্চা খুব কমই হয়। মায়ের দুধের থলি যদি দৈবাৎ বর্শার ঘায়ে কেটে যায়, রক্ত আর দুধে ভেসে যায় সমুদ্র। তিমির দুধ কিন্তু খেতে খুব মিষ্টি এবং মাখন ভরপুর। মানুষ খেয়ে দেখেছে। লিচু দিয়ে খেতে আরো ভাল লাগে।

ভেতরে এই শান্তির স্বর্গরাজ্য—বাইরে কিন্তু অশান্তির নরক। আরো দুটি নৌকোকে দেখছি অনেক দূরে। জল তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে সেদিকে। খুন জখম চলছে নিশ্চয় পুরোদমে।

কিন্তু একদিকের জলে যেন প্রলয় শুরু হয়েছে। জল উথালিপাথালি হচ্ছে, পাগলের মত অন্ধবেগে এলোমেলো ছুটছে তিমিরা! ব্যাপার কী?

পরে জানলাম কি হয়েছিল ওখানে। এরকম দুর্ঘটনা তিমি শিকারে বড় একটা ঘটে না। আহত তিমিই যন্ত্রণাবিকৃত উন্মাদনায় এলোপাতাড়ি কোপ মেরে জখম করেছে তিমিদের। কিন্তু কোপটা কিসের?

তিমি কোদালের। খুব দামাল তিমিকে ঘায়েল করার নিয়ম হল ল্যাজের টেনডন তিমি-কোদাল ছুঁড়ে কেটে দেওয়া। পেছনে দড়ি লাগানো থাকে বলে কার্য-সমাধা হলে তিমি-কোদালকে টেনে নেওয়া যায়।

কিন্তু এক্ষেত্রে হয়নি; উপরন্তু গায়ে বেঁধা হার্পুনের দড়িতে সেটি জড়িয়ে গিয়েছে এবং হার্পুনের লাইন তিমির ল্যাজে পাকসাট খেয়ে যাওয়ায় ঘটেছে এই বিপত্তি।

কাটা ল্যাজের যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে ল্যাজ আছড়াতে আছড়াতে ছুটছে তিমিটা। তিমি-কোদাল উড়ন্ত তরবারির মত দুপাশে কোপ মেরে গেছে অন্যান্য তিমিদের গায়ে, সে এক বীভৎস দৃশ্য!

সন্ত্রাসের ঢেউ এসে লাগল আঁতুর ঘরের পরিধিতে। দ্রুত ছোট হয়ে আসতে লাগল বৃত্ত। মাঝের সরোবর ছোট হয়ে আসছে—আমরা তিমি-দেহে পিষ্ট হতে চলেছি।

ভীষণ উদ্বেগে চাপা কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে উঠলেন স্টারবাক—"দাঁড়! দাঁড়।... কুইকোয়েগ—ধাক্কা মারো- খোঁচা মারো! দাঁড় টানো—বাঁচতে চাও তো দাঁড় টানো চটপট...হে ভগবান!..."

দুটো মহাকায় কৃষ্ণকায় তিমিদেহের মধ্যে পড়ে মচমচ করে উঠল অপলকা নৌকো। প্রাণপণ চেষ্টায় দাঁড়ের খোঁচা মেরে প্রাণ মুঠোর মধ্যে নিয়ে কোন-মতে বেরিয়ে এলাম বাইরে। কিন্তু তারপর? পথ কোথায়। বলয়াকারে বেষ্টন করে ক্রমশঃ কেন্দ্রের দিকে সরে আসছে ভয়ার্ত কালো দানবরা! কেউ

উন্মত্ত, কেউ স্থির, কারও ফ্লুক ভীমবেগে জল ঘোলাচ্ছে, কেউ তীরবেগে ছুটছে —সবার গতি কেন্দ্রের দিকে!

ভয়ানক এই সঙ্কট থেকে বেরোনোর জন্যে আমরা প্রতিমুহূর্তে নৌকোর গতি পরিবর্তন করলাম। এঁকেবেঁকে, কখনো দ্রুতবেগে, কখনো ঢিমেতালে সরে এলাম একদম বাইরের পরিধির দিকে। অবশেষে ভাগ্য সহায় হল। অতি সঙ্কীর্ণ একটা ফাঁকের মধ্যে ফ্লুকের মার খেতে খেতেও বেরিয়ে এলাম গ্র্যাণ্ড আর্মাডার ব্যূহ ভেদ করে।

ওরা কিন্তু আবার জমাট হয়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে নিরাপদ অঞ্চলে। এখন আর পাছু নেওয়া বৃথা। ফ্লাস্ক একটি তিমি মেরে কাঠের ডাণ্ডা পুঁতে রেখেছিল পিঠে নিশানা স্বরূপ। সেটিকে সংগ্রহ করলাম।

এ থেকে একটি শিক্ষা পেলাম। দলে বেশী তিমি থাকলে কপালে জোটে কম। ড্রাগ-আটকানো তিমিগুলো কিন্তু খুঁজেও পেলাম না—অন্য জাহাজ পেয়েছিল অনেক পরে।

## স্কুল আর স্কুল মাস্টার

এত বড় দল কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তিমিরা কিন্তু ছোট ছোট দল বেঁধেও ঘুরে বেড়ায়। এক একটা দলে বিশ থেকে পঞ্চাশটা তিমি থাকে। এ দলকে বলা হয় স্কুল।

স্কুল দু'রকমের—শুধু মেয়েদের নিয়ে, শুধু ছেলেদের নিয়ে।

মেয়েদের নিয়ে যে দল, তাকে বলা হয় হারেম। কারণ এ দলের দলপতি একজন শক্তিমান জোয়ান মদ্দা তিমি। বুড়ো নয় মোটেই।

বউদের কাছে বাইরের তিমি ঘুর ঘুর করলেই তেড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কামড়াকামড়ির ফলে দেখা যায় কারো চোয়াল ভেঙে ঝুলছে, কারো ল্যাজ আধখানা হয়ে গেছে, কারো চোখ খুবলে নেওয়া হয়েছে। এই দলপতির নাম স্কুলমাস্টার।

ছেলেদের দলে থাকে কেবল অল্পবয়স্ক ছোঁড়া। তাই বলা হয় ষাঁড়ের দল। এরা কলেজের ছেলেদের মত দল বেঁধে বিশ্বভ্রমণে বেরোয়—হৈচৈ করে কাটিয়ে দেয়। বড় হলে কিন্তু দল ভেঙে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে যে যার হারেম বানিয়ে নিতে।

ষাঁড়ের দলে কোনো একতা নেই। বহিরাগতের আক্রমণে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসরণ করে।

কিন্তু হ্যারেমের মেয়েদের মায়ামমতা আছে। বিপন্নকে ঘিরে ধরে—নিজেরা বিপন্ন হবে জেনেও।

## ফাস্ট-ফিশ আর লুজ-ফিশ

একজনের হাতে জখম তিমি আরেকজন দখল করতে পারে। তিমি শিকারের মহোৎসবে এরকম ঘটনা প্রায় ঘটে এবং জাহাজে জাহাজে তর্কযুদ্ধ, মনকষাকষি হয়। এ অবস্থায় একটা নিয়ম থাকা দরকার। নিয়মটা এই :

১। ফাস্ট ফিশ :—যে আগে গাঁথতে পারবে তার।

২। লুজ ফিশ :—যে আগে ধরতে পারবে, তার।

ব্যস, এই দুটি নিয়ম মেনে চললেই গোল চুকে গেল। ছাড়া মাছ ধরে নাও—কোনো ঝগড়া নেই। কিন্তু গাঁথা মাছ যে গেঁথেছে, তার।

রূপকার্থে ইণ্ডিয়াও লুজ ফিশ—ইংল্যাণ্ডের কাছে; গ্রীস—তুর্কীর কাছে; মেক্সিকো—যুক্তরাষ্ট্রের কাছে; আমেরিকা—কলম্বাসের কাছে; পোল্যাণ্ড—জারের কাছে। ছাড়া মাছ সবাই—যে পেরেছে, লুঠে নিয়েছে!

## মাথা না ল্যাজ

ইংরেজ আইনে আছে, ইংল্যাণ্ডের উপকূলে যে তিমিই মারা হোক না কেন, মাথাটা রাজার প্রাপ্য, ল্যাজটা রাণীর।

বছর দুই আগে অতি কষ্টে একটি অতি চমৎকার তিমিকে মেরে তীরে টেনে আনার পর রাজার লোক এসে মাথায় হাত দিয়ে বললে—"মাথা দখল করলাম রাজার নামে।"

শিকারীরা তো হতবাক! কাকুতি মিনতি, অনুরোধ উপরোধ, যুক্তিতর্ক—কিছুই খাটল না।

ডিউকের ভোগে লাগল মহামূল্যবান তিমির মাথা!

## পিকুঅড বনাম রোজ-বাড

তিমির দঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার দু'এক সপ্তাহ পর দেখা হল রোজ-বাড জাহাজের সঙ্গে।

অনেকক্ষণ থেকে একটা বিটকেল গন্ধ পাচ্ছিলাম। স্টাব বললে—"ড্রাগ আটকানো তিমিগুলো নিশ্চয় এখানেই মরে ভাসছে।"

গন্ধ শুঁকে শুঁকে কিছুদূর যেতেই দেখলাম একটা জাহাজ ভাসছে। ফরাসী জাহাজ। একপাশে ফুলে ঢোল হয়ে ভাসছে একটা মরা তিমি। দুর্গন্ধে টেঁকা দায়। আরেক পাশে ভাসছে একটা শুকনো তিমি। বদহজম বা ঐ জাতীয় কোনো রোগাক্রান্ত তিমি—আপনা থেকে মরে ভাসতে থাকে—কিন্তু ভেতরে তেল জাতীয় কিছু থাকে না—শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

স্টাব কিন্তু চেঁচিয়ে উঠল—"ঐ তো! ঐ তো আমার তিমি-কোদাল!"

সত্যিই একটা তিমি-কোদাল হার্পুনের দড়িবাঁধা অবস্থায় ঝুলছে ল্যাজের কাছে।

কাছাকাছি হতেই হাঁক দিল স্টাব—"আহয়! ইংরেজী জানা আছে?"

"আছে।" জবাব এল রোজ-বাড থেকে।

"সাদা তিমিকে দেখেছো?"

"কি তিমি?"

"সাদা—নাম, মবি ডিক।"

"জীবনে ও নাম শুনিনি।"

ক্যাপ্টেন আহাব কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে কথোপকথন শুনে নেমে গেলেন কেবিনে। স্টাব কিন্তু নৌকো নামিয়ে গেল রোজ-বাডে। ডেকে উঠে দেখল নাকে থলি বেঁধে একজন নাবিক তিমি-কোদাল দিয়ে গা খোঁচাচ্ছে দুর্গন্ধ তিমিটার। ডেকে অন্যান্য লোকেরাও ব্যাজার মুখে নাকে থলি বেঁধে কপিকল নামাচ্ছে। কারও ইচ্ছে নেই—কিন্তু ক্যাপ্টেনের হুকুম; না মানলেই নয়।

খোঁজ নিয়ে জানল স্টাব, ক্যাপ্টেন এই প্রথম সমুদ্রে বেরিয়েছে। ইংরেজী জানে না। আগে কোলন সেন্ট তৈরী করত। শুনে মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি এল স্টাবের। নাকে থলি বাঁধা ইংরেজী-জানা লোকটার সঙ্গে একটা ফন্দী আঁটল।

এই সময়ে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন। অল্প বয়স।

নাকে থলি বাঁধা ফরাসী বলল—"কি বলব?"

স্টাব ইংরেজীতে বলল—"বলো, ক্যাপ্টেনটাকে দেখতে কচি খোকার মত।"

ফরাসী খালাসী বললে—"ক্যাপ্টেন, ইনি বলছেন, দিন কয়েক আগে এই মরা তিমিটাকে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে একটা জাহাজে মড়ক লেগেছে।"

চোখ গোল গোল করে ক্যাপ্টেন ফরাসী ভাষায় জানতে চাইলেন আরো খবর।

খালাসী শুধোলো—"কি বলব ?"

স্টাব বলল—"বলো, ক্যাপ্টেনকে দেখতে ঠিক বেবুনের মত।"

খালাসী বললে—"ক্যাপ্টেন, ওপাশের ঐ শুকনো তিমিটারও খারাপ রোগ আছে—ভেতরেও মাল নেই।"

হন্তদন্ত হয়ে ক্যাপ্টেন বারণ করলেন কপিকল নামাতে। স্টাবকে আমন্ত্রণ করলেন মদ খেতে।

খালাসী শুধোলো—"কি বলব ?"

স্টাব বলল—"বলো, বোকা হাঁদার সঙ্গে আমি মদ খাই না।"

খালাসী বলল—"ক্যাপ্টেন, ইনি মদ খান না। তবে বলছেন, এখুনি জাহাজ নিয়ে দূরে সরে যাওয়া দরকার।"

ব্যস, তক্ষুনি তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল জাহাজে। বোটে নেমে এল স্টাব। রোজ-বাড দূরে সরে যেতেই নৌকো নিয়ে গেল শুকনো তিমির পাশে। তিমি-কোদাল তুলে নিয়ে ঘচাঘচ কোপ মেরে পাঁজরের গায়ে গর্ত করে ফেলল এবং ভেতরে দু-হাত ঢুকিয়ে হাতড়ে হাতড়ে বার করে আনল সাবান বা চীজের মত হলদেটে ছাই-ছাই রঙের খানিকটা বস্তু। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে—পচা গন্ধও ছাপিয়ে উঠল আশ্চর্য মিষ্টি, মৃদু অথচ তেজালো সেই সুগন্ধ।

আরো কয়েক খামচা পদার্থ টেনে আনল স্টাব—অনেকখানি গড়িয়ে গেল সাগরে—বেশ খানিকটা রয়ে গেল তিমির গায়েই—কেন না, হেঁকে উঠলেন ক্যাপ্টেন আহাব—আর দেরী করলে ওদের ফেলেই চলে যাবেন।

অদ্ভুত এই সুগন্ধর নাম অ্যামবারগ্রিস—ওষুধ নির্মাতাদের কাছে যার এক আউন্সের দাম এক সোনার মোহর।

## অ্যামবারগ্রিস

অ্যামবারগ্রিস জিনিসটা কি ?—এক রকমের মোম-মোম, নরম, গন্ধযুক্ত পদার্থ যা দিয়ে প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধদ্রব্য, দামী মোমবাতি, কেশ-পাউডার, ধূপ, পমেটম তৈরী হয়। তুর্কীরা এদিয়ে রান্না করে—মক্কায় নিয়ে যায়। মদ তৈরীর সময়ে কয়েক গ্রেন মিশিয়ে দিলে গন্ধে টেবিল মাৎ হয়।

স্টাব কিন্তু অ্যামবারগ্রিসের মধ্যে কয়েকটা হাড়ের কুচোও পেয়েছিল। স্কুইডের হাড়।

কিন্তু অ্যামবারগ্রিস তিমির দেহে এল কি করে? বদহজমে যে তিমি মারা যায়, অ্যামবারগ্রিস তাদের দেহেই পাওয়া যায়। জিনিসটা বদহজমের আগে হয় কি পরে হয়—তা জানা যায়নি।

তিমির গায়ে কিন্তু গন্ধ থাকে না। ভাল, খারাপ—কোনো গন্ধই থাকে না। তিমি যারা ধরে, নাক দিয়ে শুঁকে তাদের চেনাও যায় না—তারাও নির্গন্ধ। তবু কিছু দুর্নাম আছে তিমি জাহাজ সম্বন্ধে। কেন জানেন? গ্রীনল্যাণ্ড বরফের দেশ বলে ওখানে তিমির চর্বি কেটে জাহাজে চাপিয়ে ডাঙায় নিয়ে আসা হত। গন্ধ ছাড়ত তখনি। আমরা, আমেরিকানরা, তিন চার বছর জলে থাকি—জাহাজেই চর্বি থেকে নির্গন্ধ তেল বার করে পিপেতে ভরে ফেলি—সময় লাগে বড় জোর পঞ্চাশ দিন।

## পরিত্যক্ত

ফরাসী জাহাজকে বোকা বানাবার দিনকয়েক পর একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটল পিকুঅড জাহাজে।

হাসিখুশী একটি নিগ্রো ছিল জাহাজে—নাম তার পিপ। তাম্বুরা বাজাতে ওস্তাদ, হাসতে গাইতে পটু, বুদ্ধি উজ্জ্বল চোখে জীবনের প্রতি অসীম মমতা। মানুষ নার্ভাস হয় তখনি যখন জীবনকে বেশী ভালবেসে ফ্যালে।

অ্যামবারগ্রিস নিষ্কাসন করতে গিয়ে স্টাবের নৌকোয় একজন দাঁড়ির কব্জি মুচড়ে গিয়েছিল। দিনকয়েক তাকে বিশ্রাম দেওয়া হল। তার পরিবর্তে পিপকে বসানো হল দাঁড়ে।

তিমির পেছনে ধাওয়া করতে গিয়ে ঘটল দুর্ঘটনাটা। হার্পুন গায়ে লাগতেই ল্যাজের ঝাপটানি মারল আহত তিমি—ঝাপটানি এসে লাগল নৌকোর ঠিক যেখানে পিপ বসেছিল, সেইখানে। ভয়েময়ে তৎক্ষণাৎ নৌকো থেকে জলে ঝাঁপ দিল পিপ—সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎবেগে লাইন গিয়ে পড়ল জলে এবং জড়িয়ে গেল তার বুকে আর পায়ে—সঙ্গে সঙ্গে উল্কা বেগে মরণ দৌড় শুরু করল তিমি।

সভয়ে দেখল সবাই, মুখ নীল হয়ে গিয়েছে পিপের—চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে।

চীৎকার করে উঠল স্টাব—ট্যাশটেগো ছুরী দিয়ে কেটে দিল লাইন। তিমি পালালো—পিপ বাঁচল।

জাহাজে ফিরে আসার পর স্টাব যথেষ্ট গালিগালাজ করার পর বললে—

"যাই হোক না কেন, নৌকো থেকে লাফাবে না। বুঝেছো? মনে রেখো, তোমার যা দাম, তার তিরিশ গুণ বেশী দাম একটা তিমির।"

কিন্তু পরের বারে আবার জলে ঝাঁপ দিল পিপ। স্টাব কিন্তু কথার নড়চড় করল না। ছুরী দিয়ে লাইন কাটতে হুকুম দিল না। পিপের পানে পেছন ফিরে বসে রইল কাঠ হয়ে—তিন মিনিটে এক মাইল ব্যবধান এসে গেল দুজনের মাঝে।

স্টাব কি সত্যিই ওকে জলে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিল? না। ও জানত, আরো দুটো নৌকো পেছনে আছে।

কিন্তু পিপের কপাল খারাপ। দুটো নৌকোই দুদিকে সরে গেল দুটো তিমির পেছনে—কেউ ওকে দেখতেও পেল না।

অথই জলে একলা ভাসতে লাগল পিপ। ভয়াবহ সেই নিঃসঙ্গতা ভাষায় বোঝানো যায় না।

ঘণ্টাখানেক পরে দৈবাৎ পিকুঅড থেকে দেখা গেল তাকে। তুলে আনা হল ডেকে।

দেখা গেল, উন্মাদ হয়ে গিয়েছে জীবন-প্রেমিক পিপ।

## স্পার্ম মহিমা

ডিঙিটাকে টেনে আনা হল জাহাজের পাশে। কপিকল লাগিয়ে শুরু হল চর্বিকাটা।

মূল্যবান স্পার্ম তেল বড় বড় বালতি করে তুলে আনা হল তিমির বিশাল হাইডেলবার্গ টান অর্থাৎ চৌবাচ্চা থেকে। ঠাণ্ডা হয়ে যেতেই শুরু হল ক্রস্ট্যালের দানা বাঁধা। আমরা কজন বসে গেলাম বিরাট আধারের পাশে। হাত দিয়ে পিষে, কব্জি ঘুরিয়ে মোচড় দিয়ে ক্রস্টালগুলোকে মিশিয়ে দিতে লাগলাম তেলের মধ্যে।

এক নাগাড়ে এই কাজ করতে করতে স্পার্ম তেলের মহিমা সম্পর্কে অনেক উচ্ছ্বাস ভীড় করে এল মাথায়। সত্যিই তো, এত স্বচ্ছ সুন্দর বলেই সেকালে স্পার্ম তেল দিয়ে সৌন্দর্য রক্ষা করতে চাইত সুন্দরীরা।

নাড়াচাড়া করতে গিয়ে আমার আঙুলগুলোর চেহারাই যেন পাল্টে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে।

## ট্রাই-ওয়ার্ক

ট্রাই-ওয়ার্ক জিনিসটা চর্বি জ্বাল দেওয়ার উনুন—বসানো থাকে জাহাজের খোলে—ঝিঁক উঠে থাকে ডেক বরাবর। ডেকের পাটাতন সরিয়ে কড়া বসানো হয় উনুনে। শুরু হয় জ্বাল দেওয়া। উনুনটা কিন্তু প্রথমে ধরানো হয় কাঠ দিয়ে—তারপর জ্বাল দেওয়া চর্বি-মাংসের গাদ দিয়ে জ্বালানো হয় আগুন। সংক্ষেপে, তিমিই নিজে জ্বলে জ্বাল দেয় তিমিকে।

## পা আর হাত

"আহয়, জাহাজ! সাদা তিমি চোখে পড়েছে?"

যথারীতি আবার ক্যাপ্টেন আহাব চেঁচিয়ে উঠলেন একটা ইংরেজ জাহাজকে দেখে। আহাব দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার ডেকে। ইংরেজ ক্যাপ্টেন হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজের গলুইতে। সুদর্শন। বয়স ষাটের কাছাকাছি। পতাকার মত নীল পাইলট কাপড়ের আচ্ছাদন ঝুলছে অংগ ঘিরে। মুখে কৌতুকের আভাস। একটা হাত দেখা যাচ্ছে না আস্তিনের আড়ালে।

"সাদা তিমি দেখেছেন?"

আস্তিনের আড়াল থেকে হাতটা বার করে তুলে ধরে ইংরেজ জবাব দিলেন—"এটা দেখেছেন?"

হাতটা হাড়ের। স্পার্ম তিমির হাড়। তেলোর জায়গায় কাঠের হাতুড়ি।

দেখেই ছিটকে গেলেন আহাব—"নৌকো নামাও! আমার নৌকো নামাও!"

ফেডাল্লা আর তার সাগরেদদের নিয়ে তড়বড় করে উঠে বসলেন নৌকোয়। সবাইকে নিয়ে নৌকো নেমে গেল জলে। কিন্তু ইংরেজ জাহাজের পাশে গিয়ে আহাবের খেয়াল তাঁর একটা পা হাড়ের।

এদিকে ইংরেজ খালাসী যথারীতি মই ঝুলিয়ে দিয়েছে জাহাজের গায়ে। পিকুঅডে তাঁর এই অক্ষমতার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে—উত্তেজনার মাথায় তা বিস্মৃত হয়েছিলেন আহাব।

ইংরেজ ক্যাপ্টেন ঝুঁকে পড়ে আহাবের হাড়ের পা দেখেই বুঝলেন সমস্যাটা কোথায়। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন কপিকল নামাতে। আঁকশিটা

নেমে আসতেই অবশিষ্ট উরুখানি তার ওপর গলিয়ে দিলেন আহাব—ঠিক যেন আপেল গাছের গুঁড়িতে বসেছেন। কপিকল টেনে তুলল তাঁকে ডেকের ওপর।

এগিয়ে এলেন ইংরেজ ক্যাপ্টেন। সকৌতুকে আহাবের হাড়ের পা দেখে নিজের হাড়ের হাতখানা এগিয়ে দিয়ে হেসে উঠলেন হা-হা করে—"হ্যাণ্ডশেক করুন মশায়! এযে দেখছি মাণিকজোড়! আপনার পা নেই—আমার গেছে হাত!"

হাতখানার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আহাব বললেন—"কে নিয়েছে? সাদা তিমি?"

"তারই জন্যে বলতে পারেন।"

"কিভাবে?"

"আপনার পা?"

"সে নিয়েছে।—গল্পটা বলুন।"

বেশ কৌতুকচ্ছলেই গল্প বললেন ইংরেজ ক্যাপ্টেন। তাড়া করেছিলেন একটা পেল্লায় কালো তিমিকে। এমন সময়ে জল থেকে সাদা ভূতের মত উঠে এল একটা প্রকাণ্ড সাদা তিমি—কপালটা কুঁচকোনো। পাখনার কাছে গাঁথা হার্পুন।

"মবি ডিক! মবি ডিক!" খরচোখে চেঁচিয়ে উঠলেন আহাব। "হার্পুনট আমার। তারপর?"

"বলতে দিচ্ছেন কই?" হাসলেন ইংরেজ ক্যাপ্টেন। "উঠে এসেই দাঁত দিয়ে হার্পুনারের লাইন কামড়ে কেটে দিতে চাইল।"

"মবি ডিক! মবি ডিক! সেই পুরোনো কায়দা!"

"কিন্তু লাইন কাটতে গিয়ে দড়িটা ওর দাঁতে জড়িয়ে গিয়েছিল। টানের চোটে আমাদের নৌকো উল্টে গেল—আমি ঠিকরে পড়লাম পড়লাম ওর বিরাট কুঁজের ওপর।"

"আ!—তারপর?" ইংরেজ ক্যাপ্টেনের কাঁধ খামচে ধরলেন আহাব।

"দেখলাম, এতবড় এত সুন্দর একটা স্পার্ম তিমিকেই বা ছেড়ে দিই কেন? লাফ দিয়ে পড়লাম পাশের নৌকোয়। হার্পুন তুলে নিয়ে যেই গেঁথেছি—বলব কি মশায়, সটান ওপর থেকে ফ্লুক নামিয়ে বাড়ি মারল নৌকোর মাঝ-খানে। সঙ্গে সঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল নৌকো। ততক্ষণে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করেছে সাদা তিমি। আমি জলে পড়েছি—লাইনে বাঁধা বাক হার্পুনটা ঘ্যাচাৎ করে গেঁথে গেল হাতে। তারপরেই হ্যাঁচকা টানে লম্বা

নম্বিভাবে মাংস চিড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল হার্পুন। এরপর কি হয়েছে জানে এই ডাক্তার।"

ডাক্তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। ধীর স্থির সৌম্যমূর্তি।

তিনি বললেন—"হাতখানা রাখা গেল না—খসে গেল। কাটা ঘা জুড়তে সময় লাগল বেশ কিছুদিন। ক্যাপ্টেনই হাড়ের হাত লাগালেন—ডগায় হাতুড়ি!"

"তারপর আর দেখেন নি?" নির্নিমেষে চেয়ে শুধোলেন আহাব।

"দুবার দেখেছি।"

"মারতে চেষ্টা করেন নি?"

"আবার? বলেন কি মশায়! বাকী হাতটাও খোয়াবো? তখন জানতাম না কার ঘাড়ে পা দিয়েছি। পরে যখন জানলাম ওর নাম মবি ডিক—আর ঘাঁটাতে যাই? আপনি হলে কি করতেন?"

"কোনদিকে যেতে দেখেছেন?"

ডাক্তার এগিয়ে এসে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন—"ব্যাপার কি? আপনার জ্বর হয়েছে নাকি?" পকেট থেকে ল্যানসেট বার করে আহাবের হাতে ছুঁইয়ে বললেন—"সর্বনাশ! নাড়ী এত জোরে ছুটছে কেন! জাহাজের তক্তা পর্যন্ত কাঁপছে যে!"

"অ্যাভাস্ট!" এক ধাক্কায় ডাক্তারকে রেলিংয়ের ওপর ঠেলে ফেলে দিলেন আহাব। "নৌকো তৈরী করো! কোনদিকে গেছে?"

"গুড গড!" সবিস্ময়ে বললেন ইংরেজ ক্যাপ্টেন—"ব্যাপার কি বলুন তো? পুব দিকে যেতে দেখেছি—গত ঋতুতে।—তোমাদের ক্যাপ্টেনের মাথায় ছিট আছেন নাকি?" শেষ প্রশ্নটা ফিসফিস করে শুধোলেন ফেডাল্লাকে।

ফেডাল্লা ঠোঁটে আঙুল তুলে থামিয়ে দিল ইংরেজ ক্যাপ্টেনকে। লাফ দিয়ে গিয়ে বসল নৌকোয়। কপিকলে দুলতে দুলতে নেমে এলেন ক্যাপ্টেন আহাব—পেছন পানে আর ফিরেও তাকালেন না।

কংকাল

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, ঐ যে ইংরেজ জাহাজটির সঙ্গে এইমাত্র মোলাকাৎ ঘটল, ওর নাম স্যামুয়েল এনডারবি। লণ্ডনের সেই প্রাতঃস্মরণীয় ভদ্রলোকের নামে নাম রাখা হয়েছে জাহাজটির। ইনিই প্রথম কেপহর্ণ পেরিয়ে সাউথ সী

গিয়েছিলেন এবং প্রশান্ত মহাসাগরে স্পার্ম তিমি শিকারের ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন। এঁর প্রতিষ্ঠিত তিমি কোম্পানীর নাম এনডারবি এণ্ড সন্স।

স্পার্ম তিমির কংকাল প্রসঙ্গে এবার আসা যাক।

তিমির কংকালকে মন্দিরে রাখার রেওয়াজ পৃথিবীর অনেক দেশে আছে। সিরীয়া থেকে এমন একটি তিমি-বিগ্রহ আস্ত তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রোমে।

আর্সাসাইডস অঞ্চলে ছোট্ট একটি ভূখণ্ডের অধিপতি একবার আমাকে খুব আদরযত্ন করে এমনি একটা তিমি-দেবতা দেখিয়েছিল। তিমিটা ঝড়ের ধাক্কায় ডাঙায় এসে পড়েছিল এবং নারকেলগাছে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। রাজা তার কংকাল এনে সাজিয়ে রাখল মন্দিরে। শুধু তাই নয়, কশেরুকায় কারুকাজ করা হল, সাংকেতিক হরফে ঐ দেশের ইতিহাস খোদাই করা হল পাঁজরে এবং করোটির মধ্যে সদাপ্রজ্জ্বলিত এমন একটা সুগন্ধ শিখা জ্বালিয়ে দেওয়া হল যে স্পাউট দিয়ে বেরিয়ে এল ভলকে ভলকে ধোঁয়া। ঝুলন্ত চোয়ালটা নড়তে লাগল দর্শকের মাথার ওপর আপনা থেকেই।

সে এক দৃশ্য! গায়ের রোঁয়া খাড়া হয়ে যায়! কি কৌশলে যে শিখাটি সদা প্রজ্জ্বলিত রাখা হয়েছিল এবং ধোঁয়া বার করা হয়েছিল কংকাল-করোটির মাথা দিয়ে, সে রহস্য কিন্তু আজও বুঝে উঠিনি।

স্পার্ম তিমির সাইজ লম্বায় পঁচাশি থেকে নব্বই ফুট পর্যন্ত হয়। একশ ফুট লম্বা তিমিও মারা হয়েছে বলে জানি। পাঁজরের সংখ্যা প্রতি পাশে দশ। পঞ্চম পঞ্জরটিই সবচেয়ে লম্বা হয়—আট ফুট।

শুধু শিরদাঁড়াটাই লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট! কশেরুকাগুলি ক্রমশঃ ছোট হতে হতে দু ইঞ্চি চওড়া মার্বেল গুলির আকার নিয়েছে—মাঝের কশেরুকাটিই সবচেয়ে বড়—চওড়ায় তিন ফুট, খাড়াই চার ফুট!

### জীবাশ্ম

তিমির জীবাশ্ম পৃথিবীর নানাজায়গায় পাওয়া গিয়েছে—সবচেয়ে বিস্ময়কর যেটি, সেটি পাওয়া গিয়েছিল ১৮৪২ সালে আলবামায়। বিশাল একটি কংকাল —প্রাগৈতিহাসিক দানব—এখন যার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। আলবামা ডক্টররা কংকাল দেখে বললেন, প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ। নামকরণ হয়ে গেল—ব্যাসিলসরাস। কিন্তু ইংরেজ পণ্ডিতরা হাড়ের চেহারা দেখে চিনতে

পারলেন। বললেন—সরীসৃপ নয়—তিমি—এমন একটা প্রজাতির তিমি যা লোপ পেয়েছে সমুদ্রবক্ষ থেকে।

পুরাকালের সেই দৃশ্যটা কল্পনা করুন। ডাঙার ছিটেফোঁটাও যখন ছিল না, যখন বরফ ভাসত নিরক্ষীয় অঞ্চলে, যখন ২৫০০০ মাইল ব্যাপী পৃথিবী পরিধির ওপর থৈ থৈ করত শুধু সমুদ্র। তখন এই বিশাল ভূগোলক তিমিদেরই অধীনে ছিল।

## তিমিরা কি লোপ পাবে?

সম্ভব নয়। শ্যামদেশের রাজা চার হাজার হাতী শিকার করে ফেলেছিলেন জঙ্গল থেকে—হাতী কি সেখানে লোপ পেয়েছে? চার বছরে চল্লিশ হাজার মোষ মেরেও আমেরিকার জঙ্গলে মোষ ফুরোয় না—একটা তিমি-জাহাজ চার বছরে মারে মাত্র চল্লিশটা তিমি!

ফি-বছরে শুধু আমেরিকার তিমিজাহাজগুলোই ১৩০০০ তিমি মারছে—কিন্তু তিমিদের বয়স কত জানেন? একশ কি তারও বেশী। একপুরুষেই একটা তিমি কত নাতিপুতি দেখে যাচ্ছে? মানুষ যেমন তাদের মারছে, তারাও তেমনি বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচতে শিখছে। দলবদ্ধ হয়ে বাচ্চাদের আগলাতে জেনেছে—প্রয়োজন হলে বরফ অঞ্চলে চলে গেলে মানুষ কি আর তাদের নাগাল পাবে? কত অযুত বছর তারা বেঁচে আছে। নোয়ার নৌকোয় ধার ধারেনি—প্লাবনকে পরোয়া করেনি। কত হিমযুগ তাদের ওপর দিয়ে চলে গেছে—কত প্রাগৈতিহাসিক দানব লোপ পেয়েছে—পায়নি শুধু তিমি। আবার আসুক প্লাবন—তারা টিঁকে থাকবে। মানুষও কম মরছে না—তবুও মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে কেন? সে তুলনায় যে বিশাল জলধি তিমিদের বিচরণ ক্ষেত্র—তার সর্বত্র হানা দেওয়া কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

তিমিরা তাই থাকবে এবং সংখ্যায় বাড়বে।

## আহাবের পা

আহাব তেড়েমেড়ে ইংরেজ জাহাজ থেকে নৌকোয় নামতে গিয়ে হাড়ের পা-টি জখম করে ফেলেছিলেন। জাহাজে উঠে কিছুক্ষণ খটাখট শব্দে পায়চারী করার পর দেখলেন পায়ের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। চিড় খেয়েছে বিশ্রী ভাবে। এই পায়ের গুঁতোতেই তিনি ডাঙায় একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে

গিয়েছিলেন। হাড়ের পা সরে গিয়ে তলপেটে ঢুকে গিয়েছিল। সেই কারণেই শয্যাশায়ী ছিলেন পিকুঅড রওনা হওয়ার আগে এবং পরে।

আবার সেই বিপত্তির আশংকায় ঝটিতি নতুন পা-য়ের বন্দোবস্ত করলেন আহাব। ছুতোরকে ডেকে বললেন স্পার্ম তিমির হাড় দিয়েই সেই রাতেই তৈরী করতে নতুন পা। ঢালাই লোহার কলকব্জা খোল থেকে তুলে এনে দরকার মত জিনিসপত্র পর্যন্ত তৈরী করে নেওয়ার হুকুম দিয়ে দিলেন কামারকে।

## আহাব বনাম স্টারবাক

তিমিজাহাজের খোল থেকে সপ্তাহে একবার পাম্প করে জল টেনে তুলতে হয়। জলের চেহারা দেখে ধরা যায়, পিপেভর্তি তেল চুঁইয়ে পড়ছে কিনা, পিপেতে ফুটো হয়েছে কিনা, অথবা খোলের মধ্যে চোরা গর্ত দেখা দিয়েছে কিনা।

পরের দিন সকালে পিকুঅডের পাম্প চালু হতেই টনক নড়ল স্টারবাকের। জলের চেহারা খারাপ—প্রচুর তেল মিশে রয়েছে। নিশ্চয় কোনো পিপেতে ফুটো হয়েছে।

পিকুঅড তখন চলেছে ফরমোসা আর বাশী দ্বীপপুঞ্জের দিকে—চীনের জল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়ার পথ সেইখানেই। স্টারবাক তাই আহাবের কেবিনে ঢুকে দেখলেন, তিনি জাপান দ্বীপপুঞ্জের চার্ট খুলে ঝুঁকে রয়েছেন টেবিলের ওপর—নতুন হাড়ের পা রেখেছেন টেবিলের ফুটোয়।

পেছনে আওয়াজ শুনে মুখ না ফিরিয়েই বললেন—"কে ? বেরোও ! ডেকে যাও !"

"ক্যাপ্টেন আহাব, ভুল করছেন ; আমি স্টারবাক। খোলের মধ্যে তেল পড়ছে পিপে থেকে। এখুনি বার্টন তুলতে হবে।"

"বার্টন তুলবে ? জাপান এসে গেল বলে—এখন তেলের পিপে দেখবার সময় ?"

"না করলে একদিনে যত তেল নষ্ট হবে সারা বছরেও ঘাটতি পূরণ করতে পারব না। বিশ হাজার মাইল পথ এসেছি লাভ করতেই তো।"

"যদি আদৌ লাভ হয়।"

"আমি খোলের মধ্যে তেলের কথা বলছিলাম, স্যার।"

"আমি কিন্তু সেকথা বলছি না, ভাবছিও না। বেরোও ! যাও ডেকে !

পড়ুক তেল! ফুটো হয়েছে? আমার নিজের মধ্যেই তো কত ফুটো! ফুটো! ফুটো! ফুটো! আমার নিজের ফুটো বন্ধ করার সময় পর্যন্ত নেই, তুমি যাচ্ছো পিপের ফুটো বন্ধ করতে। যাও! ডেকে যাও!"

"মালিকরা কিন্তু রেগে যাবেন।"

"রাগুক। নানটাকেটের তীরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাক। আহাব পরোয়া করে না! মালিক, মালিক! কিপটে মালিকদের কথা কক্‌খনো আমার সামনে বলবে না! মালিক কে? যে হুকুমদার, সেই মালিক। এ জাহাজের হুকুমদার আমি।—যাও ডেকে!"

মুখ লাল হয়ে গেল স্টারবাকের। আরও এক পা এগিয়ে এলেন কেবিনের মধ্যে। বললেন সংযত গলায়—"আপনার বয়স যদি আরো একটু কমিয়ে আনা যেত, আরো ভাল একজন ক্যাপ্টেন আহাব পেতাম।"

"কী! আমার সমালোচনা! সাহস তো কম নয়! বেরোও!"

"না। ক্যাপ্টেন আহাব, আমাকে বুঝতে চেষ্টা করুন!"

তাক থেকে বারুদভরা একটা গাদা বন্দুক নামিয়ে নিয়ে স্টারবাকের দিকে টিপ করে বজ্রগর্জন করলেন আহাব—"পিকুঅডের মালিক একজনই—আমি! যাও ডেকে!"

ধ্বক করে দুচোখ জ্বলে উঠল স্টারবাকের। কিন্তু অসীম সংযম তাঁর। আস্তে আস্তে পেছিয়ে এলেন দরজার দিকে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলে গেলেন যাওয়ার আগে—"স্টারবাক অপমানিত হয়নি—স্টারবাক আপনার ক্ষতি করবে না। কিন্তু হুঁশিয়ার—আহাবই আহাবের সর্বনাশ করবে! নিজেকে সামলান!"

বন্দুক হাতে শূন্য ঘরে দাঁড়িয়ে রইলেন আহাব। কুঞ্চিত ললাটে বললেন নিজের মনে—"কি সাহস দেখেছো! কিন্তু কি বিনয়! মুখের ওপর কথা বলে গেল—কিন্তু অবাধ্য হল না! কিন্তু শেষ কথাটা কি বলল? আহাবই আহাবের সর্বনাশ করবে! কথাটার মানে তো খুব সোজা নয়!"

অন্যমনস্কভাবে বন্দুক রেখে দিলেন তাকে, কিছুক্ষণ খটখট করে পায়চারী করলেন ঘরময়; ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ললাট কুঞ্চন।

বেরিয়ে এলেন ডেকে। স্টারবাকের কানে কানে বললেন—"ছোকরা, তুমি ছেলে ভাল!" বলেই হাঁক পাড়লেন চড়া গলায়—"হেই! বার্টন তোলো নীচ থেকে। দ্যাখো কোথায় পিপে ফুটো হয়েছে!"

জাহাজের খোল থেকে তেলভর্তি পিপেগুলো বার করে দেখা গেল ফুটো নেই। তবে তেল ভাসছে কেন জলে?

তখন হুকুম হল, তোলো খোলের যাবতীয় জিনিস ডেকের ওপর। দেখো গোলমালটা কোথায়। তাই দানবিক ছুঁচোদের অন্ধকারের ডেরা থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আসা হল ডেকের আলোয়, বাক্সভর্তি রুটি, মাংস, লোহা, বোতল-বোতল জল—সমস্ত তুলে আনা হল বাইরে। খোলের এমন জায়গায় ঢুকতে হল যেখানে জাহাজ তৈরীর পর এই পঞ্চাশ বছরেও বোধহয় কেউ যায়নি। স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর।

ডেক ভরে গেল খোলের জিনিসপত্রে। বিপজ্জনকভাবে টলমল করতে লাগল মাথাভারী পিকুঅড। ওপর দিকে যত ভার জমা হয়েছে—তলা হাল্কা হয়ে গিয়েছে। এ সময়ে যদি তুফান উঠত দরিয়ায়, নির্ঘাৎ ডুবে যেত পিকুঅড।

খোলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একনাগাড়ে অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে জ্বর হল কুঙ্গকোয়েগের। মারাত্মক জ্বর। কিছুতেই ছাড়ল না। শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেল সে। কংকালসার চেহারাটায় প্রাণটা কেবল আটকে রইল। দিবারাত্র হ্যামকে শুয়ে থাকত—ওঠবার ক্ষমতাও ছিল না।

এই সময়ে কুঙ্গকোয়েগ বললে, মৃত্যুর পর তার দেহ কফিনে শুইয়ে ক্যানোতে চাপিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে হবে।

মুমূর্ষুর শেষ ইচ্ছা অনুসারে এল ছুতোর মিস্ত্রী। মাপকাঠি দিয়ে মেপে নিয়ে গেল কুঙ্গকোয়েগ লম্বায় কতখানি। তারপর কাঠ দিয়ে কফিন বানিয়ে মাথায় করে ডেকে এনে বললে—"এখুনি দরকার হবে তো?"

শুনে জাহাজশুদ্ধ লোক তাকে এই মারে কি সেই মারে! চেঁচামেচি কানে গেল কুঙ্গকোয়েগের। ক্ষীণকণ্ঠে বললে—নিয়ে আসা হোক কফিন তার সামনে।

এল কফিন। হ্যামক থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখল কুঙ্গকোয়েগ। তারপর বলল তাকে ধরাধরি করে কফিনে শুইয়ে দিতে।

কফিনে শোয়ার পর থলি থেকে দারুদেবতা য়োজো-কে এনে দিতে হল তার হাতে। বুকের ওপর য়োজো-কে রেখে চোখ বুঁজিয়ে শুয়ে রইল কুঙ্গকোয়েগ।

তারপর বললে ক্ষীণকণ্ঠে—"হ্যাচ বন্ধ করো।"

অর্থাৎ কফিনের ডালা টেনে দাও। তাই দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে কুঈকোয়েগ বললে—"কফিন ভাল হয়েছে।"

কিন্তু কি আশ্চর্য! এই ঘটনার পরেই জ্বর ছেড়ে গেল ওকে। দ্রুত সেরে উঠতে লাগল দেহে মনে। দিবারাত্র বসে থাকত জানলার সামনে, কিন্তু খেত রাক্ষসের মত।

তারপর একদিন আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়ে খপ করে তুলে নিল হার্পুন—এক লাফে নৌকোর সামনে গিয়ে ঘোষণা করল—শরীর মজবুত; আবার শিকারে বেরোতে আপত্তি নেই।

কফিনটাকে কিন্তু কাছে রেখে দিল কুঈকোয়েগ। থলি থেকে জিনিসপত্র বার করে সযত্নে সাজিয়ে রাখল ভেতরে। কফিনটাই হল তার সমুদ্র-সিন্দুক। অতি যত্নে কাঠ খুদে দেহের উল্কীগুলো এঁকে নিল কফিনের গায়ে। উল্কীগুলোয় নাকি সাংকেতিক হরফে লেখা আছে স্বর্গ মর্তের বিচিত্র রহস্য। তার জন্ম যে দ্বীপে, সেখানকার এক মহাপুরুষের আবিষ্কার এই উল্কী।

কিন্তু কুঈকোয়েগ মরল না কেন?—এ প্রশ্নের জবাবে সে বলত, তার ইচ্ছে হল না বলে। কফিনে শুয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ডাঙায় এখনো একটা কাজ বাকী।

সেকী! অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল সঙ্গীরা—স্বেচ্ছায় মৃত্যু সম্ভব নাকি?

নিশ্চয় সম্ভব, জোর দিয়ে বলেছিল কুঈকোয়েগ। "আমি মরতে না চাইলে আমাকে মারবার ক্ষমতা কোনো রোগের নেই—শুধু তিমি, ঝড় আর প্রকৃতি ছাড়া!"

## প্রশান্ত

বালী দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌছোলো পিকুঅড। আনন্দে অধীর হলাম আমি। বহুদিনের স্বপ্ন সফল হল, হাজার হাজার মাইল ব্যাপী সুনীল প্রশান্ত জলরাশির পানে তাকিয়ে রোমাঞ্চ অনুভব করলাম সর্ব অঙ্গে।

প্রশান্তর যেন একটা নিজস্ব আত্মা আছে। যুগ যুগ ধরে কত রহস্যই না দানা বেঁধেছে এই প্রশান্তকে ঘিরে। সসাগরা ধরিত্রীর মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত প্রশান্তর দুই বাহু হল আটলান্টিক আর ভারত মহাসাগর। একদিকে নবীন ক্যালিফোর্নিয়ার শহর, আরেকদিকে প্রবীণ এশিয়া ভূখণ্ড, জাপান, অজ্ঞাত দ্বীপপুঞ্জ।

আহাবের চোখে কিন্তু কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। ডেকের ধারে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইলেন লৌহমূর্তির মত। যেদিকে বালী দ্বীপপুঞ্জের সৌরভ, সেদিকের নাক টিপে ধরে অন্য নাসারন্ধ্রে লবণাক্ত আঘ্রাণ নিলেন বুক ভরে—এ সেই সমুদ্র যেখানে তার পরম শত্রু সাদা তিমির সঙ্গে মরণ-যুদ্ধ আসন্ন।

কুঞ্চিত ললাটে সরে গেলেন কেবিনের অন্তরালে—লৌহকঠিন ঠোঁট লোহার পর্দার মত গোপন করে রাখল তাঁর আত্যন্তিক ঘৃণা।

কিন্তু সেই রাতেই ঘুমন্ত ক্যাপ্টেনের আকুল চীৎকারে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল জাহাজের প্রতিটি মানুষ।

—"হুঁশিয়ার! জমাট রক্ত-ফোয়ারা ছাড়ছে সাদা তিমি!"

## কামার

ইচ্ছেমত যেখানে খুশী বয়ে নিয়ে যাওয়ার মত একটা ছোট্ট কামারশালা জাহাজের খোলে ছিল। আহাবের পা তৈরীর সময়ে তোলা হয়েছিল ডেকে। আর নামানো হয়নি—সামনেই লড়াই আসছে বলে।

মাস্তুলের গায়ে বাঁধা ছিল কামারশালাটা। বুড়ো কামার পার্থ ফাইফরমাশ খাটত জাহাজশুদ্ধ লোকের, কারও হাপুর্ন ছুঁচোলো করতে হবে, কারও নৌকোয় বাহারি লোহা লাগাতে হবে, কারও দাঁড়ে পেরেক ঠুকতে হবে—সব এই বুড়ো কামারের কাজ। সদাপ্রসন্ন, মৌন এবং কখনো অসহিষ্ণু নয়, বিরক্ত নয়।

কামারের কাজ ছাড়াও আরো অনেক বিদ্যে জানা আছে বুড়ো পার্থর। কুঈকোয়েগের দাঁড় রঙীন করতে হবে? এল পার্থ রঙের সরঞ্জাম নিয়ে। অমুকের দাঁতে ব্যথা হয়েছে? পার্থ আছে দাঁতের ডাক্তারি করতে। রকমারি ফাইফরমাশ খাটতে তার জুড়ি নেই। মানুষের সেবায় উৎসর্গ তার জীবন।

তার কারণও আছে। পার্থর একদিন সব ছিল। কন্যাসম সুকুমারী বধূ, তিনটে ফুটফুটে বাচ্চা। স্বচ্ছল সংসার, বাড়ী ঘর দোর—সব।

কিন্তু একদিন সব গেল। সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। বউ ছেলেমেয়ে গেল গোরস্থানে—টাকাকড়ি চোরের থলিতে। নিঃস্ব পার্থ এল তিমিজাহাজে।

এই পার্থকেই অসময়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আহাব—হাড়ের পা তৈরীর জন্যে। আবার এসে দাঁড়ালেন প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ আসতেই।

পার্থ তখন লোহা তাতাচ্ছিল হাপর চালিয়ে—গরম লোহা নেহাইতে ফেলে দমাদম হাতুড়ি মারতেই লোহার ফুলকি ছিটকে গেল আহাবের দিকে।

খেঁকিয়ে উঠলেন আহাব—"আরে গেল যা। ফুলকিগুলো দেখতে তো স্বর্গের পাখীর মত—কিন্তু পুড়ে মরবে যে!"

হাতুড়ি থামিয়ে পার্থ বলল—"না, ক্যাপ্টেন, আমি পুড়ব না। অনেক পুড়েছি—ফুলকিতে কি হবে?"

"বটে! বটে! অনেক সয়েছো—এখনো পাগল হওনি! কিন্তু কেন হওনি পার্থ?—কি হচ্ছে ওটা?"

"বল্লমের ডগা মেরামত করছি—তুবড়ে গিয়েছিল, জোড়ার দাগ ছিল—সমান করে দিচ্ছি।"

"তাই নাকি? সেলাইয়ের দাগ, জোড়ার দাগ মিলিয়ে দিতে পারো?"

"চেষ্টা করি ক্যাপ্টেন। সব সময়ে পারি না।"

"পারবে, আমার এই সেলাইয়ের দাগটা মিলিয়ে দিতে পারবে?" নিজের গ্রন্থিল ললাটে হাত বুলিয়ে তীব্র কণ্ঠে বললেন আহাব।

"আজ্ঞে না—ভাঙা কপালকে জোড়া দিতে পারি না। ঐটা বাদে সব পারি।"

"জানি…জানি…এ জায়গার জোড়ার দাগ কখনো মিলিয়ে যায় না।" বলতে বলতে একটা চামড়ার ব্যাগ ঝনাৎ করে ফেলে দিলেন সামনে—"পার্থ, আমাকে একটা হার্পুন বানিয়ে দাও—এই লোহা দিয়ে।"

"কিসের লোহা?" ব্যাগটা উপুড় করতে করতে বলল পার্থ।

"সবচেয়ে দৌড়বাজ ঘোড়ার পায়ের নাল। অনেক আছে—অনেকদিন ধরে জড়ো করেছি। পারবে না এদের গালিয়ে হার্পুন বানাতে?"

"পারব, ক্যাপ্টেন। এর চেয়ে ভালো লোহা আর হয় না।"

"বারোটা লোহার কাঠি তৈরী করো আগে।"

হুকুম মত লোহার কাঠি তৈরী হল বারোটা। প্রত্যেকটা জুড়ে হাতে নিয়ে তৌল করলেন ক্যাপ্টেন। দ্বাদশ কাঠিটা নতুন করে করালেন।

তারপর বললেন—"এবার বারোটা কাঠি জুড়তে হবে। আমি জুড়ব।"

পার্থর হাত থেকে হাতুড়ি কেড়ে নিলেন আহাব—গনগনে রাঙা কাঠিগুলো ঠুকে ঠুকে পরস্পর জুড়ে দিয়ে তৈরী করলেন হার্পুনের লোহার সকেট।

ঠিক এই সময়ে ফেডাল্লাকে দেখা গেল আহাবের সামনে। পলকহীন চোখে আগুনের পানে চেয়ে নীরব অভিশাপ বর্ষণ করে গেল অগ্নিতপ্ত লৌহ-সকেটের মধ্যে।

আহাব চোখ তুলে তাকাতেই সরে গেল মূর্তিমান শয়তান।

টকটকে রাঙা সকেটটা জলে ডুবিয়ে ধরল পার্থ—অমনি হুস করে জল ছিটকে লাগল আহাবের মুখে।

"পার্থ, তুমি কি আমার মুখে উল্কী আঁকতে চাও?"

"আজ্ঞে না।—কিন্তু ক্যাপ্টেন, এ হার্পুন কি সাদা তিমির জন্যে?"

"সাদা শয়তানের জন্যে!—এবার ফলা তৈরী করতে হবে। এই নাও আমার ক্ষুর- সেরা ইস্পাত। ক্ষুরের মতই ধারালো ফলা বানিয়ে দাও!"

থমকে গেল পার্থ—"কিন্তু ক্যাপ্টেন—"

"শুরু করো!—ও ক্ষুরের আর দরকার হবে না। দাড়িও কামাবো না, ভগবানের নামও নেব না—যদ্দিন না—কি হল? চালাও হাত!"

তীরের ফলা যেভাবে হয়, সেইভাবেই পিটে পিটে তৈরী হল হার্পুনের ফলা। গরম লোহাকে জলে ডুবিয়ে ট্যাম্পার করতে গেল পার্থ, অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন আহাব—"না, না! জল দিয়ে নয়—রক্ত দিয়ে করতে হবে।"

পাশেই কালো পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল তিন হার্পুনার। যেন নাভিমূল থেকে গর্জে উঠলেন আহাব—"ট্যাশটেগো, কুঈকোয়েগ, ড্যাগ্‌গু! পৌত্তলিকের দল! দিবি তোদের রক্ত? ফলা ভিজোতে যেটুকু রক্ত দরকার দিতে পারবি না?"

নীরবে সায় দিল তিন পৌত্তলিক। চামড়া চিড়ে বার করে দিল টাটকা রক্ত—স্নিগ্ধ হল রক্তস্নাত লৌহফলক।

"চমৎকার। এবার লাগাও ডাণ্ডা!"

সবচেয়ে মজবুত কাঠের ডাণ্ডা ঢুকিয়ে দেওয়া হল সকেটে। নতুন এক-বাণ্ডিল লাইন খোলা হল। আগে টেনেটুনে আহাব দেখে নিলেন কোথাও ছেঁড়া আছে কিনা। তারপর ফেঁসোগুলো আলাদা করে জালবোনার মত করে হার্পুনের সকেট থেকে আরম্ভ করে কাঠের হাতল পর্যন্ত মুড়ে দিলেন। লোহা, কাঠ, দড়ি—অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে এক হয়ে গেল।

যেন আচ্ছন্নের ঘোরে অভিনব এই অস্ত্র নিয়ে চলে গেলেন আহাব—তাঁর হাড়ের পায়ের খটখটানি মিলিয়ে গেল কেবিনের মধ্যে।

**ব্যাচেলর**

হার্পুন তৈরীর কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা।

এই কটি সপ্তাহ কিন্তু তিমি অন্বেষণে কেটেছে। একটানা দশ বিশ ঘণ্টা জলে থেকেছি—নৌকো বেয়ে বেয়ে হাত ব্যথা হয়ে গেছে!

ব্যাচেলরকে দেখলাম এই সময়ে। নানটাকেটের জাহাজ ব্যাচেলর। জাহাজভর্তি স্পার্ম তেল নিয়ে ফিরছে দেশে। কপাল সুপ্রসন্ন—অন্য জাহাজের বরাতে একটি তিমিও জোটেনি—কিন্তু ব্যাচেলরের খোলে আর তেল রাখবার জায়গা নেই। দূর থেকেই দেখলাম, একটা সন্ত নিহত তিমির মাথা ঝুলছে ডেকে। দুপাশে পিপেভর্তি তেল। পিপে গাদা করা রয়েছে ডেকের এখানে সেখানে। এগুলো ধার করা হয়েছে অন্যান্য জাহাজ থেকে। ব্যাচেলরের সব পিপে ফুরিয়ে গেছে, বাক্স ভেঙে নতুন পিপে তৈরী হয়েছে, মাংস ফেলে দিয়ে আরো দামী তেল দিয়ে তা ভরা হয়েছে। রান্নাঘরের হাঁড়ি, কেটলী পর্যন্ত নাকি তেল ভর্তি—বাকী আছে শুধু ক্যাপ্টেনের পাৎলুনের পকেটদুটো —যার মধ্যে দুহাত ভরে ভদ্রলোক এখন প্রসন্ন বদনে দাঁড়িয়ে আছেন ডেকের ওপর।

কাছাকাছি আসতেই একটা বন্য হট্টগোল শোনা গেল। যেন অসভ্য জংলীদের ঢাক বাজছে, সেইসঙ্গে দুমদাম নাচ হচ্ছে, গলা ফাটিয়ে গান হচ্ছে। ব্যাপার কী?

আরো কাছে আসতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। ডেকের পাটাতনের ঢাকনা সরানো রয়েছে, বিশাল ট্রাই-পট অর্থাৎ উনুনের মাথায় তিমির কালো চামড়া বাঁধা হয়েছে টান টান করে। কয়েকজন প্রাণপণে ঢাক পিটছে তার ওপর; গোল হয়ে তাণ্ডব নাচ নাচছে মেট এবং হার্পুনাররা। সঙ্গে রয়েছে অলিভ বর্ণ কয়েকটি পলিনেসিয়ান তরুণী—দ্বীপ থেকে পালিয়ে এসেছে এদের সঙ্গে। মাস্তল বেয়ে উঠে তিনটে মিশমিশে নিগ্রো ধনুক কাঁধে নিয়ে তদারক করছে। জগঝম্প ছড়িয়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের মাথায় মাথায় বহুদূরে।

কোয়ার্টার ডেকে পাথর মুখে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন আহাব—কপালে ভ্রূকুটি। এ-জাহাজে কঠোর কর্তব্য—উল্লাসের লেশ নেই কোথাও; ও-জাহাজে কর্তব্য শেষ—উল্লাস তাই মেঘচুম্বী।

পাশাপাশি আসতেই ব্যাচেলরের ফুর্তিবাজ ক্যাপ্টেন হেঁকে উঠলেন গেলাস আর বোতল তুলে—"চলে আসুন মশায়, এক গেলাস খেয়ে যান!"

দাঁত কিড়মিড় করে জবাব দিলেন আহাব—"সাদা তিমি দেখেছেন?"

"না।—নাম শুনেছি বটে। চলে আসুন, চলে আসুন!"

আহাব আর জবাব দিলেন না। পিকুঅডের সবাই চেয়ে রইল ব্যাচেলরের দিকে—ব্যাচেলরের কেউ ফিরেও তাকাল না। ফুর্তি নিয়ে উন্মত্ত সবাই।

পাশ দিয়ে দুদিকে সরে গেল দুটি জাহাজ। একটিতে অতীত সাফল্যের

আনন্দ—আর একটিতে আসন্ন বিপদের উৎকণ্ঠা। একদিকে উল্লাসের মুখরতা—আরেকদিকে থমথমে নীরবতা।

ব্যাচেলর মিলিয়ে যেতেই পকেট থেকে একটা শিশি বার করলেন আহাব। শিশিভর্তি বালির দিকে চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে।

বালিটা নানটাকেটের বেলাভূমির।

## মুমূর্ষু তিমি

পরের দিন চারটে তিমি মারলাম আমরা। তখন সূর্য অস্তাচলে। তিমিগুলো সূর্যের পানে মুখ ফিরিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

এ দৃশ্য আমি আগেই দেখেছি। মরবার সময়ে তিমি মুখ ফিরিয়ে রাখে লাল সূর্যের পানে।

আহাব শান্ত নৌকোয় বসে সেই দৃশ্য দেখলেন। এখন তিনি অনেক স্থির। বিড় বিড় করে বললেন—"আগুনকে তোরাও পুজো করিস? মরণ-কালেও সূর্যকে স্মরণ করিস?"

## তিমি পাহারা

চারটে তিমি মরেছিল জাহাজের চারদিকে। তিনটিকে রাতের মধ্যেই টেনে আনা গেল—চতুর্থটির কাছে পৌছোনোও গেল না। এইটিতে ছিলেন আহাব এবং তাঁর মালয় সাগরেদরা। সারারাত তিমি-পাহারায় রইল সেই নৌকো।

রাত গভীর হল। কাঠের খুঁটি ঢুকিয়ে দেওয়া হল স্পাউটের ফুটোয়। খাড়া খুঁটির মাথায় বেঁধে দেওয়া হল লণ্ঠন। লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত হল তিমিপৃষ্ঠ এবং বলয়াকারে সমুদ্রপৃষ্ঠ। হাঙররা ছুটে এল হাজারে হাজারে। নরমুণ্ডর সাইজে বড় বড় মাংসর ডেলা খাবলে নিয়ে গেল তিমির গা থেকে।

আহাব ঘুমিয়ে পড়লেন, ঘুমিয়ে পড়ল দাঁড়িরা—জেগে রইল শুধু একজন—ফেডাল্লা। হাঙরদের দিকে চেয়ে রইল অতন্দ্র নয়নে।

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল আহাবের। চোখমেলেই দেখলেন ফেডাল্লাকে। যেন দুনিয়াটা জলে ভেসে গিয়েছে—আর কেউ নেই—দুজন ছাড়া।

"সেই স্বপ্নটা ফের দেখলাম," বললেন আহাব।

"কিন্তু ক্যাপ্টেন, আমি তো বলেছি, আপনার জন্যে কোনো কফিন তৈরী হয়নি—হবে না।"

"তবে?"

"আপনার মৃত্যু হবে পাটের দড়িতে।"

"হা-হা-হা! তার মানে ফাঁসির দড়িতে? আমি অমর...আমি অমর! আমি জলেও মরব না, ডাঙাতেও মরব না! ফাঁসির দড়িতে তো নয়ই!..."

"ক্যাপ্টেন, আরো দুটো ভবিষ্যদ্বাণী শুনে রাখুন। এই যাত্রায় দুটোই আপনি দেখবেন। প্রথমটায় মানুষের হাত নেই। দ্বিতীয়টায় দেখবেন আমেরিকার মাটির কাঠ।—আমি কিন্তু আপনার আগেই যাব— কোনোটাই দেখব না।"

নিশ্চুপ হয়ে গেল দুই মূর্তি। ধীরে ধীরে ফুটল ভোরের আলো। দুপুর নাগাদ তিমিটাকে টেনে আনা হল জাহাজে।

## কোয়াড্র্যাণ্ট

প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি নিধনের সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, ততই অস্থির হয়ে উঠলেন আহাব। বেরিয়ে আসতেন কেবিন থেকে; মাস্তুলের যেখানে সোনার মোহর পেরেক দিয়ে আঁটা, সেইখানে এসে চেয়ে থাকতেন মোহরটার দিকে। কখনো পলকহীন চোখ মেলে ধরতেন সমুদ্রের পানে।

খালাসীদের অস্থিরতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তারাও পর্যায়ক্রমে মোহরের দিকে তাকায়, সমুদ্র দেখে, দড়িদড়া ঠিক রাখে এবং পুবের দিকে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে হুকুম শোনার প্রতীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত গোনে। অবশেষে হুকুম দিলেন আহাব; তখন সূর্য মাথার ওপর। উঁচুতে তোলা নিজস্ব বোটে বসেছিলেন উনি। প্রতিদিনের মত সেদিনও সূর্য দেখে অক্ষাংশ নির্ণয় করছিলেন।

জাপান সমুদ্রে দিনগুলো বড় ঝকঝকে—রৌদ্রোজ্জ্বল। সূর্য এখানে নিমেষ ফেলতেও জানে না—দেখে মনে হয়, সীমাহীন এই সমুদ্র আসলে একটা বিশাল আতস কাঁচ—রোদ্দুর ফোকাস করে সৃষ্টি করছে অগ্নিগোলক ঐ সূর্যকে।

আহাবের কোয়াড্র্যাণ্টে কিন্তু রঙীন কাঁচও আছে। কোয়াড্র্যাণ্ট হল কোণ মাপার যন্ত্র। সৌর আগুনকে দেখার জন্যে রঙীন কাঁচ চোখে লাগালেন আহাব। যন্ত্রপাতিগুলোও দেখতে জ্যোতির্বিদের যন্ত্রপাতির মত। দুলন্ত নৌকোয় বসেই তিনি চোখে যন্ত্র লাগিয়ে চেয়ে রইলেন সূর্যের পানে—কখন সরে এসে দাঁড়াবে মধ্যমায় এই প্রতীক্ষায়।

পায়ের কাছে ডেকের ওপর নতজানু হয়ে বসে ফেডাল্লা। ওরও চোখ সূর্যের দিকে। চোখের পাতা অর্ধমুদ্রিত, মুখভাব দুর্বোধ্য—উত্তেজনার লেশ মাত্র নেই।

মাঝে মাঝে মাপ নিচ্ছেন আহাব, হাড়ের সাদা পায়ে পেন্সিল দিয়ে টুকে রাখছেন সেই মুহূর্তে তাঁর অক্ষাংশ কি।

হঠাৎ যেন ফের ঘোর লাগল চোখে—সূর্যের পানে তাকিয়ে সূর্যকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন জড়িত কণ্ঠে—"সূর্য! তুমিই আমার পথ-নির্দেশক। আমি এখন কোথায়—তা বলছ। কিন্তু বলছ না তো কোথায় পৌঁছোবো? বলছ না তো এই মুহূর্তে সে কোথায়? কোথায় মবি ডিক? তোমার চোখ তো সবার ওপর—এই মুহূর্তে তাকেও তুমি দেখছো! আমার চোখ তোমার দিকে—তোমার চোখ তার দিকে!"

উত্তেজিতভাবে নৌকো থেকে নেমে এলেন আহাব। অস্থির চরণে খট-খট শব্দে পায়চারী করতে লাগলেন ডেকের ওপর। জাহাজের সবাই অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল তাঁর পানে।

অকস্মাৎ গলার শির চেঁচিয়ে উঠলেন আহাব—"ঘোরাও পাল!"

মুহূর্তের মধ্যে বিরাট পালের ওপরকার ইয়ার্ড কাঠ বোঁ করে ঘুরে গেল—যেন গোড়ালীর ওপর ঘুরে গেল আস্ত জাহাজটা।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখল তিন মেট।

বিড়বিড় করে বললেন স্টারবাক—"বুড়ো, তোমার ভেতরের আগুনই তোমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।"

## মোমবাতি

প্রকৃতি যেখানে উষ্ণ, সমৃদ্ধ—হিংস্রতম শ্বাপদ সেইখানেই। চিরসবুজ অরণ্যেই বাংলার বাঘের বাসা। যে আকাশ বেশী উজ্জ্বল, সেই আকাশেই সুপ্ত থাকে ভয়ংকরতম বজ্র। জমকালো কিউবা যত টর্নেডো সয়েছে, উত্তরাঞ্চল তা কল্পনাও করতে পারবে না।

জাপান সমুদ্রেও সেই একই নিয়ম। মারাত্মক ঝড় এইখানেই। টাইফুন এ অঞ্চলের আতংক। যে কোনো মুহূর্তে ঘুমন্ত জনপদের ওপর বোমার মত ফেটে পড়তে পারে বুক চাপড়ানোর মত শব্দ করে।

সেইদিনই বিকেলের দিকে পিকুঅডের মাস্তুল থেকে ক্যানভাস গুটিয়ে নেওয়া হল। ন্যাড়া খুঁটির ওপর আছড়ে পড়ুক আগুয়ান টাইফুন।

দেখতে দেখতে অন্ধকারে মুছে গেল সমস্ত আলো। আকাশ আর সমুদ্র বাজের মার খেয়ে যেন বন্যপশুর মত বারংবার গজরাতে লাগল বীভৎস কণ্ঠে। জলে গেল চারিদিক বিদ্যুতের আলোয়—দেখা গেল ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় ছিন্ন পালগুলো উলংগ মাস্তুলের গায়ে সাপটে পত পত করে উড়ছে।

কোয়ার্টার ডেকে দড়ি খামচে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন স্টারবাক। প্রতিটি বিদ্যুৎ চমকের আলোয় এদিকে ওদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করে দেখছেন নতুন কোনো বিপর্যয় ঘটল কিনা। স্টাব আর ফ্লাস্ক লোকজন নিয়ে নৌকো-গুলোকে আরো উঁচু করে তুলে রাখছে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অত উঁচুতে রাখা সত্বেও আচমকা একটা বিশাল ঢেউ চলন্ত পাহাড়ের মত সাগর থেকে উঠে এসে ঢুঁ মারল আহাবের নিজস্ব নৌকোয়—প্রচণ্ড শব্দে নৌকো আছড়ে পড়ল পাশের গলুইতে—চুরমার হয়ে গেল তলদেশ। ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে জল ঝরে পড়ার মত ঢেউয়ের জল ঝরে গেল ফুটো দিয়ে।

চেঁচিয়ে উঠল স্টাব—"মিঃ স্টারবাক! মিঃ স্টারবাক! আমার গলা ছেড়ে গান গাইতে ইচ্ছে যাচ্ছে? ঢেউয়ের কাণ্ডটা দেখলেন? আমাদের কপালটাই খারাপ।"

বলেই তালে লয়ে জমজমাট একটা গান ধরল স্টাব।

হেঁকে উঠলেন স্টারবাক—"অ্যাভাস্ট স্টাব! জাহাজের টানটান দড়ি-গুলো টং-টং করে বাজিয়ে যতখুশী গান গাক টাইফুন—দয়া করে তুমি চুপ করো।"

"মিঃ স্টারবাক। আমি যে পয়লা নম্বরের ভীতু। তাই অত গান গাই। টুঁটি না কাটলে আমার গান থামবে না!"

"স্টাব!" আচমকা স্টাবের কাঁধ খামচে ধরে চীৎকার করে উঠলেন স্টারবাক—"ঝড়টা কোনদিক থেকে আসছে দেখেছো? পুবদিক থেকে। যেদিকে রয়েছে মবি ডিক। দেখেছো এই ঝড় কার নৌকো ভেঙে দিয়ে গেল? আহাবের। ভায়া! প্রাণে বাঁচতে চাও তো, জলে ঝাঁপ দাও!"

"কি বলছেন বুঝছি না।—বাতাসে কি আছে?"

প্রশ্নটা কানে গেল না স্টারবাকের। স্বগতোক্তি করে চললেন আপন মনে—"কেপহর্ণ ঘুরলেই নানটাকেট যাওয়ার শর্টকাট রাস্তা। যে ঝড় আমাদের পিষে ফেলতে চাইছে, সেই ঝড়কেই আমাদের বাড়ী নিয়ে যাওয়ার কাজে লাগাতে পারি। ঝড়ের দিকে মুখ ফেরালে—ধ্বংস! পেছন ফেরালে বাড়ী! কিন্তু বিদ্যুৎ কি বলে?"

ঠিক সেই মুহূর্তে নিঃসীম তমিস্রার মধ্যে থেকে শোনা গেল একটি কণ্ঠস্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে ডজনখানেক বাজ একসঙ্গে ফেটে পড়ল মাথার ওপর।

"কে ওখানে ?"

"বুড়ো বাজ !" অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে এলেন আহাব ; কিন্তু আচমকা তাঁর চলার পথ আলোকিত হয়ে গেল আগুনের আলোয়।

ডাঙার ওপর বাড়ীর মাথায় বিদ্যুৎকাঠি রাখা হয় আকাশের বিদ্যুৎকে মাটির মধ্যে চালান করার জন্যে। জাহাজের মাস্তুলশীর্ষেও বিদ্যুৎকাঠি থাকে বিদ্যুৎকে টেনে নিয়ে জলের মধ্যে চালান করার জন্যে।

কিন্তু লোহার পাত সরাসরি ডেকের ওপর দিয়ে খোলের গা বরাবর টেনে নিয়ে যাওয়া হয় না অনেক রকম বিপদের ভয়ে। খোল জখম হলে সর্বনাশ। তাই শেকলের মত অনেকগুলো ছোট ছোট লোহা পরস্পর সংলগ্ন থাকে বিদ্যুৎকাঠির তলার দিকে। এগুলো জড়ো করা থাকে মাস্তুলের তলায়। ঝড়বিদ্যুতের সময়ে টেনে নিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় জলের মধ্যে।

"রড! রড!" চীৎকার করে উঠলেন স্টারবাক। আকাশের বিদ্যুৎ মাস্তুল বেয়ে নেমে এসেছে বিদ্যুৎকাঠির মধ্যে দিয়ে—জলন্ত মশাল হয়ে জলছে জড়ো করা চেনের প্রান্তভাগে। "ফেলে দাও! জলে ফেলে দাও! চটপট!"

"অ্যাভাস্ট!" বাধা দিলেন আহাব—"থাকুক রড ওখানে—দেখাক আগুনের খেলা! হিমালয় আর অ্যাণ্ডিজের চূড়োয় রড পুঁতে দিয়ে সারা দুনিয়াকে বাঁচাবো—কিন্তু পিকুঅডকে দেখতে দাও বিদ্যুতের খেলা!"

"কর্পোজ্যান্ট! কর্পোজ্যান্ট!" ওপরদিকে আঙুল তুলে সহসা বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন স্টারবাক।

দেখা গেল সেই বিচিত্র দৃশ্য। ঝড় উঠলে সমুদ্র জাহাজে অগ্নিশিখার মত যে বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ—তারই নাম কর্পোজ্যান্ট। পাল খোলে যে আড়কাঠ থেকে, সেই কাঠগুলোয় পাণ্ডুর অগ্নিশিখা নৃত্য করছে। তিনটে মাস্তুলের চূড়ায় আটকানো ত্রিশূলের মত বিদ্যুৎকাঠির শীর্ষেও নাচছে সেই ভৌতিক শিখা; ত্রিশূলের তিনটে সূচ্যগ্র শীর্ষে হঠাৎ আবির্ভূত হয়েছে বিবর্ণ অগ্নি—তিনটে মাস্তুলের ডগায় ছড়িয়ে পড়েছে সেই আগুন—গন্ধকমিশ্রিত বাতাসে আগুন জলছে নীলচে আভায়।—মাস্তুল তো নয়—যেন দেবীমূলে জলছে পাশাপাশি তিনটে আকাশচুম্বী মোমবাতি।

ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকোর ফাঁকে এই সময়ে হাত আটকে গেল স্টাবের। হাত ছাড়াতে গিয়ে ছিটকে পড়ল ডেকের ওপর। সেই অবস্থাতেই চেঁচিয়ে উঠল ষাঁড়ের মত—"দয়া করো! হে করপোজ্যান্ট, দয়া করো আমাদের!"

খালাসীরা কথায় কথায় দিব্বি গালে। সমুদ্র শান্ত থাকলেও ঈশ্বরের নাম নিচ্ছে—অশান্ত হলে তো আর কথাই—ধর্না দিয়ে পড়ে রুদ্রমূর্তি শূন্য দেবতাদের সমীপে।

স্টাবের আর্ত চীৎকারে তাই ভয় ধরে গেল খালাসীদের মনে। অন্তরাত্মা পর্যন্ত শিউরে উঠল তিন তিনটে মাস্তলের ডগায় অগ্নিদেবের লেলিহ নৃত্য দেখে—একী অলৌকিক দৃশ্য! এ কিসের সংকেত! কিসের পথনির্দেশ! ঊর্ধ্বমুখী ট্যাশটেগোর হাঙর-দাঁত ঝকঝকিয়ে উঠল ভুতুড়ে আলোয়—মনে হল কর্পোজ্যান্ট নেমে এসেছে দাঁতের ওপরেও; তালঢ্যাঙা ড্যাগ্গুর লম্বা ছায়া দেখে মনে হল আকারে সে তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে; কুঈকোয়েগের সর্ব অংগের বিচিত্র নীল উল্কী নীল আগুনের মতই প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে ভৌতিক শিখার নীলচে আলোয়।

রো মাঞ্চকর এ-দৃশ্য অচিরেই বিলীন হল কালো অন্ধকারে—মাস্তল শীর্ষের অলৌকিক শিখা মিলিয়ে যেতেই।

অন্ধকারে ধ্বনিত হল স্টাবের বিদ্রুপতীক্ষ্ণ কণ্ঠ—"মিঃ স্টারবাক, শুনছেন তো? মাস্তলের নীচে খোলে তেল ভর্তি পিপে রয়েছে। মাস্তলের গা বেয়ে ঐ তেল উঠে যাবে চূড়োয়—জ্বলবে মোমবাতির মত। স্পার্মাসেটি মোমবাতি!"

স্টারবাকের চোখের সামনে ফের ভেসে উঠল স্টাবের প্রদীপ্ত মুখ—চোখ তুলে দেখলেন, আবার আগুনের আবির্ভাব ঘটেছে মাস্তলের মাথায়—এবার দ্বিগুণ বেগে জ্বলছে বিদ্যুৎ মশাল!

"কর্পোজ্যান্ট আমাদের দয়া করো!" ফের আকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল স্টাব।

মাস্তলের কাছে দাঁড়িয়ে আহাব, তাঁর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে ফেডাল্লা, মাথার কাছে দড়িদড়ায় বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ঝুলছে খালাসীরা। ওদের কাজ এখনো ফুরোয়নি। ভয়ে বিস্ময়ে থমকে গিয়েছে রুদ্র প্রকৃতির প্রলয়রূপ প্রত্যক্ষ করে।

আহাবের চীৎকার শোনা গেল এবার—"ছাখো! সবাই ছাখো—মবি ডিকের ঠিকানা জানাচ্ছে সাদা আগুন! সাদা তিমির হদিশ বলে দিতে এসেছে সাদা আগুন! দাও! দাও···চেনটা আমার হাতে দাও—আমার বুকের রক্তে ছোঁয়া লাগুক ঐ আগুনের!"

এই বলেই বিদ্যুৎ-কাঠি সংলগ্ন চেনের শেষ প্রান্ত শক্ত মুঠোয় ধরলেন আহাব এবং এক পা ফেডাল্লার কাঁধে রেখে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে ডান হাত শূন্যে তুলে ত্রিশূল-অগ্নির তলায় দাঁড়িয়ে রইলেন বুক চিতিয়ে।

শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন নয়, প্রলাপ বকতে শুরু করলেন। জ্বালাময়ী ভাষায় আকাশের আগুনকে আবাহন করলেন, শূন্য শক্তিকে আপন রক্তে মিশে যেতে বললেন, অতীন্দ্রিয় অতি-প্রাকৃত ক্ষমতাকে প্রতিটি অণুপরমাণুতে আহ্বান জানালেন। স্বয়ং পিশাচ যেন আকাশ বাতাস জলের রুদ্র নাচনের সঙ্গে আপন হাহাকার মিশিয়ে অদৃশ্য সহায়দের সাহায্য প্রার্থনা করছে!

আচম্বিতে আহাবের আবাহনের প্রত্যুত্তরেই যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল সমস্ত আকাশ জুড়ে; নটা অগ্নিশিখা দ্বিগুণ তেজে লাফিয়ে উঠল ঝঞ্ঝাকালো মেঘলোক পানে। দুচোখ মুদে ডানহাতখানা বুকের ওপর চেপে ধরলেন আহাব।

শূন্যলোকের অদৃশ্য শক্তিদের উদ্দেশ্যে ফের শুরু করলেন আতীব্র আবাহন। ডাক দিলেন মূক শক্তিদের। বললেন—"কি করবে আমায়? অন্ধ করে দেবে? পারবে না। চেনটাও ফেলব না। আমাকে সংহার করার ক্ষমতা তোমার নেই। খুব জোর ছাই করে ফেলতে পার। তোমার আগুন আমায় করোটি পুড়িয়ে দিচ্ছে। চোখে ব্যথা ধরে যাচ্ছে, মগজ স্থাণু হয়ে যাচ্ছে। ওগো মহান আগুন, লাফ দাও…লাফিয়ে যাও আকাশ পানে… আমাকে নিয়ে যাও তোমার সাথে—পুড়িয়ে মিলিয়ে দাও একসাথে!"

ভীষণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন স্টারবাক—"ক্যাপ্টেন আহাব! আপনার নৌকোর দিকে তাকান!"

আহাবের নিজের হাতে পেটাই সেই রক্তস্নাত হার্পুন শক্ত করে বাঁধা ছিল তাঁর নৌকোয়—ফলাটা ঢাকা ছিল চামড়ার থলির মধ্যে। ঝড়ে উড়ে গেছে আলগা থলি—নীলাভ অগ্নিশিখা শরীরী প্রেতের মত ঠিকরে পড়ছে শাণিত ফলা দিয়ে। যেন নিঃশব্দে জ্বলছে সাপের জিভ। লকলকে আগুনের নিঃশব্দ অট্টহাসি দেখে শিউরে উঠলেন স্টারবাক। আহাবকে জড়িয়ে ধরে বললেন আকুল কণ্ঠে—স্যার! স্যার! স্বয়ং ঈশ্বর আপনার বিপক্ষে! এ যাত্রা অশুভ! চলুন হাওয়ায় গা ভাসিয়ে বাড়ী ফিরে যাই!

স্টারবাকের ভয়ার্ত চীৎকারে নিমেষ মধ্যে আতংক সঞ্চারিত হয়ে গেল প্রতিটি খালাসীর অন্তরে। ছুটোপাটি চেঁচামেচি আরম্ভ হয়ে গেল ডেকে। একসঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল অতগুলি মানুষ—এ চীৎকার বিদ্রোহের সিংহনাদ!

আহাব যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। স্বয়ং পিশাচ যেন ভর করল তাঁর ওপর। নীলাভ শিখাময় চেনটা ঝনাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ডেকে, খপাৎ করে তুলে নিলেন জ্বলন্ত হার্পুন এবং মশালের মত নাড়তে নাড়তে প্রদীপ্ত ডগা

বাড়িয়ে তাড়া করলেন খালাসীদের। পারলে যেন গেঁথে ফেলেন সেই মুহূর্তে।

লোমহর্ষক সেই দৃশ্য দেখে কাঁপতে কাঁপতে কোণঠাসা হয়ে পড়ল ভয় বিহ্বল খালাসীরা।

আহাব বললেন বজ্রকণ্ঠে—"কি প্রতিজ্ঞা করেছিস মনে নেই? সাদা তিমি না মেরে আমাকে ফেলে যাবি কোথায়? তোদের মন প্রাণ দেহ সবকিছু যে বাঁধা পড়েছে আমার কাছে। ভয় করছে? কিসের ভয়! এই ছাখ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছি তোদের ভয়!"

বলেই এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিলেন হার্পুনের আগুন। মহা আতংকে কোণে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল খালাসীরা।

## রাতের পাহারা

আহাব দাঁড়িয়েছিলেন গলুইতে। স্টারবাক কাছে গিয়ে বললেন "পালের কাঠ মেরামত করতে হবে, স্যার। টুকটাক আরো অনেক ভাঙচুর হয়েছে।"

"কিছু করতে হবে না। যেমন চলছে চলুক।

মাঝরাতে টাইফুন কমে এল। স্টারবাক এবং স্টাব টলমলে জাহাজকে খানিকটা সিধে করল তিনখানা নতুন পাল লাগিয়ে। দেখা গেল হাওয়ার গতি ফের ঘুরে গিয়েছে। এখন অনুকূলে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পালের ইয়ার্ড-কাঠ ঘুরিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেনের কেবিনে গেলেন স্টারবাক। গিয়ে দেখলেন, ক্যাপ্টেন ঘুমোচ্ছেন। লণ্ঠনটা জাহাজ দুলুনির ফলে দুলছে। কাঠের তাকে বারুদ ভরা সেই বন্দুকটায় আলো পড়ে ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে।

বন্দুকটা তাক থেকে তুলে নিলেন স্টারবাক। অকস্মাৎ দুর্দমনীয় আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। মনে পড়ল, এই বন্দুক দিয়েই এই সেদিন তাঁকে মারতে গিয়েছিলেন আহাব।

কিন্তু এখন যদি তাঁকে শেষ করে দেওয়া যায়? ঈশ্বর নিশ্চয় তাঁকে ক্ষমা করবেন। তিরিশটি কি তারও বেশী মানুষ প্রাণে বেঁচে যাবে। স্টারবাক আবার দেশে ফিরে গিয়ে কোলে নিতে পারবেন ছেলেকে—দেখতে পাবেন বউকে!

অকস্মাৎ ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠলেন আহাব—"সামাল! মবি ডিক! এই দিলাম তোর কলজে ফুঁড়ে!"

বন্দুকটা তাকে রেখে দিলেন স্টারবাক। ঘুমোচ্ছে বুড়ো—ঘুমোক। কড়ি কাঠের কম্পাশ দেখে নিয়ে বেরিয়ে এসে স্টাবকে বললেন, কি করতে হবে।

## ছুঁচ

ঘনঘন বজ্রপাতের ফলে জাহাজের কম্পাশ বিগড়ে গিয়েছিল। স্টারবাক পর্যন্ত বুঝতে পারেন নি। কম্পাশের কাঁটা উল্টো দিকে মুখ করে রয়েছে এবং বিকল কম্পাশ দেখে পুবের বদলে পশ্চিম দিকে জাহাজ চালিয়েছেন।

ভুলটা ধরলেন আহাব, সকালবেলা ডেকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন পরের দিন। সমুদ্র এখনো শান্ত হয়নি। আকাশে এখনো মেঘের ছুটোছুটি—সূর্য অদৃশ্য। মাঝে মাঝে বেয়নেট রশ্মি মেঘের ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসছে। সমুদ্র যেন গলিত স্বর্ণের কটাহ; আলো আর উত্তাপে ফুটছে।

উজ্জ্বল সূর্যের পানে তাকিয়েই হঠাৎ খেয়াল হল আহাবের জাহাজ পশ্চিম মুখো যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন জাহাজ কোন দিকে যাচ্ছে?

ভড়কে গিয়ে বললে হালধারী—"পুবদিকে।"

"পুবদিকে! সকাল বেলা পুব দিকে গেলে সূর্য পশ্চিমে থাকে?" বলেই দৌড়ে গেলেন কেবিনে। গিয়ে দেখলেন দুটো কম্পাশ পুবদিকেই মুখ করে রয়েছে—অথচ পিকুঅড চলেছে পশ্চিম দিকে।

কাষ্ঠ হেসে বললেন আহাব—"স্টারবাক, বাজ পড়লে এরকম ঘটতে পারে।"

আমতা আমতা করে স্টারবাক বললেন—"কিন্তু স্যার, আমার জীবনে কখনো দেখিনি।"

"সব সময়ে হয় না। কিন্তু যদি হয় জানবে জাহাজের একদম তলায় লুকোনো কম্পাশও বিগড়েছে।—ঠিক আছে। আহাব তাতে ঘাবড়ায় না। আনো একটা হাতুড়ি, একটা ছুঁচ আর একটা বর্শা।"

কানাঘুসো আরম্ভ হয়ে গেল খালাসীদের মধ্যে। ভীড় করে দাঁড়াল সামনে। আহাব সবাইকে শুনিয়ে বললেন—"ভগবান আমার কম্পাশ খারাপ করে দিয়েছেন! তাতে আহাব পরোয়া করে না।—ভগবানকেও টেক্কা মারতে পারে আহাব।"

অতিশয় ধূর্ত ক্যাপ্টেন এই সুযোগে ছুঁচের ম্যাজিক দেখিয়ে হৃদয়জয় করতে চাইলেন ভয়ার্ত খালাসীদের। ওদের প্রাণে ভয় ঢুকেছে—একটু অলৌকিক সুড়সুড়ি দেওয়া দরকার বইকি।

এল বর্শা। হাতুড়ি মেরে ফলাটা ফেলে দিলেন আহাব। একজনকে বললেন ডেক থেকে লোহার ডাণ্ডাটা তুলে ধরে থাকতে। হাতুড়ি দিয়ে ডাণ্ডার ডগা অনেকবার ঘষে, ঠুকে, ভোঁতা ছুঁচটা রাখলেন সেই ডগার ওপর। বার কয়েক হাতুড়ি মারলেন ছুঁচে। তারপর জাদুকরের মত শরীরটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে সুতো আনতে বললেন, সুতো গলিয়ে ছুঁচটা নিয়ে গিয়ে কম্পাশের কার্ডে রেখে দিলেন— তার আগে অবশ্য তুলে নিলেন উল্টো মুখো কাঁটা দুটো।

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ছুঁচটা ঘুরে গেল পূবদিকে।

সভয়ে খালাসীরা দেখল, আহাব অসাধ্য সাধন করেছেন। সূর্য পূবে— ছুঁচও নির্দেশ করছে সেইদিক।

## রাতের কান্না

দক্ষিণ পূব দিকে যেতে যেতে অবশেষে পিকুঅড এসে গেল নিরক্ষীয় তিমি অঞ্চলে। ঠিক যেখান থেকে এই অঞ্চলের শুরু, সেইখানে অনেকগুলি ছোট ছোট ভূখণ্ড জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলে আছে দ্বীপকণার মত, রাতের অন্ধকারে এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে গা ছমছম করে উঠল স্টাবের।

কারা যেন কাঁদতে লাগল ইনিয়ে বিনিয়ে। জাহাজের পাশে পাশে ভেসে চলল অশরীরী কান্না বহুদূর পর্যন্ত। অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা অশ্রু হয়ে যেন ঝরে পড়ল নিশীথ রাতের সেই কান্নার মধ্যে।

আহাব কিছু শুনতে পাননি—ঘুমোচ্ছিলেন। সকাল হতেই স্টাব কানে কানে বলল কান্না কাহিনী। মবি ডিকের আস্তানায় ঢুকতে না ঢুকতেই এই রহস্যজনক কান্না যে অত্যন্ত অমঙ্গল, তাও বলতে ছাড়ল না।

শুনে কাষ্ঠ হেসে বললেন আহাব—"বাপু হে, ওগুলো সীল মাছের কান্না। ঐযে দ্বীপগুলো দেখলে, ঐখানে ওদের বাসা। ওদের কারও বউ মরেছে, কারও বাচ্চা হারিয়েছে। তাই জাহাজ দেখলেই কাঁদতে থাকে; কিন্তু ওদের গলার স্বর এমন অদ্ভুত যে মনে হয় মানুষের বিলাপ। আরও অদ্ভুত ওদের চেহারা। জলের ওপর ভাসতে থাকে কেবল মাথাটা—যা দেখতে মানুষের মাথার মত গোল। চোখ মুখের গড়নও প্রায় সেই রকম। রাত্রে দেখলে তোমাদের মত কুসংস্কারে ভরা লোকেদের রক্ত হিম হয়ে যেত—ঠিক যেন মড়া ভাসছে আর কাঁদছে!"

আহাবের ব্যাখ্যা যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু তবুও অনেকের মনে ধরল না। পরের পর দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। না জানি কপালে কি আছে।

ওদের আশংকাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। এই প্রথম একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটল পিকুঅডে।

ঘটল দিনের বেলা। আচমকা একটা তীক্ষ্ণ আর্ত চীৎকার ভেসে এল আকাশ থেকে—সচমকে চোখ তুলে সবাই দেখলে মাস্তুলের ডগা থেকে একটা মানুষ শূন্যপথে নেমে আসছে।

তারপর চোখ নামিয়ে দেখতে হল সাগরপানে। রাশিরাশি বুদবুদ ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না।

তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে নামিয়ে দেওয়া হল লাইফবয়। একটা ফাঁপা কাঠের বাক্স। চারপাশে লোহার পাত মারা। গলুইয়ের কাছে বারো মাস থাকে। লাইফবয় কিন্তু ভাসতেই লাগল—কোনো হাত উঠে এল না ধরবার জন্যে।

রোদে জলে বাক্সর কাঠ শুকিয়ে যাওয়ার জন্যে ফাঁক দিয়ে জল ঢুকতে লাগল ভেতরে। দেখতে দেখতে জলে ভারী হয়ে নিমজ্জিত খালাসীর পেছনেই রওনা হল লাইফবয়।

এখন আর একটা লাইফবয় পাওয়া যায় কোথায়? ডাক পড়ল ছুতোর মিস্ত্রীর। কিন্তু সেরকম হাল্কা কাঠ কোথায়? সমস্যার সমাধান করল কুঈকোয়েগ।

বলল—"কেন, আমার কফিনটা তো রয়েছে।"

শেষ পর্যন্ত তাই হল। কুঈকোগের কফিন বাক্স তৈরী হল নতুন লাইফবয়।

## পিকুঅড দেখল র‍্যাচেলকে

পরের দিন একটা মস্ত জাহাজের দেখা পাওয়া গেল। নাম র‍্যাচেল। মাস্তুলে, গলুইতে, ডেকে গিজগিজ করছে লোক। পিকুঅড তখন পুরোদমে চলেছে নিজের পথে, কিন্তু র‍্যাচেল সোজা ছুটে এল পিকুঅডের দিকেই। লক্ষণ তো ভাল নয়! নিশ্চয় বিপদে পড়েছে র‍্যাচেল।

কাছাকাছি আসতেই হাঁক দিলেন আহাব—"সাদা তিমি দেখেছেন?"

"দেখেছি। আপনি একটা নৌকো যেতে দেখেছেন?"

এ প্রশ্নের জন্যে তৈরী ছিলেন না আহাব। কিন্তু সাদা তিমির আস্তানায় সাদা তিমিকে দেখা গিয়েছে, এ খবর শুনে চাপা উল্লাসে নিজেই নামতে

যাচ্ছিলেন জাহাজ থেকে—তার আগেই দেখলেন র‍্যাচেল থেকে নৌকো নামাচ্ছেন ক্যাপ্টেন।

পিকুঅডে উঠতেই চিনতে পারলেন আহাব। ক্যাপ্টেন গার্ডিনার। নানটাকেটে থাকেন।

কিন্তু শুভেচ্ছা বিনিময়ের ধার দিয়েও গেলেন না আহাব। শুধোলেন অবরুদ্ধ উত্তেজনায়—"মবি ডিক তো? মারেন নি তো?...মেরে ফেলেননি?"

ক্যাপ্টেন গার্ডিনার সংক্ষেপে যে কাহিনী বললেন, তা শুনলে পাষাণও গলে যায়। গতকাল বিকেলের দিকে হঠাৎ এক ঝাঁক তিমি দেখা গেল। তিনখানা নৌকো ছুটল তাদের পেছনে—দেখতে দেখতে উধাও হল মাইল চার পাঁচ দূরে।

ঠিক এই সময়ে নীল জল ভেদ করে শূন্যে লাফ দিল একটা সাদা তিমি। মবি ডিক।

তৎক্ষণাৎ বাড়তি নৌকো নামানো হল জলে। এ নৌকোটা সব চাইতে বেগবান। কিছুক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পর দিগন্তে পৌঁছোলো মবি ডিক আর নৌকো। তারপর সহসা দেখা গেল সাদা জলের উচ্ছ্বাস। হার্পুন গেঁথেছে তাহলে। শুরু হয়েছে দৌড়।

দেখতে দেখতে জলোচ্ছ্বাস অদৃশ্য হয়ে গেল আরো দূর দিগন্তে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত নৌকোটিকে আর দেখা যায়নি।

মহামুস্কিলে পড়লেন ক্যাপ্টেন গার্ডিনার। সন্ধ্যে নেমেছে। জাহাজের যেদিকে তিনখানা নৌকো অদৃশ্য হয়েছে—ঠিক তার উল্টো দিকে মবি ডিক টেনে নিয়ে গেছে বাড়তি নৌকোকে। এখন কাকে ছেড়ে তোলেন? তিনখানা নৌকোর দিকে যেতে গেলে বাড়তি নৌকোর সঙ্গে ব্যবধান আরো বেড়ে যাবে যে!

কিন্তু উপায় নেই। চীফ মেটের পরামর্শে যেদিকে বেশী লোক, যেতে হল সেইদিকে রাত হয়ে গেল সেদিক থেকে ফিরতে। জাহাজের ট্রাইপটে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল—যাতে অন্ধকারেও দেখা যায়। ঐ অবস্থায় সমস্ত রাত খোঁজা হল—কিন্তু পাওয়া গেল না কাউকে। আজকেও খুঁজতে খুঁজতেই আসছেন এদিকে—কিন্তু নৌকোটার কোনো চিহ্ন নেই।

ফিস ফিস করে উঠল পিকুঅডের লোকজন—"তারা কি আর আছে? মরে ভূত হয়ে গেছে। রাতের কান্না কি এমনি শুনেছিলাম?"

পাথর মুখে ভাবান্তর দেখা গেল না শুধু আহাবের।

ক্যাপ্টেন গার্ডিনার মিনতি মাখানো কণ্ঠে বললেন—"ক্যাপ্টেন আপনার

জাহাজখানা আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে ভাড়া দিন। আপনার লোকসান আমি পুষিয়ে দেব। দুটো জাহাজ যদি দুদিকে দুদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করে, নিশ্চয় তাদের পাওয়া যাবে!"

চাপা গলায় স্টাব বললে—"তিমি ধরার ফুল সিজন চলছে—এখন কেউ এমন অনুরোধ করে? একটা নৌকোর পেছনে দুটো জাহাজ ঘুরে মরবে? ছোঃ! নিশ্চয় ক্যাপ্টেনের ঘড়ি কি টাকা চুরি করে চোর পালিয়েছে নৌকোয়!"

বরফ কঠিন চোখে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন আহাব—কোনো কথা বললেন না।

"ক্যাপ্টেন আহাব!" এবার গলা কেঁপে গেল ক্যাপ্টেন গার্ডিনারের। "আমার নিজের ছেলে রয়েছে সেই নৌকোয়। আরো একটি ছেলে আছে সেখানে—আমার নয়—আমার বন্ধু নানটাকেটের এক ভদ্রলোকের—হাতে নাতে তিমি শিকার শেখবার জন্যে পাঠিয়েছিল আমার সঙ্গে। বয়স তার মোটে বারো!"

এতক্ষণে বোঝা গেল, কেন ক্যাপ্টেন গার্ডিনারের মুখভাব এত বিহ্বল। স্টাব পর্যন্ত কেমন হয়ে গেল এই কথা শুনে। বলে উঠল চাপা গলায়—"আহারে! ঘড়ি চোর নয় তাহলে—নিজের ছেলে, সঙ্গে বন্ধুর ছেলে! আমাদের উচিত ওদের খুঁজে দেওয়া!"

কিন্তু ক্যাপ্টেন আহাবের গ্র্যানাইট মুখের একটি রেখাও নরম হল না।

এবার প্রায় কান্নার সুরে ভেঙে পড়লেন ক্যাপ্টেন গার্ডিনার—"ক্যাপ্টেন আহাব, দোহাই আহাব, দোহাই আপনার! যা টাকা লাগে, সব দেব—শুধু দুটো দিন সঙ্গে থাকুন।—চালাও, চালাও—ফেরাও জাহাজের মুখ!"

"অ্যাভাস্ট!" গর্জে উঠলেন আহাব—"দড়ি ছোঁবেন না! আমি যাব না। সময় নেই।—স্টারবাক! বিনাকল্ ঘড়ি দেখো। ঠিক তিন মিনিট সময় দিলাম। তারপর যেদিকে যাচ্ছো, সেইদিকেই যাবে।"

বলে, খট খট করে ঢুকে গেলেন কেবিনের মধ্যে।

ক্যাপ্টেন গার্ডিনার ছিটকে গেলেন ডেকের ধারে—ঠিকরে গিয়ে আছড়ে পড়লেন নিজের নৌকোয়।

পাল তুলে দূরে সরে গেল পিকুঅড। দূর থেকেই দেখলাম র‍্যাচেল হন্যে মায়ের মত খুঁজছে ছেলেদের। কখনো বাঁয়ে যাচ্ছে, কখনো ডাইনে। যেন মাথার ঠিক নেই।

## টুপি

পৃথিবীর যেখানে যেখানে স্পার্ম তিমি দেখা যায়, ক্যাপ্টেন আহাব সে সব জায়গায় ঢু মেরে অবশেষে এসে পৌঁছোলেন তাঁর চরম লক্ষ্যে। মবি ডিক এখানেই আছে : সেদিন এই তো নিষ্ঠুরভাবে নিপাত্তা করেছে বাচ্চাকাচ্চা-সমেত একটি নৌকো—তার ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত এখনো নিখোঁজ।

মবি ডিক! মবি ডিক! ক্যাপ্টেনের চেহারা পর্যন্ত পালটে গেল মবি ডিকের নিরন্তর ধ্যানে। শুধু তাঁর নয়, সুযোগ্য সহযোগী ফেডাল্লাও মৌন হয়ে গেল মবি ডিকের নিকট সান্নিধ্যে। সে আছে কাছেই, যে কোনো মুহূর্তে চোখে পড়তে পারে। যে কোনো মুহূর্তে তার বিশাল শ্বেতবপু নীলজল ফুঁড়ে উঠে আসতে পারে। ডেকের ওপর তাই অষ্টপ্রহর মোতায়েন রইল ফেডাল্লা। যেন ঘুমোতেও জানে না। সর্বক্ষণই নিশ্চুপদেহে খরশান চোখে সমুদ্রপৃষ্ঠ সমীক্ষা করত আশ্চর্য সহিষ্ণুতা নিয়ে। যেন সে একটা ছায়া—কায়াহীন অদৃশ্য জগৎ হতে কায়ালোকে নিক্ষিপ্ত একটা অশরীরী দেহ—শরীরী হয়েও ইহজগতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন।

সম্পর্ক শুধু আহাবের সঙ্গে। আহাবেরই ছায়া দেহ যেন তার এই রহস্যময় অনুচর। দীর্ঘশীর্ণ বেতস পত্রের মত তেজালো দেহে নেই ক্লান্তি-শ্রান্তি অবসাদ। আহাব চেয়ে থাকেন যতক্ষণ পারেন—কথা নেই মুখে। তাঁর অনুচরও নিয়ত পর্যবেক্ষণরত—রা কাড়ে না মুখে, কেউ কারও সঙ্গে কথাও বলে না। সারাদিনে হয়ত একটা কথাই বলল একজন আরেকজনকে—তার বেশী নয়।

কেন জানি মনে হত, আহাব ভয় পান তাঁর ছায়াদেহকে—চোখের চাহনিতে থিরথির করে কেঁপে উঠত অন্তরের শংকা। ক্ষণপরেই মনে হত, ফেডাল্লা তাঁর সারদেহ আহাবকেও ভয়ের চোখে দেখে। অথচ দুজনেই কিন্তু একসূত্রে একতারে বাঁধা। দুজনেরই লক্ষ্য—মবি ডিক।

মাস্তুলের মাথায় পাহারা চলছে সারাদিন। তবুও শেষ পর্যন্ত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল আহাবের। পাহারাদার নিশ্চয় সঠিক দেখছে না—দেখেও খবর দিচ্ছে না। তাই একদিন নিজেই বাস্কেটে বসলেন। দড়ি ধরে টেনে তোলা হল মাস্তুলের মাথায়। দড়িটা কিন্তু টেনে রাখবার ভার দিলেন এমন একজনের ওপর যে বারংবার তাঁর অন্যায় সিদ্ধান্তে রুখে দাঁড়িয়েছে, চোখ রাঙানিকেও ভয় পায়নি, এমনকি বিপ্লবের সূচনা পর্যন্ত করেছে—স্টারবাক। আশ্চর্য!

যাকে বিশ্বাস করা উচিত নয় অন্ততঃ আহাবের—তার হাতেই জীবনের ভার বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়ে শূন্যে উঠে দিগন্তে নজর রাখলেন অবিশ্বাসী আহাব।

এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটল। আহাবের টুপী কপাল পর্যন্ত চেপে বসানো থাকত। হঠাৎ একটা সমুদ্র-বাজ কোত্থেকে উড়ে এসে কর্কশ চীৎকারে বাতাস ফালাফালা করে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল আহাবের মাথা ঘিরে। কিন্তু মবি ডিক-গত-প্রাণ আহাব অপলকে চেয়ে রইলেন মাইলের পর মাইল-ব্যাপী সুনীল জলধির পানে—বাজপাখীকে দেখলেন না। চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে সহসা হাজার ফুট ঊর্ধ্বে ছিটকে উঠে গেল শিকারী পাখীটা—ফের নেমে এল নিমেষ মধ্যে এবং ছোঁ মেরে টুপীটা কেড়ে নিয়ে মিলিয়ে গেল নীল আকাশে।

## পিকুঅড দেখল ডিলাইটকে

উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট পিকুঅড ভেসে চলল দিনের পর দিন। গলুইয়ের সামনে সূর্যালোকে ঝকঝক করতে লাগল সেই কফিনটা—এখন যা লাইফবয়।

এই সময়ে দেখা হল ডিলাইট জাহাজের সঙ্গে। নামেই ডিলাইট—কিন্তু জাহাজ-জোড়া বিষাদ ইথারের মধ্যে দিয়ে ছুটে এসে যেন বিদ্ধ করল আমাদের। জাহাজের যেখানে ভাঙা বোট রাখা হয়, সেখানে রয়েছে একটা সাংঘাতিকভাবে বিধ্বস্ত নৌকো।

"সাদা তিমি দেখেছেন?"

"কি দেখছেন?" কথা বলার চোঙা নেড়ে ভগ্ন নৌকো দেখালেন তোবড়ানো-গাল ডিলাইট-ক্যাপ্টেন।

"মেরেছেন?"

"তাকে মারবার মত হার্পুনও এখনো তৈরী হয় নি।" বলে বিষণ্ণভাবে পাশের দিকে তাকালেন ডিলাইট-ক্যাপ্টেন। কয়েকজন নাবিক একটা হ্যামকের মধ্যে শায়িত মৃতদেহ কাপড় দিয়ে মুড়ে সেলাই করছে নীরবে।

"কে বললে তৈরী হয় নি!" সিংহ গর্জন করলেন আহাব। "এই তো সেই হার্পুন।" স্বহস্তে পেটাই ঘোড়ার খুর আর দাড়ি কামানোর ক্ষুর দিয়ে তৈরী হার্পুনটা মাথার ওপর নাড়তে নাড়তে বললেন আহাব—"দেখুন, তাকিয়ে দেখুন না মশায়! মবি ডিকের মৃত্যু আমার হাতে! রক্ত দিয়ে ট্যামপার করা, বিদ্যুৎ দিয়ে শক্ত করা—সাদা তিমির কলজে পর্যন্ত জালিয়ে ছাড়ব এই হার্পুন দিয়ে!"

"ঈশ্বর আপনার সহায় হোন," হ্যামকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন ডিলাইট-ক্যাপ্টেন—"পাঁচজন জোয়ানের একজনকে গোর দিচ্ছি—বাকী চারজন মরবার আগেই সমাধিস্থ হয়েছে।" বলে হুকুম দিলেন নাবিকদের—"দাও নামিয়ে জলে।—হে ভগবান, এর জন্মমৃত্যু—"

"এগিয়ে যাও সামনে!" হেঁকে উঠলেন আহাব।

পিকুঅড লাফ দিয়ে সরে যাওয়ার আগেই মৃত নাবিকের হ্যামক গিয়ে পড়ল জলে। জল ছিটকে উঠল অনেকদূর—অভিশপ্ত কয়েকটি ফোঁটা ছিটকে এল পিকুঅডের ওপর।

## ঐকতান

ইস্পাত-নীল নির্মল দিন। বিমল বাতাস। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউগুলো যেন পুরুষ। আকাশ আর বাতাস তার স্ত্রী।

তুষার ধবল পাখী উড়ছে ঢেউয়ের ওপর। ওরা যেন তরুণী সমীরণের ছোট্ট ছোট্ট ভাবনা; দুর্দান্ত সমুদ্রের তলে কিন্তু ঘুরছে তিমিঙ্গিল, হাঙর আর তলোয়ার মাছ—পুরুষ সাগরের খুনে চিন্তা।

তরঙ্গের ছন্দে রাজকীয় চালে দুলছে পিকুঅড। আহাব দাঁড়িয়ে ডেকে। অন্তরে দোলা দিয়েছে পুরুষ আর প্রকৃতি। মনে পড়েছে ঘরের কথা, স্ত্রীর কথা, পুত্রের কথা। পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন। বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছিল না ভেতরে তাঁর কি আলোড়ন চলছে। মগজের আগ্নেয়গিরিটা ফের যেন ফেটে পড়তে চাইছে!

ধীরপদে ডেকের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন আহাব! ঝুঁকে পড়লেন জলের ওপর। আঘ্রাণ নিলেন সুরভিত সমীরণের, দেখলেন সুনীল আকাশের প্রতিবিম্ব। দুচোখের মধ্যে দিয়ে উপোষী মনটা যেন ভরিয়ে নিতে চাইলেন। আস্তে আস্তে প্রকৃতির হিল্লোলে হিল্লোলিত হলেন তিনিও। ধীরে ধীরে এক-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে এল শুকনো চোখের কিনারায়—টুপ করে খসে পড়ল লবণাম্বুরাশিতে।

রত্নগর্ভা প্রশান্ত মহাসাগরের দামও সেই অশ্রুবিন্দুর তুলনায় কিছু নয়।

শুধু স্টারবাকই দেখতে পেলেন কি অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গেল তাঁর চোখের সামনে। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে।

ঘুরে দাঁড়ালেন আহাব।

"স্টারবাক!"

"স্যার।"

"স্টারবাক! বাতাস কত মিঠে বলো তো! মিঠে আকাশটাও! এমন একটা মিষ্টি দিনে চল্লিশ বছর আগে আমি আমার জীবনের সর্বপ্রথম তিমি বধ করেছিলাম। তখন আমার বয়স মোটে আঠারো। তারপর চল্লিশটা বছর একটানা সাগরে সাগরে বেরিয়েছি—এই চল্লিশ বছরের মধ্যে ডাঙায় থেকেছি সব মিলিয়ে বড়জোর তিন বছর। এতগুলো বছর নিঃসঙ্গ সমুদ্রজীবন কাটিয়ে কি পেলাম বলো তো? পঞ্চাশ বছর বয়েসে অল্প বয়েসের একটি মেয়েকে বিয়ে করলাম। কিন্তু পরের দিনই চার বছরের মেয়াদে বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রে। ছিল কুমারী—বিয়ে করে করলাম তাকে বিধবা। স্টারবাক! স্টারবাক! কিসের পেছনে ছুটে চলেছি এতগুলো বছর?··· মবি ডিক! মবি ডিক! কিন্তু দোহাই তোমায়, মবি ডিককে দেখা গেলে তোমরা কেউ নৌকো নামাবে না। আমি যাব তার পেছনে। আর কেউ না। তোমার মিষ্টি ঘরের ছবি যে তোমার চোখের মধ্যেই দেখছি, স্টারবাক! না, না, তুমি যেও না—কক্ষনো না!"

"ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন! এত বড় মন আপনার? নরকের সেই মাছটার পেছনে দৌড়ে কি হবে, ক্যাপ্টেন? চলুন আমরা ফিরে যাই। ভয়ানক এই জল পেরিয়ে চলুন নানটাকেট ফিরে যাই। সেখানে আমার বউ আছে, ছেলে আছে! মেরী যে আমাকে বলেছে, যতদিন না ফিরি, ততদিন বাড়ীর কাছে পাহাড়ে উঠবে রোজ ছেলেকে নিয়ে—দেখবে দিগন্তে পিকুঅডের পাল দেখা যায় কিনা! স্যার, স্যার! আজকের এই মিষ্টি দিন কিন্তু নানটাকেট গেলেও দেখতে পাবেন!"

"হ্যাঁ, জানি। ঠিক এই সময়ে ছেলেটা ঘুম থেকে উঠে বসে থাকে বিছানায়। ওর মা তখন ওকে ফের ঘুম পাড়িয়ে দেয় আমার কথা বলে—এই বুড়ো তিমি খুনীটার গল্প শুনিয়ে।"

"চলুন, স্যার, ফিরে যাই।"

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন আহাব। ধীরে ধীরে শক্ত হয়ে উঠল চোখ-মুখ! —"কিসের মায়া? মাটির মায়ায় কেন ভুলব আমি সাগরের মানুষ? কে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে? ভাগ্য! ভাগ্য! স্টারবাক! সেই ভাগ্যকে এড়ানোর সাধ্য আমার নেই!"

কিন্তু কোথায় স্টারবাক? নত মস্তকে নিঃশব্দে সরে গেছে অন্তরালে। আহাব ডেক পেরিয়ে এলেন। এসে দেখলেন, নিথরদেহে জলের দিকে তাকিয়ে আছে ফেডাল্লা।

সেই রাতেই রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ সবেগে বাইরের পানে মুখ বাড়িয়ে দিলেন আহাব এবং বাতাস শুঁকতে লাগলেন সশব্দে—দ্বীপের নিকটবর্তী হলে কুকুর যেভাবে ঘ্রাণ নেয়—অবিকল সেইভাবে।

ঘোষণা করলেন তারপরেই—খুব কাছেই তিমি ঘুরছে।

অচিরে আমরাও পেলাম সেই বিচিত্র গন্ধ—স্পার্ম তিমির গন্ধ—অনেক দূরে থাকলেও বাতাস শুঁকে টের পাওয়া যায়।

ক্যাপ্টেন আহাব জাহাজের মুখ সামান্য ঘুরিয়ে দিতে হুকুম দিলেন।

ভোরের আলো ফোটার পর বুঝলাম তাঁর দূরদর্শিতা। সামনেই ভাসছে দূরবিস্তৃত এক ফালি শান্ত জল। যেন নদীর জল বেড় দিয়ে রয়েছে প্রশান্ত জলরাশিকে।

"মাস্তুলে ওঠো! পাল খাটো কর!"

তিনজন তৎক্ষণাৎ উঠে গেল মাস্তুলে। আকাশপানে মুখ তুলে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আহাব—"কি দেখছো?"

"কিচ্ছু না।"

"হেই! কে আছো! টেনে তোলো আমাকে!" মূল মাস্তুলের শীর্ষে টেনে তোলার জন্যে একটা দড়ি সরিয়ে রাখা হয়েছিল শুধু ওঁর জন্যেই। তৎক্ষণাৎ ওঁকে টেনে তোলা আরম্ভ হল সেই দড়ি ধরে। দুই তৃতীয়াংশ উঠেই দুটো ফুলে ওঠা পালের ফাঁক দিয়ে ভীষণ চীৎকার করে উঠলেন আহাব—"ঐ ফোয়ারা ছাড়ছে! ঐ ফোয়ারা ছাড়ছে!"

যুগপৎ চেঁচিয়ে উঠল তিন মাস্তুল পর্যবেক্ষক। সোরগোল পড়ে গেল জাহাজে। রেলিংয়ের ধারে ছুটে গেল সবাই বহুপ্রতীক্ষিত অতি বিখ্যাত মবি ডিকের শ্বেত কলেবর দেখবার জন্যে।

আহাব এখন সবার ওপরে। তালঢ্যাঙা ট্যাশটেগোর মাথা তাঁর পায়ের কাছে। দেখা যাচ্ছে মাইল কয়েক সমুদ্র। একটা ফোয়ারা নিয়মিত ছন্দে উঠছে আর পড়ছে।

দেখেই সন্দেহ হল। ঠিক এই ফোয়ারাই আলেয়ার আলোর মত আটলান্টিক আর ভারত মহাসাগরে রাতের পর রাত দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছে না?

তিন মাস্তুলের পর্যবেক্ষকদের পানে চাইলেন আহাব—"তোমরা কেউ দেখোনি?"

"আমি দেখেছি ক্যাপ্টেন।" বললে ট্যাশটেগো—"আপনি যখন দেখেছেন, প্রায় ঠিক তখনি।"

"না—না—না! আমি আগে দেখেছি! সোনার মোহর আমার! ঐ ফোয়ারা ছাড়ছে! ঐ ফোয়ারা ছাড়ছে! ঐ ফোয়ারা ছাড়ছে!" শ্বেত তিমির ফোয়ারা ছাড়ার তালে তাল মিলিয়ে টানা সুরে আচ্ছন্নের ঘোরে চেঁচিয়ে গেলেন আহাব।

"ডুব দেবার মতলব আঁটছে মবি ডিক! ছোট পাল তুলে দাও! বড় পাল নামিয়ে দাও! দাঁড়াও তিনটে নৌকোর সামনে! মিঃ স্টারবাক, মনে আছে তো? জাহাজ চালানোর ভার তোমার—নৌকো নামাবে না। ঐ ফ্লুক নাড়ছে! না, না, কালো জল! সবাই তৈরী? নামাও, মিঃ স্টারবাক, চটপট নামাও আমাকে! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!" বলতে বলতে সড়াৎ করে দড়ি বেয়ে শূন্যপথে ডেকে নেমে এলেন ক্যাপ্টেন।

"ক্যাপ্টেন!" চীৎকার শোনা গেল স্টাবের—"পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে—এখনো দেখতে পায়নি আমাদের।"

"চোপরাও! একদম কথা বন্ধ! নৌকো নামাও! নৌকো নামাও!"

ঝপাঝপ নেমে পড়ল তিনখানা নৌকো—স্টারবাকের বাদে। পাল তুলে জল কেটে তীরবেগে ছুটে গেল সামনে—পুরোধা রইলেন আহাব। সামনেই কঠিন মুখে বসে রইল ফেডাল্লা—চোখ কোটরে বসা, কদাকার মুখে অতি প্রকট একখানা দাঁত।

নোটিলাস কথাটার অর্থ নৌ-শম্বুক; অমেরুদণ্ডী থলথলে সমুদ্রজীব—যেমন, অক্টোপাস, কাট্‌ল্‌ ফিশ। নৌকো তিনখানা এই নোটিলাসের মতই সমুদ্র কেটে ভীমবেগে এগিয়ে গেল সামনে। কিন্তু শত্রুর নিকটবর্তী হল ধীর গতিতে। এখানকার জল কিন্তু শান্ত, মসৃণ। যেন ঢেউয়ের ওপর একটা কার্পেট বিছোনো—শান্তির রাজ্য।

রুদ্ধশ্বাসে সবাই মবি ডিকের আরো কাছে পৌঁছে গেল। সাদা তিমির সাদা কুঁজটা এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মবি ডিক কিন্তু এখনো টের পেয়েছে বলে মনে হল না। ঝকঝকে সাদা কুঁজের চারপাশে বলয়াকারে সবুজ ফেনা ছড়িয়ে পড়ছে মৃদুমন্দ ঢেউয়ের আকারে। বিচ্ছিন্ন একটা বস্তুর মত জলের ওপর জেগে রয়েছে কুঁজটা। বিশাল ললাট ঠেলে রয়েছে সামনে—অদ্ভুত কুঞ্চিত ললাট—যেন অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ সেখানে। দুগ্ধ ধবল কপালের সামনে থেকে জলে ঢেউ উঠছে—টানা ঢেউগুলো দেহের পাশ দিয়ে পেছনে মোলায়েম রেখা রেখে যাচ্ছে। নীল উপত্যকার সেই মসৃণ আন্দোলন ভাবায়

বর্ণনা করা যায় না। দু হাতের কাছে রাশি রাশি বুদবুদ ভেসে উঠছে—কিন্তু পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যাচ্ছে কয়েক শ' ফুর্তিবাজ ফাউলের লঘু চরণের আঘাতে। তারা উড়ছে জলের ওপর ডানার ঝাপটা মেরে। উড়তে উড়তে সাদা চাঁদোয়া সৃষ্টি করছে সাদা হাওদার মত কুঁজের ওপর। বাণিজ্যপোতের রঙ করা খোলে যেমন নিশান-দণ্ড, সেই রকম একটা সদ্য প্রোথিত বর্শার হাতল দুলছে কুঁজের ওপর। ফাউলগুলো কখনো খেলাচ্ছলে বসছে বর্শার হাতলে। ঈষৎ দুলিয়ে দিয়ে উঠে পড়ছে শূন্যে।

বড় আনন্দে আছে যেন শ্বেত বিভীষিকা। প্রসন্ন ছন্দে মৃদুমন্দ গতিতে মসৃণ জলের ওপর দিয়ে পিছলে যাচ্ছে স্বর্গীয় সুষমায়!

খুশীর সাগরে সন্তরমান যেন মূর্ত শান্তি। এই শান্ত রূপ দেখেই প্রলুব্ধ হয়েছে শিকারীরা—এই স্বর্গীয় সৌন্দর্য দেখেই ছুটে এসেছে হত্যার বাসনা নিয়ে। পরমুহূর্তেই ভুল ভেঙে গিয়েছে রুদ্রদেবতার প্রলয়লীলা দেখে। মবি ডিকের এ-রূপ কপট—অভিজ্ঞ চক্ষুতেও ধরা কঠিন।

বিরাট দেহের সবটুকু কিন্তু তখনো চোখে পড়েনি—করাল চোয়ালের চেহারাও দৃশ্যমান হয় নি। কিন্তু এবার তা দেখা গেল। জলের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে উঠে এল দেহের সামনের অংশ—যেন মার্বেল পাথর নির্মিত ভার্জিনিয়া ব্রীজ। বিশাল পিঠ বেঁকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ফ্লুক উঠে গেল আকাশের দিকে—শূন্যে আন্দোলিত হল বিশাল ডানা এবং নিমেষে মবি ডিক হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। বিক্ষুব্ধ জলরাশির ওপর পরম স্নেহে দুলতে লাগল সাদা সী-ফাউলগুলো।

দাঁড় তুলে নিয়ে নৌকো তিনটে প্রতীক্ষায় রইল মবি ডিকের পুনরাবির্ভাবের।

"এক ঘণ্টা," বললেন আহাব। শিরদাঁড়া সিধে করে বসে রইলেন নৌকোর হালে। দৃষ্টি রইল শান্ত সুনীল জলরাশির ওপর। ডুব দেওয়ার ঢেউ মিলিয়ে গেছে—আবার কার্পেট বিছানো হয়েছে ঢেউয়ের ওপর।

"পাখী!—পাখী!" আচমকা চেঁচিয়ে উঠল ট্যাশটেগো।

সাদা ফাউলগুলো সটান উড়ে আসছে আহাবের বোটের দিকে। কয়েক গজ দূরে এসে আবার উড়তে লাগল জলের ঠিক ওপরে—সেইসঙ্গে সহর্ষ চীৎকার—যেন প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে। ওদের চোখ মানুষের চোখের চেয়েও তীক্ষ্ণ। আমরা যা দেখিনি, ওরা তা আগেই দেখেছে। আহাব নিজেও এতক্ষণ কিছু টের পাননি। এবার জলের মধ্যে তাকাতেই দেখতে পেলেন সাদা নেউলের মত একটা চলমান সাদা বস্তু—দ্রুতবেগে উঠে

আসছে ওপর দিকে—যতই উঠেছে, ততই বিবর্ধিত হচ্ছে আকারে—তারপর পাশ ফিরতেই স্পষ্ট হল দু সারি ঝকঝকে সাদা ক্রুর দাঁতের সারি—অদৃশ্য অতল থেকে ক্রমশঃ দৃশ্যমান হচ্ছে করাল বিভীষিকা।

উঠে আসছে মবি ডিকের হিংস্র চোয়াল—বাকী দেহ এখনো নীল সাগরে অর্ধেক মিশে রয়েছে। অত্যুজ্জ্বল মুখটা মার্বেল-সমাধির খোলা দরজার মত হাঁ হয়ে গেল বোটের ঠিক তলদেশে এবং চকিতে হালের মোচড় দিয়ে নৌকোটাকে এই ভয়ংকর প্রেতচ্ছায়ার লক্ষ্য কেন্দ্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন আহাব। ফেডাল্লাকে বললেন উঠে আসতে—উনি গিয়ে বসলেন বোটের মাথায়। দাঁড়িদের দাঁড় ধরতে হুকুম দিয়ে নিজে বাগিয়ে ধরলেন পার্থ-নির্মিত রক্তপূত সেই হার্পুন।

ঠিক মুহূর্তেই বোট সরিয়ে এনেছিলেন আহাব। কিন্তু মবি ডিক যেন ওর ক্রুর বুদ্ধি দিয়ে আহাবের ফন্দী ধরতে পেরেই চকিতে চ্যাটালো মাথাখানা বাড়িয়ে ধরল বোটের ঠিক তলায়।

হাঙর যেভাবে চিৎ হয়ে গিয়ে কামড়ায়, মবি ডিক ঠিক সেই কায়দায় নৌকোর তলায় লম্বালম্বি ভাবে থেকে আস্তে আস্তে কদর্য চোয়াল বাড়িয়ে কামড়ে ধরল নৌকোর গলুই এবং নৌকোর পেছন দিক জল থেকে তুলে ফেলল শূন্যে। আহাবের মাথার মাত্র ছ ইঞ্চি দূরে ঝিকমিক করতে লাগল তার নীলচে সাদা তলার চোয়াল। বেড়াল যেভাবে আস্তে আস্তে ইঁদুর-ছানাকে ঝাঁকুনি দেয়, সেইভাবে এইবার মবি ডিক নাড়াতে লাগল নৌকো। ফেডাল্লা অবাক-না-হওয়া চোখে চেয়ে রইল আহাবের পানে। কিন্তু তার বাঘ-সাগরেদরা হুড়মুড় করে ঠিকরে এল বোটের মাঝে ঝাঁকুনির চোটে।

কি ভয়ানক শয়তানি! আস্তে আস্তে বোট নাড়া দিয়ে যেন মজা দেখছে মবি ডিক! আহাব কিছু করতে পারছেন না। চোয়ালের অত কাছে থেকে হার্পুন ছোঁড়া যায় না। আশপাশের নৌকোগুলোও দর্শক ছাড়া এখন কিছু নয়। উন্মাদ আহাবকে প্রায় চোয়ালের মধ্যে ধরে রেখেছেন তাঁর পরম শত্রু—এ অবস্থায় মবি ডিককে আঘাত করা যায় না। অসহায় আহাব যেন এবার খেপে গিয়ে শুধু হাতেই লম্বা হাড়খানা ধরে মোচড় দিয়ে ঠেলে দিতে চাইলেন। কিন্তু ফস্কে গেল তাঁর হাত। সরে গেল চোয়াল—চেপে বসল নৌকোর কাঠে—মড় মড় করে ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল নৌকোখানা। পেছনের ভাঙা অংশ আঁকড়ে ধরে কোনমতে ভেসে রইল ফেডাল্লা আর তার টাইগার-সঙ্গীরা।

কামড়টা চেপে বসবার ঠিক আগেই আহাব বুঝতে পেরেছিলেন মবি

ডিকের মতলব। তাই হাত দিয়ে ঠেলে বার করতে গিয়েছিলেন নৌকোর কাঠ—কিন্তু পারেননি। বরং নিজেই মুখ থুবড়ে পড়েছেন জলের ওপর।

ছলছলাৎ ঢেউ তুলে অসহায় শিকারের কাছ থেকে দূরে সরে গেল মবি ডিক। একটু তফাতে গিয়ে কুঁচকোনো ললাট জল থেকে তুলে ধরল বিশ ফুট ওপরে। তারপর আস্তে আস্তে ফের জলের সঙ্গে সমান হয়ে গিয়ে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল চারদিকে—বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে রইলেন আহাব। দ্রুত হতে দ্রুততর হতে লাগল ঘূর্ণনবেগ। মাঝের ভাঙা বোটখানা যেন ওর রক্তে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে—অস্থির হচ্ছে মস্তিষ্ক।

ঘূর্ণাবর্তের ঠিক মাঝে ভাসছে আহাবের মাথা। একখানা পা নিয়ে ভাল ভাবে সাঁতার কাটা যায় না—ভেসে থাকা যায়। আহাবও ভেসে আছেন মাথা তুলে—অসহায় ভাবে দেখছেন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে চক্রব্যূহ। ও পাশের দুখানা নৌকো থ হয়ে গিয়েছে ধুরন্ধর মবি ডিকের কুচুটে বুদ্ধি দেখে —চক্রব্যূহ আরো ছোট করে এনে ঝাঁপিয়ে পড়বে আহাবের ওপর—কিন্তু এ অবস্থায় অন্য নৌকো থেকে হার্পুন নিক্ষেপ করলে হিতে বিপরীত হবে। ক্ষেপে গিয়ে সংহার মূর্তি ধারণ করবে মূর্তিমান প্রহেলিকা মবি ডিক।

পুরো দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছিল পিকুঅডের মাস্তুলশীর্ষ থেকে। সেইদিকে চেয়েই হেঁকে উঠলেন আহাব—"চালাও—" বাকী কথাটা আটকে গেল মুখের ওপর মবি ডিকের ফ্লুক আন্দোলিত ঢেউ আছড়ে পড়ায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিয়ে ফের চেঁচিয়ে উঠলেন—"চালাও জাহাজ তিমির ওপর! তাড়াও ওকে!"

গলুই ঘুরে গেল পিকুঅডের। গণ্ডীর ভেতরে ঢুকে পড়ল জাহাজ—একদিকে রইল মবি ডিক—আরেকদিকে আহাব।

দূরে সরে গেল সাদা তিমি। তীব্রবেগে আহাবের দিকে ছুটে এল নৌকো দুখানা।

স্টাবের বোটে টেনে তোলার পর লোনা জলে রক্তচক্ষু আহাব নেতিয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। মাঝে মাঝে অস্ফুট গোঙানি উঠে এল যেন নাভিমূল থেকে।

অনেকক্ষণ পরে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বললেন জড়িত স্বরে—"হার্পুনটা আছে তো?"

"আছে," তুলে দেখাল স্টাব।

"আমার সামনে রাখো।—লোকজন সব আছে?"

"এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। পাঁচজনেই আছে।"

"ধরে দাঁড় করিয়ে দাও আমায়।—ঐ যাচ্ছে! কি সুন্দর ফোয়ারা

দেখেছে? ছেড়ে দাও আমাকে—আহাব আবার শক্তি ফিরে পেয়েছে। টানো দাঁড়!"

নিয়ম হল, একটা নৌকো যদি ফেঁসে যায়, আরেকটা নৌকোয় সবাই উঠে সমানে তাড়া করে যায় তিমির পেছনে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হবার নয়। যদিও এখন ডবল দাঁড় এ নৌকোয়—কিন্তু তিন গুণ বেগে বিন্দুর মত দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে মবি ডিক। এ অবস্থায় তাড়া করে কোনো লাভ নেই।

সুতরাং ভাঙা নৌকোকে টেনে তোলা হল জাহাজে। মুখ ঘুরে গেল পিকুঅডের। গোটা জাহাজটাই তেড়ে গেল মবি ডিককে। অনেক দূরে তখনো তার ফোয়ারা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে দেখা যাচ্ছে। ঘড়ি হাতে সময় গুনছেন আহাব। ফোয়ারার সময় হলেই চেঁচিয়ে জানতে চাইছেন—"দেখা গেছে?"

এইভাবেই চলল পেছন নেওয়া। অস্থির চরণে ডেকে পায়চারী করতে লাগলেন আহাব। কাজের কথা ছাড়া একটি বাজে কথাও বলছেন না। কখনো বলছেন ছোট পাল নামাতে, বড় পাল তুলতে। কখনো চেয়ে আছেন বীভৎস ভাবে কামড়ানো ভাঙা নৌকোখানার দিকে—চোখের পাতাও পড়ছে না।

স্টারবাক এগিয়ে এসে বললে—"স্যার, লক্ষণ শুভ নয়।"

"শুভ নয়? দুর্লক্ষণটা কি দেখলে? ওসব অভিধানের কথা!—হেই! দেখা যাচ্ছে তো? যতবার দেখবে, ততবার হাঁক দেবে!"

সারাদিন গেল এইভাবে—এল রাত্রি।

"আর দেখা যাচ্ছে না, স্যার।" হাঁক শোনা গেল শূন্যে।

"কোন দিকে গেল?"

"একই দিকে।"

"বেশ! বেশ! ও এখন আস্তে যাবে—রাত হল তো! মিঃ স্টারবাক, বড় বড় পালগুলো সব নামিয়ে দাও। সকাল হওয়ার আগেই যেন ওর ঘাড়ে গিয়ে না পড়ি। মিঃ স্টাব, মাস্তুলের মাথায় নতুন লোক বসাও—কাল ভোর পর্যন্ত ওখানেই থাকবে।"

বলতে বলতে আহাব এগিয়ে গেলেন সোনার মোহরটার সামনে। বললেন—"এ মোহর আমার—আমি জিতেছি। কিন্তু যেদিন মবি ডিক মরবে, সেইদিন যে আগে নিতে পারবে—এ মোহর তার।"

বলে নিজস্ব জায়গায় গিয়ে টুপীটা চোখের ওপর নামিয়ে সমস্ত রাত ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন।

## পিছু ধাওয়া—দ্বিতীয় দিন

ভোর হল। নতুন লোক উঠল মাস্তুলের মাথায়। আবার হাঁকডাক শুরু হয়ে গেল আহাবের।

কিন্তু মবি ডিককে আর দেখা গেল না। ফোয়ারা মিলিয়ে গিয়েছে দিগন্তে।

তিলমাত্র ঘাবড়ালেন না আহাব। বললেন—"ভেবেছিলাম রাত্রে আস্তে যাবে—একটু না হয় জোরেই গেছে। এখুনি ধরে ফেলব—তোলো বড় পাল!"

নানটাকেট তিমিশিকারীদের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে রাতের অন্ধকারেও তিমির পেছন নেওয়ার। গোটা জাহাজ দিনের পর দিন বিশেষ তিমির পেছনে তেড়ে যায়। রাত্রে জাহাজ দাঁড়ায় না। ওস্তাদ ট্রেন-চালকরা ঘড়ি ধরে বলে দিতে পারেন, অমুক ট্রেন অত জোরে ছোটে, সুতরাং অমুক জায়গায় যেতে এত সময় লাগবে। নানটাকেটের বহুদর্শী তিমিশিকারীরাও রাত নামলেও তিমির দৌড়ের ধরন দেখে আঁচ করতে পারে, ঠিক কোনদিকে সে যাচ্ছে এবং ভোর হলে তাকে কত মাইল দূরে পাওয়া যাবে।

আহাবের হিসাবেও ভুল হল না। তরতরিয়ে ছুটে চলল পিকুঅড। তারপরেই চীৎকার শোনা গেল শূন্যে—"ঐ ফোয়ারা!… ঐ ফোয়ারা!"

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল স্টাব—"পালিয়ে তুই যাবি কোথায় রে! ফুসফুস ফাটিয়ে ফোয়ারা ছাড়ব—আহাব গিয়ে এখুনি ছোটাবে রক্ত ফোয়ারা!"

জাহাজশুদ্ধ মানুষের মনের কথাই বলল স্টাব। প্রথম দিকের ভয় কেটে গিয়েছে পাছু নেওয়ার উত্তেজনায়। প্রত্যেকেই উদ্বেগ উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছে মবি ডিকের দর্শন কামনায়। সার্থক হয়েছে আহাবের পরিকল্পনা। ওরা কেউ আর এখন আলাদা নয়—এক হয়ে গিয়েছে তিরিশটা মানুষ। আহাব তাদের প্রভু! জাহাজের দড়িদড়া ধরে ওরা ঝুলছে, মই বেয়ে উঠেছে শূন্যে! সবার উৎকণ্ঠিত চোখ সাদা তিমির দিকে।

কিন্তু কেউ তো আর চেঁচাচ্ছে না! কোথায় সাদা তিমি?

চীৎকার শোনা গেল আহাবের—"ভুল দেখেছিস তোরা!—টেনে তোল আমাকে! মবি ডিক কখনো একবার ফোয়ারা ছেড়েই পালায় না!"

এরকম চোখের ভুল ঝানু তিমিশিকারীদেরও হয়। দূর থেকে মরীচিকা দর্শন ঘটে। মনে হয় যেন ফোয়ারা দেখা যাচ্ছে।

টেনে তোলা হল আহাবকে মাস্তলের মাথায়। সবার মিলিত চাহনি এবার দূর সমুদ্রে নিবদ্ধ।

সহসা যেন একটা রূপোলী স্যালমন মাছ লাফিয়ে উঠল জল ছেড়ে শূন্যে।

স্যালমন নয়—মবি ডিক। সাড়ে সাত মাইল দূরে দেখা গেল বিপুল কলেবরকে প্রচণ্ড শক্তিভরে শূন্যে লাফ দিতে। জলের অতল থেকে উল্কাবেগে ছুটে এসেই ছিটকে গিয়েছে শূন্যে—তেউড়ে বেঁকে আশ্চর্য পাকসাট খেয়ে ঝপাৎ করে পড়ল জলে। জলরাশি বাষ্পরাশি হয়ে ভাসতে লাগল তার আশ্চর্য সুন্দর দেহ ঘিরে - নীল জলের ওপর সাদা কুহেলী ভেসে রইল অনেকক্ষণ।

সাড়ে সাত মাইল দূরে সে যে এসেছে, তা জানিয়ে গেল প্রচণ্ড লাফ দিয়ে। অথচ মাস্তল থেকে ওরা নাকি মাইলখানেক দূরেই ফোয়ারা দেখেছিল।

তাই যেন জল থেকে উঠে এসে ভুল ভাঙিয়ে দিল মবি ডিক—চ্যালেঞ্জ করল পিকুঅডকে।

তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন আহাব—"নামাও! নামাও! নৌকো নামাও!"

দড়িদড়া মই বেয়ে ধীরে সুস্থে না নেমে সটান ডেকের উপর লাফিয়ে পড়ল বোটের দাঁড়িরা। আহাব স্বয়ং অবশ্য লাফ দিলেন—কিন্তু নক্ষত্রবেগে পিছলে নেমে এলেন মাস্তলের মাথা থেকে।

স্টারবাককে জাহাজ চালানোর হুকুম দিয়ে বাড়তি নৌকোয় গিয়ে চাপলেন আহাব। তিনখানা নৌকো তীরবেগে ছুটে গেল মবি ডিকের দিকে।

মাঝে রইলেন আহাব। অপার্থিব চীৎকারে উন্মত্ত করে রাখলেন অন্য দুই নৌকোর সঙ্গীদের।

মবি ডিক কিন্তু আক্রমণের পথ বেছে নিয়েছে। সোজা ছুটে আসছে আগুয়ান নৌকো তিনখানার দিকে। মাঝে এসেই বিশাল ল্যাজ আছড়ে উল্টে দিতে চাইল নৌকোগুলো। কিন্তু অদ্ভুত দক্ষতায় পাশ কাটিয়ে গিয়ে হার্পুন নিক্ষিপ্ত হল তিনটে নৌকো থেকেই। গায়ে গেঁথেও গেল তিনখানা হার্পুন। তিন তিনখানা লাইনের মধ্যে দিয়ে ছুটতে লাগল মবি ডিক। ভয়ডরের লেশমাত্র নেই—আহত হয়েও হকচকিয়ে যায়নি মোটেই। হার্পুন বেঁধা অবস্থাতেই দানবিক ল্যাজের বাড়ি মারছে দুপাশে। দড়িগুলো ক্রমশঃ পরস্পর জড়িয়ে গিয়ে শেষকালে এমন জট পাকিয়ে গেল যে টান পড়ল নৌকোর ওপর।

পেঁচিয়ে স্ক্রু খোলার মতই জট পাকানো দড়িগুলোর মোচড়ে হঠাৎ একটা হার্পুন উপড়ে এল মবি ডিকের গা থেকে। বিদ্যুৎ ঝলকের মত দেখা গেল আহাবের নৌকোয় গেঁথে গেছে হার্পুনের ফলা।

এ অবস্থায় যা করা দরকার, তাই করলেন আহাব। ছুরী বার করে দড়ি কেটে ফলাটা খুলে ফেলে দিলেন জলে

স্টাব আর ফ্লাস্কের দড়িতে কিন্তু তখনো বাঁধা রয়েছে মবি ডিক। এবার বাকী জটের মাঝখানে ধেয়ে গেল মবি ডিক। প্রচণ্ড আকর্ষণে দু দিক থেকে দুখানা নৌকো ছিটকে এসে পড়ল পরস্পরের ওপর—ছিটকে পড়ল সবাই জলে।

মহা ফুর্তিবাজ স্টাব ঐ অবস্থাতেই গান গাইছে গলা ছেড়ে—সাঁতরাতে সাঁতরাতে ভাসমান বালতি, দাঁড়গুলো এক জায়গায় জড়ো করবার চেষ্টা করছে ফ্লাস্ক—মাঝে মাঝে লাথি মারছে জলে—হাঙরের ভয়ে।

বোট দুটোর সংঘর্ষ ঘটিয়েই কিন্তু ডুব দিয়েছিল মবি ডিক। নরওয়ের সুবিখ্যাত মেলস্ট্রম ঘূর্ণির মত ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করে নিমেষে তলিয়ে গেছে নীচে। জলে ভাসতে লাগল কেবল আহাবের নৌকোখানা।

আচমকা নৌকোটা ছিটকে গেল আকাশের দিকে—জল থেকে ঠেলে উঠল মবি ডিকের প্রকাণ্ড মাথা! জলের তলা দিয়ে এসে নির্ভুল লক্ষ্যে ঢু মেরেছে সে—আহাবের নৌকো পালকের নৌকোর মত উড়ে গেল অনেক উঁচুতে। পাকসাট খেতে খেতে এসে পড়ল জলে—সমুদ্র-গুহা থেকে যেভাবে সীলমাছ বেরিয়ে আসে, সেইভাবে উল্টো নৌকোর তলা থেকে বেরিয়ে এলেন আহাব এবং তাঁর সঙ্গীরা।

ধ্বংসযজ্ঞ এখনো যেন শেষ হয়নি—তাই ঈষৎ তফাতে গিয়ে পেছন ফিরে ফ্লুক দোলাচ্ছে মবি ডিক। স্পর্শ সচেতন ফ্লুকে ভাঙা দাঁড় কি ভাঙা কাঠ ঠেকলেই সঙ্গে শূন্যে ফ্লুক তুলে প্রচণ্ড বাড়ি মারছে তার ওপর। তারপর যেন হৃষ্টচিত্তে মরালছন্দে সরে গেল দূরে!

গতদিনের মতই জাহাজ এসে উদ্ধার করল আমাদের। আজকে আহাবের অবস্থা আরো খারাপ। স্টারবাকের কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কোন মতে—হাড়ের পা ভেঙে উড়ে গেছে।

ছুতোর মিস্ত্রী পায়ের অবস্থা দেখে বললে—"ফেরুলটা কিন্তু স্যার খুব মজবুত ছিল।"

"হ্যাঁ ছিল। পা ভাঙলেও আহাব এখনো মজবুত আছে। আঁচড় দেওয়ার ক্ষমতা সাদা তিমির নেই, মানুষের নেই, খোদ শয়তানেরও নেই। হেই! কোনদিকে যাচ্ছে মবি ডিক?"

"সোজা পাশের দিকে।"

"পাল তোলো। বাড়তি নৌকো ঠিক রাখো। মিঃ স্টারবাক! লোকজন জড়ো করো।"

"আগে আপনাকে সামলাই।"

"আমাকে? ক্যাপ্টেন আহাবকে ভাঙতে কেউ পারবে না। মিঃ স্টারবাক। দাও একটা বেত! ঐ ভাঙা কলমটাই দাও। ছাখো আমি ঠিক আছি। কেউ হারায় নি তো?"

লোকগণনা হল। দেখা গেল, একজন কম। ফেডাল্লা নেই।

স্টাব বললে—"ফেডাল্লা বোধহয় লাইনে—"

"খোঁজো! খোঁজো! সমস্ত জাহাজ খুঁজে এসো!"

কিন্তু জাহাজের কোথাও পাওয়া গেল না ফেডাল্লাকে।

স্টাব ফের বললে—"স্যার, আমি কিন্তু ওকে দেখেছি আপনার হার্পুনের লাইনে জড়িয়ে থাকতে।"

"আমার লাইনে! কোথায় আমার হার্পুন? মবি ডিকের গায়ে, না, জলে?" আহাব যেন অকস্মাৎ পাগল হয়ে গেলেন—"মবি ডিক! মবি ডিক! দরকার হলে দশবার পৃথিবী ঘুরব—কিন্তু তোকে ছাড়ব না!"

স্টারবাক আর সহ্য করতে পারলেন না। চীৎকার করে বললেন—"কি বলছেন কি স্যার? পুরো ছুটো দিন তাড়া করেছেন, প্রতিদিন নৌকো ভাঙছে—মরতে মরতে বেঁচে যাচ্ছেন, আজকে পা খুইয়েছেন—এখনও? আপনার ঘাড়ে শয়তান ভর করেছে।"

"স্টারবাক!" দাঁতে দাঁত পিষে বললেন আহাব—"মবি ডিক ছুদিন ভেসে থেকেছে—তৃতীয় দিনে সে ডুববে—চিরকালের মত ডুববে। কালকেই তার শেষ দিন। ডাকাবুকো সঙ্গী চাই, কে আছো?"

"আমি আছি।" চেঁচিয়ে বললে স্টাব। "আমি নিজেই আগুন। আগুন কাউকে ভয় পায় না।"

"শুধু আগুন নয়—তুমি যন্ত্রও বটে।" বিড় বিড় করে বললেন আহাব। লোকজনদের দিকে ফিরে বললেন উচ্চকণ্ঠে—"স্টারবাক সব কিছুর মধ্যে খারাপ লক্ষণ দেখছে। কিন্তু কাল আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব—লক্ষণগুলো শুভ কি অশুভ!"

রাত হল। মাথার টুপী চোখের ওপর নামিয়ে অতন্দ্র নয়নে জেগে দাঁড়িয়ে রইলেন আহাব।

## পিছু ধাওয়া—তৃতীয় দিন

ভোর হতেই রাতের লোককে নামিয়ে আনা হল মূল মাস্তুলের ডগা থেকে।

তিন মাস্তলের মাথায় উঠল তিনজন, এমন কি রেলিংয়ের ওপর দাঁড়িয়ে গেল অনেকে, ঝুলতে লাগল দড়িদড়া ধরে।

"দেখতে পেয়েছো?" নীচ থেকে হাঁক দিলেন আহাব।

কিন্তু না, এখনো আবির্ভূত হয়নি শরীরী রহস্য মবি ডিক।

দেখতে দেখতে দুপুর হল। আবার হাঁক দিলেন আহাব। আবার সেই জবাব—"মবি ডিক এখনো অদৃশ্য।"

"এখনো দেখা যায়নি? সূর্য পশ্চিমে যেতে বসেছে! আহা! বুঝেছি! কি বোকা আমি! তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে এসে ওকে ছাড়িয়ে এসেছি! আগে বোঝা উচিত ছিল! ওর গায়ে যে হার্পুন বিঁধে রয়েছে, দড়ি জড়িয়ে রয়েছে! তাড়াতাড়ি যাবে কি করে? কাল রাতেই ছাড়িয়ে এসেছি—আমাকেই এখন ও তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে! ফেরাও জাহাজ!"

বিপরীত দিকে ঘুরে গেল জাহাজের মুখ- হাওয়ার মুখোমুখি অতি কষ্টে এগিয়ে চলল ফেলে আসা সাদা জলরেখা বরাবর।

স্টারবাক বললেন নিজের মনে—"হাওয়া ঠেলে চলেছে খোলা চোয়ালের মধ্যে। প্রথম দিন মার খেয়েছে সকালে, দ্বিতীয় দিন দুপুরে—তৃতীয় দিন খাবে বিকেলে।"

হেঁকে উঠলেন আহাব—"স্টারবাক। টেনে তোলো মাস্তলের মাথায়।"

"আই, আই, স্যার।" পাটের বাস্কেটসমেত আহাবকে দাঁড় টেনে মাস্তলের ডগায় তুলে দিলেন স্টারবাক।

গেল পুরো একটি ঘণ্টা। সময় নিজেও যেন এখন রুদ্ধশ্বাসে এগিয়ে চলেছে। এবারও সবার আগে মবি ডিককে দেখলেন বুড়ো আহাব—তারপরেই চীৎকার করল মাস্তলের ডগা থেকে তিনজন।

"মবি ডিক! মবি ডিক! বার বার তিন বার—এবার দেখি যাস কোথা! স্টারবাক, লোকজন তৈরী রাখো। না, এত তাড়াতাড়ি নৌকো নামাতে হবে না। মবি ডিক এখনো অনেক দূরে। সমুদ্রের চেহারা কি সুন্দর দেখেছো? নানটাকেটের সমুদ্রও এখন এই রকম!"

যথা সময়ে নামানো হল তিনখানা নৌকো। ডেক থেকে নামবার আগে চীফ মেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আহাব।

"স্টারবাক!"

"স্যার?"

"এই তৃতীয় বার আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে জাহাজ থেকে।"

"আই, আই, স্যার।"

"অনেক জাহাজ বন্দর ছেড়ে যায়, আর ফেরে না!"

"সত্যি স্যার। বড় নিষ্ঠুর সত্যি।"

"কেউ মরে স্রোতের টানে, কেউ ভাঁটায়, কেউ জোয়ারে। কিন্তু আমি নিজেই যেন একটা ঢেউ—এই কবরখানার একটা কবর। বুড়ো হয়েছি, স্টারবাক। এসো, করমর্দন করো।"

হাতে হাত মিলল দু-জনের—চোখে চোখ। স্টারবাকের অশ্রু আঠার মতো বেঁধে রাখল চারটি চোখকে।

"ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন! আপনি এত মহান—কিন্তু কেন যাচ্ছেন? দেখছেন না আমার মত ডানপিটেও কাঁদছে?"

"নেমে পড়ো সবাই।" এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন।

নিমেষ মধ্যে তিনখানা নৌকো তিনখানা তীরের মত জল কেটে ছুটে গেল সামনে।

আচম্বিতে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে—"হাঙর! হাঙর! ক্যাপ্টেন! ফিরে আসুন! ফিরে আসুন!"

এ সেই পিপ। পাগল হয়ে যাবার পর দয়ালু ক্যাপ্টেন তাকে নিজের কেবিনে রেখে দিয়েছিলো।

পিপ কিন্তু ঠিকই দেখেছে। কোত্থেকে দলে দলে হাঙর ঘিরে ধরেছে আহাবের নৌকো। শুধু আহাবের নৌকো—আর কারো নৌকো নয়। লাফ দিয়ে কামড়ে ধরছে দাঁড়। দৃশ্যটা নতুন কিছু নয়। তিমির পেছনে ধাওয়া করলে অনেক সময়ে হাঙররা সঙ্গে যায়—যেভাবে ডাঙায় আগুয়ান সৈন্যদলের মাথার ওপর উড়ে যায় শকুনি গৃধিনীর দল।

কিন্তু আশ্চর্য হতে হল এই ক্ষেত্রে! আগের দুবার মবি ডিককে তাড়া করেছি—কিন্তু একবারও তো হাঙররা নামে নি। এখন এল কেন? অন্য দুটি নৌকোকে ছেড়ে দিয়ে শুধু আহাবের নৌকোই ছেঁকে ধরেছে কেন? কেন টুকরো টুকরো করে কেটে নিয়ে যাচ্ছে—দাঁড়ের অংশ? দাঁড়িরা ভয় পাচ্ছে, এ ভাবে কাঠ কেটে নিলে দাঁড়ের আর থাকবে কি? কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই আহাবের—কিছুতেই রুদ্ধ হবে না তাঁর অগ্রগতি। অপার্থিব ভাষায় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন সঙ্গীদের রক্তে—হত্যালালসায় বুঁদ করে দিচ্ছেন প্রত্যেককেই।

জাহাজের ডেক থেকে আশ্চর্য এই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলেন স্টারবাক। মন বলল—সব শেষ হতে চলেছে! ভেতরটা গুঙিয়ে উঠল স্ত্রীর জন্যে, পুত্রের জন্যে।

নৌকোগুলো বেশীদূর যাওয়ার আগেই মাস্তলের মাথা থেকে হাত নেড়ে আহাবকে জানিয়ে দেওয়া হল—ডুব দিয়েছে মবি ডিক। আবার শুরু হবে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড!

পাগলের মত হেসে উঠলেন আহাব—"হাঃ হাঃ হাঃ! কিরে ঢেউ? কোথায় যাস? মরতে? তোর কফিন পর্যন্ত নেই! আমার মৃত্যু? সে তো দড়ির ফাঁসে—হাঃ হাঃ হাঃ!"

আচম্বিতে আশপাশের জল ফুলে উঠতে লাগল আস্তে আস্তে। জলতল থেকে যেন ঠেলে উঠছে বরফ-পাহাড়। একটা গুড়-গুড় ধ্বনি শোনা যাচ্ছে—পাতাল থেকে গুম-গুম শব্দ ভেসে আসছে যেন মর্ত্যে। দমবন্ধ করে বসে রইল সকলে।

দড়িদড়া জড়ানো হার্পুন আর বর্শা গাঁথা একটা বিশাল দেহ লম্বালম্বিভাবে উঠে গেল শূন্যে—পরমুহূর্তে জলপ্রপাত নির্ঘোষে আছড়ে পড়ল ঢেউয়ের ওপর—তিরিশ ফুট উর্ধ্বে ছিটকে গেল জল, ফেনা, বুদবুদ। যেন ননীমাখা দুধ ভাসতে লাগল আশেপাশে—বাষ্পময় কুয়াশায় আবৃত রইল বিশাল দেহটা।

"চালাও!" হাঁক দিলেন আহাব। তিনখানা নৌকোই একযোগে ছুটে গেল হার্পুন উচিয়ে! কিন্তু গতকালের বল্লমাঘাতে ক্ষিপ্ত মবি ডিক নিজেই তেড়ে এল উল্কাবেগে—যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল নৌকাগুলোর ওপর। ল্যাজের ঘায়ে জখম হয়ে উল্টে গেল দুখানা নৌকো—দড়িদড়া কাঠকুটো ভাসতে লাগল ঢেউয়ের মাথায়—অক্ষত রইল কেবল আহাবের নৌকো।

ড্যাগ্‌গু আর কুঈকোয়েগ ভাঙা তক্তাগুলো জড়ো করছে, এমন সময়ে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে জ্যামুক্ত শায়কের মত ছিটকে বেরিয়ে এল মবি ডিক—আতঙ্ক চীৎকারটা শোনা গেল ঠিক তখনি। আর্ত হাহাকার ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে ভেসে গেল দূর হতে দূরে।

মবি ডিকের দড়িদড়ার জটে জড়িয়ে আছে ফেডাল্লার মৃতদেহ। মুখটা আহাবের দিকে ফেরানো—ড্যাবডেবে চোখ দুটো ওঁর প্রতিই নিবদ্ধ। যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে প্রথম ভবিষ্যদবাণীটা—যার ওপর মানুষের হাত নেই!

"ফেডাল্লা! ফেডাল্লা! এই দৃশ্যই কি তুই বলতে চাস নি? আরও একটা ভবিষ্যদবাণী বলিসনি—সেটা কি? সেটা কি?—মেট, তোমরা ফিরে যাও জাহাজে। ঐ নৌকো নিয়ে আর যাওয়া যায় না। যদি পারো, মেরামত করে নাও। আহাব একাই যাবে মরতে! কেউ পালাবে না এ নৌকো থেকে—যে ঝাঁপ দেবে জলে, এই হার্পুন দিয়ে তাকে গাঁথব! তোরা কেউ আলাদা নস—আমার হাত আমার পা!—কোথায় তিমি? আবার ডুব দিয়েছে?"

মবি ডিক কিন্তু ফেডাল্লার লাশ পিঠে নিয়ে এগিয়ে গেল সামনে—জাহাজের পাশ দিয়ে তীর বেগে ছুটে গেল যে পথে যাচ্ছিল সেই পথেই।

"আহাব!" চীৎকার শোনা গেল স্টারবাকের—"দোহাই আপনার! যাবেন না! দেখছেন না, ওর ভ্রূক্ষেপ নেই আপনার দিকে? আপনিই পাগল হয়েছেন ওকে মারবার জন্যে।"

পাল তুলে দিয়ে জাহাজের গা ঘেঁসে এগিয়ে গেল আহাবের নৌকো। যেতে যেতে আহাব দেখলেন, রেলিংয়ের ওপর ভর দিয়ে আকুলভাবে ঝুঁকে রয়েছে স্টারবাক। হুকুম দিলেন তাঁকে জাহাজ নিয়ে পেছন পেছন আসতে। একটু তফাতে। ওপরে তাকিয়ে দেখলেন—ট্যাশটেগো, কুঈকোয়েগ আর ড্যাগ্‌গু সাগ্রহে উঠছে তিনটে মাস্তলের মাথায়। ভাঙা নৌকো দুটো মেরামত করছে দাঁড়িরা। একটার পর একটা পোর্ট হোল বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে—দেখলেন স্টাব আর ফ্লাস্ক বর্শা আর হার্পুনের নতুন বাণ্ডিল খুলছে। কানে শুনলেন ভাঙা নৌকোর গায়ে পেরেক ঠোকার শব্দ—মনে হল যেন হৃদপিণ্ড ফুঁড়ে পেরেকগুলো বসে যাচ্ছে কফিনের গায়ে। হেঁকে বললেন ট্যাশটেগোকে ফের নেমে আসতে—একটা হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে উঠে যাক—নতুন একটা নিশান উড়িয়ে দিক মূল মাস্তলের মাথায়। আহাবের নিশান!

চালাকি করেই হোক কি তিন দিন একটানা তাড়া খাওয়ার ফলেই হোক, গতিবেগ শ্লথ হয়ে এল মবি ডিকের। এদিকে নাছোড়বান্দা হাঙরগুলো সামনে পেছনে লেগে রয়েছে। ঠুকরে ঠুকরে টুকরো কাঠ ভাসিয়ে দিচ্ছে জলে—দাঁড়ের আর কিছু রাখবে না ওরা।

"খবরদার! থামলেই হাঙর খাবে তোদের! টেনে যা—সমানে টেনে যা!"

"কিন্তু দাঁড় যে খেয়ে ফেলল!"

"থাক। তার আগেই পৌঁছে যাব।"

দেখতে দেখতে মবি ডিকের নাগাল ধরে ফেললেন আহাব। ছুটে চললেন পাশাপাশি—সরে এলেন আরো কাছে।—ফোয়ারার জলকণা-বাষ্প নৌকোয় এসে পড়ছে—যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে জেগে রয়েছে কুঁজের টিলা।

মবি ডিক কিন্তু সমস্ত দেখছে—অথচ গ্রাহ্য করছে না।

চলমান নৌকোয় উঠে দাঁড়ালেন আহাব, শরীরটা ধনুকের মত বেঁকিয়ে। হার্পুন নিয়ে এলেন পেছনে—পর মুহূর্তে ভীষণ কণ্ঠে অভিশাপ দিয়ে হার্পুন ছুঁড়ে দিলেন শ্বেত আতংকের গায়ে।

মবি ডিক পাশের দিকে তেউড়ে গেল; গড়িয়ে এল নৌকোর দিকে এবং ঢুঁ না মেরেই গলুইয়ের ওপর আছড়ে পড়ে কাৎ করে দিল নৌকো।

গলুইটা আঁকড়ে ছিলেন বলেই জলে ঠিকরে পড়লেন না আহাব—কিন্তু তিনজন দাঁড়ি আচমকা ধাক্কায় পড়ে গেল জলে। দুজন তৎক্ষণাৎ কিনারা ধরে উঠে এল ভেতরে—একজন অসহায়ভাবে সাঁতরাতে লাগল হাঙরদের মাঝে।

সেই মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড দৃশ্যের মধ্যে থেকে বন্দুকের গুলির মত ছিটকে বেরিয়ে গেল মবি ডিক—হ্যাঁচকা টান পড়ল হার্পুনের লাইনে। আহাব চেঁচিয়ে বললেন খুঁটির গায়ে দড়ি জড়িয়ে দিতে, চেপে ধরে রাখতে। কিন্তু আচমকা হ্যাঁচকা টানে বিশ্বাসঘাতক দড়ি পটাং করে ছিঁড়ে গেল শূন্যপথে!

"চুলোয় যাক দড়ি!" হাঁক দিলেন আহাব—"নৌকো নিয়ে তাড়া কর পেছনে।"

ঝপাঝপ শব্দে দাঁড় ফেলে নৌকো এগিয়ে আসছে দেখে ঘুরে দাঁড়াল মবি ডিক—ঠিক তখনি তার চোখের পর্দায় ভেসে উঠল নৌকোর পেছনেই জাহাজের চেহারা। পলকের মধ্যে কুটিল বুদ্ধি দিয়ে বুঝল—যত উৎপাতের মূল ঐ জাহাজ। শত্রু ঐ জাহাজ। তাই নিমেষে নৌকোর পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে কামড়ে ধরল জাহাজের সামনের গলুই।

জলোচ্ছ্বাসের ফলে আহাব অন্ধ হয়েছিলেন—"কি হল? এত অন্ধকার কেন?"

"জাহাজ কামড়াচ্ছে মবি ডিক!" আর্ত কণ্ঠে বলল দাঁড়িয়া।

"চালাও নৌকো জাহাজের দিকে! বাঁচাও! জাহাজটাকে বাঁচাও!"

কিন্তু দুরন্ত ঢেউ ঠেলে খানিক যেতে না যেতেই মবি ডিকের মারাত্মক কামড়ে খসে এল দুখানা তক্তা—হু-হু করে জল ঢুকতে লাগল ভেতরে—ভাঙা নৌকোখানা ছিল সেইদিকেই—তাড়াতাড়ি খালাসীরা সেই নৌকোটাই ফুটোর মুখে ঠুসে ধরে চেষ্টা করল জল আটকানোর।

মূল মাস্তলের মাথায় হাতুড়িটা উঁচুতে তুলে পাথর হয়ে গেল ট্যাশটেগো—নিশানটা জড়িয়ে রইল তার লালদেহ। পাথর হয়ে গেল জাহাজের প্রত্যেকে—মুঠোয় রয়ে গেল বর্শা, হার্পুন; ছুটে এল যে যার জায়গা থেকে—নিঃসীম আতংকে দেখল ফের ছুটে আসছে মবি ডিক!

আসছে মূর্তিমান আতংকর মত—চিরন্তন জিঘাংসার মত। সারা অবয়ব হতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নারকীয় প্রতিহিংসা, কুঞ্চিত ললাটে প্রকট হয়েছে সীমাহীন হিংস্রতা। সে আসছে···আসছে···আসছে! জল তোলপাড়

করে আসছে। চলার পথে গ্রাহ্য নেই কোনো কিছুর দিকে। তারপরেই বিশাল সাদা মাথাটা দুরমুষের মত গুঁড়িয়ে দিল জাহাজের তলদেশ—মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ল, কাঠের বরগা ছিটকে গেল; প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সত্ত্বেও মাস্তুলের মাথা আঁকড়ে বসে রইল তিন হাপুনার। ভাঙা জায়গা দিয়ে ভীমগর্জনে জল ঢুকে পড়ল খোলের মধ্যে—যেন পাহাড় থেকে প্রপাত নামছে অট্টহেসে।

বুকফাটা চেঁচিয়ে উঠলেন আহাব—"গেল! গেল! জাহাজটাও গেল! ফেডাল্লা! এই কি তোর না-বলা ভবিষ্যদ্বাণী? জাহাজের কাঠ তো আমেরিকার মাটিতেই জন্মেছে!"

নিমজ্জমান জাহাজের তলা দিয়ে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল মবি ডিক। কিন্তু জল থেকে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়াল: আহাবের নৌকোর গজকয়েক দূরে।

পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠে বল্লম নিক্ষেপ করলেন আহাব। ছেঁদার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎরেখার মত ছুটে গেল লাইন। পাছে দড়ি জড়িয়ে যায়, তাই হেঁট হয়ে দড়ি সিধে করে দিলেন উনি। কিন্তু শূন্যপথে দড়িটা পাকসাট খেয়ে ফাঁসের আকারে চেপে বসল তাঁর গলায় এবং টেনে নিয়ে গেল নৌকো থেকে—দাঁড়িরা কিছু বোঝবার আগেই উনি তলিয়ে গেলেন জলে। দড়ির শেষপ্রান্তে বাঁধা ভারী কাঠটাও একজন দাঁড়িকে ঠিকরে দিয়ে ছিটকে গেল নিমেষে।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল দাঁড়িরা। জাহাজ কোথায়? একটা ভৌতিক কলেবর দেখা গেল কিছুদূরে—কাৎ হয়ে ডুবে যাচ্ছে পিকুঅড। জলের ওপরে এখন জেগে রয়েছে কেবল তিনটে মাস্তুল আর তিনজন পৌত্তলিক; শেষ কর্তব্য সাধনে অনড় তারা—অচঞ্চল চাহনি নিবদ্ধ সমুদ্রের ওপর। আচমকা ঘূর্ণবর্তে গিয়ে পড়ল শেষ নৌকোখানিও। ভাসমান বর্শার হাতল, দাঁড়, দাঁড়ি, জীবন্ত, মৃত, সব কিছু এমনকি শেষ কাঠের কুচোটিও আপন গর্ভে টেনে নিয়ে শেষ ডুব দিল পিকুঅড।

মূল মাস্তুলটা ডুবল সবার শেষে। মাস্তুলশীর্ষে নিশান জড়ানো একটা মানুষ লাল হাত বাড়িয়ে উঁচু করে রইল সেই হাতুড়িটা। একটা সামুদ্রিক-বাজ অত উঁচু থেকেও যেন ব্যঙ্গচ্ছলে ঘুরতে ঘুরতে নামছিল মাস্তুলের সঙ্গে—আচমকা ডানার ঝাপটা মারল হাতুড়ির ওপর—তৎক্ষণাৎ যেন শিউরে উঠে ঠিকরে গেল দূর গগনে। বিকট চেঁচিয়ে বিলীন হল আকাশে।

কর্কশ চীৎকার করে জলকূপের ওপর উড়তে লাগল কয়েকটা স্ফুদে ফাউল। সাদা ফেনা নাচতে লাগল ঘূর্ণাবর্তের কিনারায়। তারপর সশব্দে ভেঙে পড়ল

আবর্ত—বিরাট বিরাট ঢেউ দুলতে লাগল [illegible] গুমরিয়ে—আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে যেভাবে দুলেছিল, ঠিক সেইভাবে।

## উপসংহার

নাটক শেষ। শুধু একজন বেঁচে গিয়েছিল এই রুদ্রলীলার মধ্যে থেকেও।

সে আমি। ফেডাল্লার শোচনীয় মৃত্যুর পর তার জায়গায় গিয়ে আহাবের নৌকোয় বসতে হয়েছিল আমাকে। নৌকো ডুবে গেলেও ডোবা জাহাজ থেকে একটি বস্তু উঠে এল আমার পাশে—সেই কফিন লাইফবয়টা। তার ওপর পুরো একটা রাত আর একটা দিন কাটালাম আমি। হাঙররা খেলা করতে লাগল আশেপাশে—ফিরেও তাকাল না। তারপর নিখোঁজ ছেলেদের খুঁজতে খুঁজতে র‍্যাচেল এসে পেল আর একজন অনাথকে।

আমিই সেই অনাথ। আহাবকে যে আমি বাবার মতই শ্রদ্ধা করেছিলাম।

---

# রহস্যভেদী শার্লক হোমস

শার্লক হোমস ...নে গা ছম ছম রহস্যের সোনার খনি। মুখে পাইপ, ঈষৎ কৃশ, তীক্ষ্ণ নাসার ঐ বুদ্ধিদৃপ্ত গোয়েন্দাটি যে কোন দুর্বার রহস্যজাল ছিঁড়ে ফেলেন নিজের চাতুরীতে। জমাট কুয়াশা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে উজ্জ্বল রৌদ্র।

বন্ধু ওয়াটসনের জবানবন্দীতে লেখা স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের অনবদ্য কাহিনীর এক সংকলন রহস্যভেদী শার্লক হোমস।

প্রতিটি গল্পে আছে শিহরণের সহস্র উপাদান, রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার অন্তিমে নিখাদ পরিণতি। পাঠকদের অনুভূতির জগতে প্লাবন তুলবে, পরিশেষে আনবে রসোত্তীর্ণ কাহিনী পড়ার অনাস্বাদিত তৃপ্তি।

# শার্লক হোমস প্রসঙ্গে

বিশ্বসাহিত্যের জনপ্রিয়তম চরিত্রগুলোর মধ্যে নিজের স্থান ক নেবার স্পর্ধা রাখেন যে মানুষটি, লণ্ডনের বেকার স্ট্রীটের সেই কিং দম্ভীর গোয়েন্দা নায়কটির নাম শার্লক হোমস।

কলমের জোরে তাঁর মত অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা আর কোন চরিত্র পেয়েছেন কি না সন্দেহ। শার্লক হোমস নামটির মধ্যে ছোঁয়ানো আছে যাদুদণ্ড, তাই তিনি জাত-কাল-ভাষার উর্দ্ধে বিশ্বের সমস্ত রসিক পাঠকের মনের সিংহাসনে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে বসে আছেন।

শার্লক হোমসের জন্মদাতা স্যার আর্থার কোনান ডয়েল। আজ নিজের তৈরী চরিত্র তাঁকে অনেক পেছনে রেখে ছুটে গেছে অমরতার দিকে। সাধারণ পাঠক পাঠিকার কানে কোনান ডয়েলের থেকে শার্লক হোমস লোকটি অনেক বেশী পরিচিত।

বিশ্বসাহিত্যে গোয়েন্দা কাহিনীর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ভলতেয়ারের 'জাদিগে' তারপর শক্ত লেখনী নিয়ে এলেন এডগার অ্যালান পো। মূলতঃ কবি হলেও অ্যালান বেশ কটি উঁচুমানের রহস্য কাহিনী রচনা করেছেন।

পো'র পরে গোয়েন্দা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে এগিয়ে আসেন আয়ারল্যাণ্ডের এক ডাক্তার, নাম তাঁর আর্থার কোনান ডয়েল।

১৮৮৭ সালে A Study in Scarlet উপন্যাসে আগামী দিনের বিস্ময় জাগানো ঐ মহান গোয়েন্দার আবির্ভাব ঘটল। এতদিনের একঘেয়ে চরিত্র চিত্রনের পাশে এ যেন ধারাল তরবারির আঘাত। প্রাচীন পন্থীরা শিউরে উঠলেন, আঠাশ বছরের এক বেপরোয়া যুবকের দুঃসাহসী কলম সৃষ্টি করেছে ঐ অসাধারণ গোয়েন্দাটিকে।

তারপর একে একে আত্মপ্রকাশ করল কালজয়ী অনেক রচনাবলী।

প্রথম উপন্যাসে আমরা দেখতে পেলাম যে শার্লক হোমসের অফিস হল ২২১ বি বেকার স্ট্রীটে। তিনি গোয়েন্দা হলেও সময়ে অসময়ে ভায়োলিন বাজান, কোকেন দিয়ে নেশা করেন আর ডুবে যান তাঁর বিরাট লাইব্রেরীতে।

হোমসের পাশাপাশি আর একটি চরিত্রকে উপস্থাপিত করা হল। তিনি হলেন হোমসের সহকারী ও তাঁর সমস্ত কাহিনীর কল্পিত লেখক ডাক্তার ওয়াটসন। সরল মনের এক কৌতুহলপ্রিয় বন্ধুর ভূমিকাতে তাঁকে দেখা গেল। অনেকের মতে উনি হলেন ছদ্মনামের আড়ালে স্বয়ং কোনান ডয়েল। কেননা স্বভাবে ও চেহারাতে দুজনের দারুণ মিল।

Study in scarlet—এ আমরা দুজন বৃটিশ পুলিশকে দেখতে পাই। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ঐ দুই পুলিশের নাম লেসট্রেড ও গ্রেনসন।

১৮৮৭ সালে Christmas Annual পত্রিকাতে ঐ উপন্যাসটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। বলা যেতে পারে ওটি হল গোয়েন্দা হিসেবে শার্লক হোমসের প্রথম প্রকাশ। ঐ সংখ্যাতে কাহিনীর সঙ্গে ছবি এঁকেছিলেন সিজনী প্যাজেট। শিল্পীকেও ধন্যবাদ দেওয়া উচিত, কেননা তাঁর তুলিতেই কোনানের কাল্পনিক চেহারা প্রাণ পেয়েছে।

প্রথম উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। আগ্রহী পাঠকমনের রুচী মেটাতে তিন বছর বাদে ১৮৯০ সালে দ্বিতীয় শার্লক হোমস উপন্যাস 'The sign of Four' প্রকাশিত হল। এর পর থেকে কোনান ডয়েল ডাক্তারী ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরিভাবে লেখাতে আত্মনিয়োগ করলেন।

পরের বছর Strand পত্রিকাতে Scandal in Bohemia ও আরো ছটি হোমস কাহিনীর প্রকাশ ঘটে। তখন থেকেই শার্লক হোমসের খ্যাতি আকাশচুম্বী।

এখানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করতে হচ্ছে। ঔপন্যাসিক হিসেবে কোনান ডয়েল কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে চান নি। কালের আবর্তনে আজ তিনি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রহস্য সাহিত্যিক, তবে তাঁর একমাত্র ইচ্ছে ছিল ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে কালজয়ী হওয়া।

তিনি একাধিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচয়িতা, যার মধ্যে The White Company, The Refugees ও Sir Nigel প্রধান। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৃটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইনসটন চার্চিলের মতে ঐগুলো হল তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। ফরাসীদের সঙ্গে জার্মানদের যুদ্ধের পটভূমিতে তিনি গ্যেটে মলিয়ের যুদ্ধতত্ত্ব উজাড় করে দিয়েছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ছাড়াও কোনান ডয়েল ইতিহাস নিয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন, এর মধ্যে আছে বোরের যুদ্ধ ও প্রথম মহাযুদ্ধের ছয় খণ্ডের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

অ্যাডভেঞ্চার থ্রিলারেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বিজ্ঞানকে সামনে রেখে কখানি অনবদ্য উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে আছে The Maracot Deep, The Lost World, Poison Belt ইত্যাদি।

গোয়েন্দা কাহিনী লেখা থেকে অবসর নেবেন বলে কোনান ডয়েল তাঁর সৃষ্ট শার্লক হোমসকে অকালে মেরে ফেললেন। তাঁর গল্পে দেখা গেল যে হোমস তদন্ত করতে গিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের রেইখেন বাখ জলপ্রপাতে মারা গেছেন।

হোমসের মৃত্যুতে যেন ক্ষেপে উঠল হোমস প্রিয় পাঠকেরা। টেলিফোনে বিব্রত হলেন ডয়েল, চিঠির স্তূপ তাঁকে একাধারে বিরক্ত ও উৎসাহী করে তুলল।

অবশেষে ১৯০২ সালে জনতার তাগিদে আবার ফিরে এলেন মহানায়ক শার্লক হোমস। যে উপন্যাসে তাঁর রাজকীয় প্রত্যাবর্তন তার নাম The hound of Baskervill, অনেকে বলেন এটি হল ডয়েলের শ্রেষ্ঠতম রচনা।

জলাভুমির রহস্য তন্ময়তা, রোমাঞ্চকর মৃত্যু, কুকুরের শিহরিত চীৎকার আর ঘটনার রুদ্ধশ্বাস গতি এটিকে বিশ্বসাহিত্যের সম্পদ করেছে।

এর পরে আবার সক্রিয় হলেন শার্লক হোমস, স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের মানসপুত্র ঐ হোমসের মৃত্যু ঘটে ডয়েলের জীবনাবসানে। তবে তাঁর মৃত্যুর পরে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করবার দায়িত্ব তুলে নেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র আদ্রিয়ান কোনান ডয়েল ও উনষাটখানি সুখপাঠ্য গোয়েন্দা কাহিনীর সম্মানিত লেখক জন ডিকসন কার।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলে রাখি। ওয়াটসন চরিত্রে যেমন লেখকের নিজের ছায়া পড়েছিল তেমন ভাবে শার্লক হোমসের অন্তরালে ছিলেন কোনান ডয়েলের শিক্ষক ডক্টর জোসেফ বেল।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ স্কটিশ চিকিৎসকের অধীনে তিনি এম. ডি. করেন। আত্মজীবনীতে স্যার কোনান ডয়েল ডক্টর জোসেফ বেলের উল্লেখ করেছেন একাধিকবার।

ক্লিনিকে কোন রোগী এলে ডক্টর জোসেফ বেল তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেন। কারোকে হঠাৎ বলে বসতেন—তুমি কি জুতো সেলাই করো?

হতবাক লোকটির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে ছাত্রদের বোঝাতেন, ভাল করে দেখো, রোগীর ট্রাউজারের হাঁটুর কাছে ভেতরের দিকে ছেঁড়া, কারণ তার হাঁটু ল্যাপষ্টোনের সঙ্গে সর্বদা ধাক্কা খায়।

আবার কাউকে দেখেই বলেন, কোটের ভেতরের পকেটে মদের বোতল এনেছো কেন?

এমনই তীব্র ছিল তাঁর চোখের দৃষ্টি আর স্বচ্ছ ছিল তাঁর বিচার বুদ্ধি। ডক্টর বেল বলেছেন যে মেডিক্যাল ডায়াগোনেসিসের কাজে ঐ প্রখর বুদ্ধি ও কিছুটা কল্পনা শক্তির প্রয়োজন অসামান্য।

ডক্টর বেলের অজান্তে তাঁরই এক মনোযোগী ছাত্র আর্থার মনে মনে তাঁকে বসালেন গোয়েন্দার আসনে। হোমস এমন ভাবে জন্ম নিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধ ক্লাস রুমে।

পরবর্তী কালে আমরা ডক্টর জোসেফ বেলকে দেখতে পেলাম। নাম বদল হলেও চেহারা কিন্তু পাল্টান হয় নি। বেলের মত হোমসও ছিলেন তীক্ষ্ণ চোখের ঈগল নাকের ও ধারালো চিবুকের পুরুষ। তবে কোকেনের নেশাটা হোমসের একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। ডক্টর বেলের অমন কোন নেশা ছিল না।

এমনভাবে কিছুটা সত্যি আর কিছু কল্পনার সমন্বয়ে জন্ম নিলেন শার্লক হোমস। কোনান ডয়েলের মৃত্যুর পরে অর্ধ শতাব্দী কেটে গেছে, সাহিত্যের আকাশে একে একে আবির্ভূত হয়েছেন অনেক দুর্বার দুরন্ত গতির গোয়েন্দা লেখক, প্রাচীন পন্থী বিশ্লেষণের ধারা গেছে বদলে, স্পাই থ্রীলার, চিলার, হরর অথবা সায়েন্স ফিকশনের নব নব দিগন্তে চলেছে অন্বেষণ, তবুও অমলিন ঐ শার্লক হোমস, কালের পর কাল যিনি উত্তীর্ণ হবেন নিজের জনপ্রিয়তায়।

তাঁরই সঙ্গে অমরত্ব পাবেন অমর স্রষ্টা স্যার আর্থার কোনান ডয়েল। এই গ্রন্থে পরিবেশিত হল তাঁর কয়েকটি অনবদ্য রহস্য কাহিনী, যারা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পেতে পারে।

॥ এক ॥

দিনটা এমন ভাবে শুরু হয়েছিল।

সকাল থেকেই আকাশে ছিল না উজ্জ্বল সূর্য, মলিন কুয়াশা যেন ঢেকে রেখেছে গোটা শহরটাকে। দুপুরের মধ্যেই ঈষৎ কালো অন্ধকারের ওড়নার তলে কেমন এক সলাজ গৃহবধূর মত সেজেছে নগরী।

পথে লোক চলাচল এসেছে কমে, কটি দ্রুত ধাবমান মোটর চলেছে বিশেষ কোন কাজে, এছাড়া কোথাও ব্যস্ততা নেই।

বিকেলটা নেমে এল ক্লান্তি নিয়ে। সূর্যটা তো সকাল থেকেই ছিল বিবর্ণ, এখন বিকেলে তাকে আরোও মলিন মনে হল।

তারপর কখন টুপ করে খসে পড়ল বিকেল বেলা। ঘন অন্ধকারে ছেয়ে নেমে এল ,কাজল কালো সন্ধ্যা।

বৃষ্টি নেই, যে কোন মুহূর্তে ঝড় উঠতে পারে। ছমছম করছে প্রকৃতি।

কাজের চাপ ছিল না, একাই বসে আছি। পুরোনো দিনগুলো মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। অনেক মধুর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ঐ দিনগুলো।

প্রিয় বন্ধু হোমসের কত কাহিনী মনে পড়ে—

আমি ষ্টাডিতে এলাম। বইয়ের র‍্যাকের আড়ালে রয়েছে আমার পুরোনো ডাইরীটা।

আমি ডাইরীটাকে বের করলাম।

অনেক ঘটনা ওখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হোমসের ক্ষুরধার বুদ্ধির চাতুরীতে বোমকর অনেক রহস্য জালের আবরন হল উন্মোচিত।

দেখতে দেখতে একটা তারিখে আমার চোখ আটকে গেল।

১৬ই নভেম্বর, ১৮৮৭, বুধবার সন্ধ্যেবেলা। ঐদিন একটা অদ্ভুত কেস এল আমাদের হাতে! কেসটা প্রথম থেকেই এমন আশ্চর্য যে আমরা হতবাক হয়ে গেলাম।

একটি লোক ঘড়ি দেখলেই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলে। ঐদিন হোমস সর্বপ্রথম সেই লোকটার সন্ধান পেল। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ উৎসাহী হয়ে পড়ে সে।

অনেক দিন আগে কোথায় যেন লিখেছিলাম যে ঐ ঘটনার কথা আমার একটু একটু মনে আছে, কেননা ওটা ঘটেছিল আমার বিয়ের ঠিক পরে। এমনও হয়তো লিখে থাকতে পারি যে বিয়ের পরে অনেকদিন হোমসের সঙ্গে দেখা হয় নি আমার। পরের বছর মার্চে হোমসের সঙ্গে দেখা হল।

পাঠক পাঠিকারা আমার ক্ষীণ স্মৃতি শক্তির জন্যে আমাকে যেন ক্ষমা করে নেন। কেননা ঘটনাবলীর চাইতে কাহিনী বিন্যাসে আমার উৎসাহ বেশী।

বিয়ের কয়েক সপ্তাহ বাদে বিশেষ কাজে আমার স্ত্রীকে লণ্ডন ত্যাগ করতে হয়েছিল। সে যায় অবশ্য মাত্র ক'দিনের জন্যে। ঐ ঘটনার সাথে আমার ভবিষ্যত সৌভাগ্যের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।

স্ত্রী যাবার পরে বাড়ীটাকে আমার অসহ্য মনে হল। আমি হাজির হলাম বেকার স্ট্রীটে আমার পুরোনো বন্ধু হোমসের অফিসে। শার্লক

হোমস আমাকে তার নিজস্ব ভঙ্গিমাতে স্বাগত জানাল। ওর আচরণে কোন উচ্ছ্বাস ছিল না। আমি তো হোমসকে চিনি, তার স্বভাব বরাবরই চাপা ধরনের।

আমাদের কথাবার্তা বিশেষ কিছু হল না। সামান্য কিছু কথা বলেছি আমরা।

বিশ্রি একঘেয়ে দিনটা বড় মন্থরভাবে শেষ হতে চলেছে। চারিদিকে শুধু তুষার। সমস্ত সকালটা বাদামী হলুদ কুয়াশা যেন বুকে চেপে বসেছিল। রাস্তায় আলো আর গ্যাসবাতিগুলো আবছা মনে হচ্ছে। ঘোলাটে দেখতে লাগছে ঘর বাড়ীগুলো।

মেজাজটা ভাল ছিল না শার্লক হোমসের। গম্ভীর মুখে ও বসেছিল ওর হেলানো চেয়ারে। পরণে আছে কালচে রঙের ড্রেসিং গাউন, মুখে একটা চেরী কাঠের পাইপ, খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে এক আধটা তীক্ষ্ণ মন্তব্য আমার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

আমি কোন জবাব দিচ্ছিলাম না। আমাদের সংলাপগুলো তাদের তীক্ষ্ণতা হারাচ্ছে।

কি ব্যাপার, কিছু খুঁজে পেলে না?

আমার প্রশ্ন।

—না হে! সেই কুখ্যাত ব্লেসিংটনের ব্যাপারটাব পর থেকে জীবনটা একদম বাজে মনে হচ্ছে।

—অত উত্তেজিত হয়ে পড়ো না? এ বছরটায় একের পর এক কত উত্তেজিত কেস আমাদের হাতে এসেছে, একবার মনে করে দেখোতো।

আমি হোমসকে বলেছিলাম। ওর নেভানো উত্তেজনাটাকে বাড়িয়ে দিলাম।

—তুমি আর ও কথা বলো না ওয়াটসন। বিয়ারের বোতলটা খেয়ে অমন বোকার মত দেখছ কেন?

—তার মানে?

আমি উঠে বসি, বলি, তুমি কি ভাবছো যে আমি মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছি।

—না মদে নয়, আজকের খবরের কাগজে কিছু খবর আছে।

হোমস আমার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখের কোনে হাসি তুলে দিল।

আমি ওর কথার মানে বুঝতে পারলাম না।

হয়তো নতুন কোন রহস্যের গন্ধ পেয়েছে সে।

—না, আমি দেখিনি। আমি বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালটা দেখেছিলাম—

—এই শোনো—

আমার কথায় কান না দিয়ে হোমস বলে—আগামী বছরের রেসের খবর দিয়েছে পাতার পর পাতা জুড়ে। কোন ঘোড়াটা কার আগে ছুটবে শুধু সেই চিন্তা। তাছাড়া অপর যেন কোন বিষয়ে মাথা ব্যথা নেই। এই যে নিহিলিষ্টরা গ্রাণ্ড ডিউক অ্যালেক্সীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছে তার কোন উল্লেখ নেই।

আমি হোমসকে বাধা দিলাম না। ওর আগ্রহটাকে আমি দমিয়ে দিতে চাই না।

ও বলে—একটা রহস্য বা মার্ডার কি দেশ জুড়ে কোথাও ঘটছে না? দেশটা কি নিরামিষ হয়ে গেল।

ঠিক তখনই বেল বেজে ওঠে। আমি চমকে উঠি।

—শুনতে পাচ্ছো না? বেল বেজেছে।

—হ্যাঁ, আওয়াজ শুনে বোঝা গেল যে আমাদের অতিথির বিশেষ ব্যস্ততা আছে।

আমরা দুজনেই বিরাট জানালাটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। নীচে বেকার স্ট্রীট। কুয়াশার আবরন কমে এসেছে। দরজার কাছে একটা শক্ত কাঠের গাড়ী দাঁড়িয়ে।

উর্দিপরা একটা উঁচু টুপীওলা লোক গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করছিল! পরিস্কার দেখতে পেলাম যে 'এম' অক্ষরটা হেলানো রয়েছে।

দূরাগত মর্মর ধ্বনির মত একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে এল, তারপর দ্রুত পদশব্দ সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বসবার ঘরের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল।

আমরা দুজনেই খানিকটা অবাক হয়ে গেলাম। কারণ যে ঢুকল সে একজন পুরুষ নয়, একটি মহিলা, মহিলা বলতে দ্বিধা লাগে, কেননা তার বয়েস সতেরো আঠারোর বেশী হবে না। সমস্ত মুখ জুড়ে তার অপার্থিব কমনীয়তা টল টল করছে, যেন পৃথিবীর কোন জটিলতা গ্রাস করে নি। এখনো কোন দুঃখের সঙ্গে পরিচয় ঘটে নি তার। আকাশনীল দুটি চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। ছোট্ট টুপীটার বাঁধন ভেঙে অবাধ্য বাদামী চুল নেমে এসেছে ঘাড় অবধি, যেন বন্দিনী থাকবে না তারা।

মেয়েটির পরনে বেড়াতে যাবার পোষাক, ওপরে একটা ডোরাকাটা ঘন লাল জ্যাকেট। দস্তানা পরা দুটি হাত, এক হাতে ঝুলছে ট্রাভেলিং কেস। ওটাতে কি যেন লেবেল আঁটা, তাতে স্পষ্ট লেখা আছে দুটি অক্ষর সি আর এফ।

মেয়েটির অন্য হাত আলতো ভাবে বুকের কাছে জড় করা।

—এমন ভাবে শব্দ না করে ঢুকে পড়েছি বলে মাপ করবেন—

মেয়েটির উদ্বেগ—আকুল চোখের নীল তারা এক লহমাতে আমাকে আর আমার বন্ধুকে ছুঁয়ে গেল। ওর গলার শব্দে মিষ্টি একটা পাখী যেন বন্য আবেগে ডেকে ওঠে!

—আপনাদের মধ্যে মিষ্টার হোমস কার নাম জানতে পারি কি?

মেয়েটি আবার বলে। তার চোখে কৌতুহলের ছায়া কাঁপতেই আমার বন্ধুটি মাথাটা ঝাঁকায়।

মেয়েটির চোখে নিরাপত্তা দেখা গেল।

—আমার নামই শার্লক হোমস আর এ হল আমার সহকারী ও বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসন।

—ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ যে আপনাদের বাড়ীতে পেয়েছি।

খুব তাড়াতাড়ি মেয়েটি বলে। তার সমস্ত আচরণে একটা এলো-মেলো ভাব ছড়ানো আছে।

—আমি আপনাদের যে খবরটা দিতে চাই—

কথাটা শেষ করতে পারল না সে। তার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়েছে লজ্জাঢাকা আভা। মেয়েটি মাথা নত করল। তার ভদ্রতা-বোধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। ঐ বয়েসের কিশোরী কন্যার কাছে এমন ব্যবহার অপ্রত্যাশিত।

শার্লক হোমস সৌজন্যের সঙ্গে মেয়েটির হাত থেকে ট্রাভেলিং কেসটা তুলে নিল। একটা চেয়ার ঠেলে দিল চুল্লীর কাছে। ঠাণ্ডাটা যেন আরও বেড়েছে।

—দয়া করে ঐ চেয়ারে ভালোভাবে বসুন।

চেরী কাঠের পাইপটা ঠোঁটে তুলে নিয়ে হোমস আন্তরিকতা ভরা গলাতে বলে।

—অনেক ধন্যবাদ মিষ্টার হোমস।

শঙ্কিত ভাবে চেয়ারের মধ্যে প্রায় ঢুকে গিয়ে মেয়েটি কৃতজ্ঞতা চোখে তাকাল।

—সবাই বলে আপনি নাকি মানুষের মনের গোপন কথা বলতে পারেন।

মেয়েটি বলে।

—হুঁ, যদি কবিতার কথা বলেন—

হোমসের চোখে উজ্জ্বল ভাব।

—তাহলে তো আমার দ্বারা হবে না, বন্ধু ওয়াটসনের শরণাপন্ন হতে হবে।

হোমস আমাকে অনেকখানি অযাচিত সম্মান দিয়েছে। অবশ্য এর পেছনে অবশ্যই কোন অভিসন্ধি আছে!

—না, আমি তা বলছি না। শুনেছি আপনি নাকি ক্লায়েন্টের মনের গোপন কথা টেনে বের করেন।

—অনেক গুজব বাতাসে ছড়ায়, হাসিতে ভরপুর চোখে হোমস বলে, তবে কয়েকটা কথা যে কেউ বলে দিতে পারে। যেমন ধরুন আপনি। আপনি আর একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গী। আপনি বেড়াতে যান খুব কম। কিছুদিন আগে সুইজারল্যাণ্ড থেকে বেড়িয়ে এসেছেন। আর একটি কথা—

চকিতে মেয়েটিকে দেখে হোমস শেষ করে—যে ব্যাপারে আপনি আমার পরামর্শ চাইতে এসেছেন সেই ঘটনাটির সঙ্গে এক ভদ্রলোক জড়িত! এবং আপনি ঐ ভদ্রলোকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু বলতে পারছি না।

আমরা দুজনেই অবাক হয়ে গেছি। আমি তো চীৎকার করে বলি—হোমস, এত কথা তুমি জানলে কি করে?

মেয়েটি ও প্রতিধ্বনি তোলে—কি করে বললেন ?

—এসব তো সোজা চোখেই দেখতে পেলাম।

হোমস বলতে শুরু করে।

—আপনার ট্রাভেলিং কেসটা পুরোনো হলেও একটুও ভাঙেনি, তার মানে ওটি নিয়ে খুব কমই বেরোতে হয় আপনাকে। ঐ কেসটির গায়ে আঠা দিয়ে যে লেবেলটি মারা তাতে লেখা আছে সুইজার-ল্যাণ্ডের গ্রীণ্ডেলওয়াল্ডের সপ্লেনডাইড হোটেলের সঙ্কেত নাম। তাই বলে দিলাম যে আপনি কিছুদিন আগে সুইসদের দেশে গিয়েছিলেন।

—কিন্তু অন্য সব ব্যাপারগুলো ?

আমি প্রশ্ন করি।

—ওঁর দিকে ভালো করে তাকাও তাহলেই বুঝতে পারবে। উনি বেশ নতুন ধরনের পোষাক পরেছেন তবে ওগুলো দামী নয় আবার নতুনও নয়। গ্রীণ্ডেলওয়াল্ডের সব থেকে নামজাদা হোটেলে উনি নিশিযাপন করেছেন। এখানে যে গাড়ীটি চড়ে এলেন সেটিও দারুণ দামী ও সম্ভ্রান্ত ধরণের গাড়ী। এঁর নিজের নামের আদ্যক্ষর সি এফ আর গাড়ীতে লেখা আছে 'এম' অক্ষরটি। এর থেকে বুঝতে অসুবিধে হবে না যে ইনি কোন অভিজাত পরিবারে বাস করেন এবং ইনি যে বয়েসের সেটা দেখে অনুমান করা কঠিন হবে না যে ইনি হয়ত ঐ পরিবারের গভর্নেস। আর এই বয়েসের একজন তরুণী তো এক ভদ্রমহিলার সঙ্গী হলেই ভালো মানায়। বুঝলে ওয়াটসন, এগুলো বলবার জন্যে একটু বুদ্ধির দরকার।

—কিন্তু ঐ কথাটা—

মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করে।

—ওহো, ভুলেই গেছি। দেখুন যার নাম করতেই আপনার গালে লাল আভা দেখা দিল তার প্রতি আপনার অনুরাগ প্রকাশের আর মাধ্যম আছে কি ?

মেয়েটি আবার মুখ নীচু করল। হোমস বলবার পর মনে হচ্ছে কত সোজা যেন তার বিশ্লেষণ।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের সুন্দরী অতিথি একটু উত্তেজনা নিয়ে বলেন, লোকে তাহলে খুব বাড়িয়ে বলে না। সত্যি কারোকে শুধু চোখে দেখে আপনি অনেক কিছু বলতে পারেন।

তারপর একটু থেমে বলে, আমার নাম সেলিয়া ফরসাইথ। প্রায় এক বছর ধরে আমি লেডী মেয়োর সঙ্গে আছি। বলতে পারেন যে তাঁর পরিবারের সঙ্গে বিশেষ ভাবে মিশে গেছি। লেডী মেয়ো থাকেন সারের গ্রাম্পটন লো হলে। আর চার্লস—

—চার্লস? যে ব্যক্তিটির কথা আপনি বলতে এসেছেন?

হোমস হঠাৎ বলে।

মেয়েটি মাথা নাড়ে, ধীর কণ্ঠে বলে—এর কথা আপনাকে বলতে গিয়েও বলতে পারছি না। আসলে ব্যাপারটা এত আশ্চর্য্য আর অভাবিত যে আপনি সব শুনে হয়তো আমাকে বোকা ছেলেমানুষ ভাববেন নয়তো মনে করবেন যে চার্লস একটা পাগল। অথবা আমাকেই পাগল ভাবতে পারেন।

—কিন্তু আমি ওসব কথা ভাবতে যাবো কেন?

কেননা ঘড়ি তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

সেলিয়ার জবাবে আমরা চমকে গেলাম।

—ঘড়ি?

কোনরকমে হোমস বলে। তার বিস্তৃত জীবনে এমন কোন অদ্ভুত সমস্যার মুখোমুখি আগে কখনো সে হয়েছে কি?

—হ্যাঁ, গত দু সপ্তাহে উনি সাতখানি ঘড়ি আছড়ে ভেঙেছেন। তার মধ্যে দু খানা ভেঙেছেন অনেক লোকের সামনে, এক খানা তো আমার সামনে ছুঁড়ে ভাঙলেন।

এতক্ষনে শার্লক হোমসের কৌতুহল বাড়তে থাকে, প্যান্টের ওপর সরু সরু আঙুল ঘষে বলে—বাঃ বেশ মজার ব্যাপার তো। আপনি গুছিয়ে বলে যান। থামলেন কেন?

—আমি ঠিকমত বলতে পারবো না মিষ্টার হোমস।

মিস ফরসাইথ ইতস্ততঃ করছেন দেখে হোমস আশ্বাস দিয়ে বলে—আপনি বলতে থাকুন মিস ফরসাইথ, আমি সব শুনবো।

—দেখুন শৈশবেই আমার বাবা-মা মারা গেছেন। তারপর আমি লেডী মেয়োর কাছে চলে যাই। ওখানে ভালোই ছিলাম। মনের মত পড়াশোনা করেছি। লেডী মেয়োকে সবাই জানে কঠিন স্বভাবের মহিলা বলে, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন দারুণ কোমল-প্রাণা। কেননা তিনি অন্তরঙ্গদের সঙ্গে দারুণভাবে মিশে যেতে পারেন। ছুটিতে সুইজারল্যাণ্ডে যাবার কথা তিনিই তুলেছিলেন, কেননা নির্জনতার মধ্যে অবস্থিত গ্রেক্সটন লোহল সবাইকে বিষন্ন করে তোলে। প্যারিস থেকে গ্রিণ্ডেলওয়াল্ড যাবার পথে ট্রেনে চার্লস মানে চার্লস হেনডনের সঙ্গে দেখা হল।

হোমস চেয়ারে বসে পড়েছিল। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলে—তাহলে এটাই আপনাদের প্রথম দেখা?

—হ্যাঁ।

—কিভাবে কথা শুরু হল?

—এমন কিছু নয়। ফার্স্ট ক্লাস কামরাতে আমরা তিনজন ছিলাম, আর কেউ ছিল না। চার্লসের ব্যবহার এত মধুর যে লেডী মেয়ো মুগ্ধ হলেন, গলাটাও বেশ পরিষ্কার ওর, হাসিটা মন কেড়ে নিল।

—সত্যি কথা, কিন্তু আর একটু ভালো ভাবে বলুন না।

—হ্যাঁ ওর সঙ্গে কথা হল জানলাটা নামিয়ে দেওয়া নিয়ে—

শান্ত নীল চোখে মিস ফরসাইথ তাকালেন।

-চার্লসের চোখ দুটো মনে গেঁথে যায় আর ওর পুরু বাদামী চোয়ালটির মধ্যে দৃপ্ত পৌরুষ বেশ ফুটে উঠেছে। মাথাটা একটু নীচু করে লেডী মেয়োকে প্রশ্ন করলেন যে জানলাটা নামিয়ে দেবে কিনা। লেডী মেয়ো রাজী হলেন। তারপরেই আন্তরিকভাবে কথা বলতে শুরু করলেন চার্লস।

—তারপর ?

—লেডী মেয়ো আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। গ্রিণ্ডেলওয়াল্ডের পথটুকু কোথা দিয়ে ফুরিয়ে গেল। কিন্তু হোটেল সপ্লেনডাইডে ঘটল ঐ ব্যাপারটা। মিষ্টার হোমস, ভাবতে গেলে এখনও আমার লজ্জা করে।

—নামে সপ্লেনডাইড হলেও হোটেলটা বেশ ছিমছাম ভাবে সাজানো। মিষ্টার হেনডেন অবিবাহিত মানুষ, খেয়ালে বেড়াতে চলেছেন একজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে। আমি ভাবলাম যে উনি নিশ্চয় নামী কোনো হবেন। কেননা ওনার কথাবার্তার ঢঙ অথবা হাসি সবকিছুতেই আভিজাত্য মাখা। হোটেল ম্যানেজার মিষ্টার ব্রাঙ্গার লেডী মেয়ো আর মিষ্টার হেনডেনকে আপ্যায়ণ করলেন। মিষ্টার হেনডেন মিষ্টার ব্রান্দারের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁরা নীচু হয়ে কোন বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করছিলেন।

হঠাৎ মিষ্টার ব্রাঙ্গার নীচু হয়ে বো করলেন আর মিষ্টার হেনডেন ঘুরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত হাসি গেল নিভে। কি একটা অভাবিত দৃশ্য তিনি দেখে ফেলেছেন!

....আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি তাঁকে, হাতে একটা ভারী মালাকা ছড়ি, লঙ কোট তাঁর পরনে, মাথায় টপহ্যাট। সামনেই ফায়ার প্লেস। তার ওপরে রয়েছে একটা ম্যান্টেল সেলফ। সেলফের

ওপরে বসানো আছে একটা অপূর্ব সুইস ঘড়ি। টিক টিক শব্দে সময় মাপছে ওটি।

তখনও আমি ঘড়িটিকে দেখতে পাই নি। হঠাৎ দেখলাম মিষ্টার হেনডেন অস্পষ্ট গোঙানির মত আওয়াজ করছেন। উনি অপ্রকৃতিস্থের মত ফায়ারপ্লেসের দিকে দৌড়ে গেলেন। তারপর হাতের ঐ ভারী ছড়িটি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঘড়িটার ওপরে। ঘড়িটা একদম গুঁড়িয়ে গেল। টুকরো টুকরো অংশগুলো আগুনের মধ্যে পড়ে গেল।

তারপর তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে খুব শান্তভাবে ম্যানেজার মিষ্টার ব্রাঙ্গারের দিকে তাকালেন। কোন কথা না বলে একটা ব্যাঙ্কনোট বের করে দিলেন যা ঘড়িটার দামের দশগুণ বেশী হবে। তারপর তিনি আবার হাল্কাভাবে কথা বলতে শুরু করলেন।

আমরা ওঁর আচরণে অবাক হয়ে গেলাম। লেডী মেয়োকে দেখে মনে হল নিজের সমস্ত মর্যাদা ভুলে তিনি কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন। ঐ অভাবনীয় ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছেন না। চার্লসকে মনে হল রাগে দিশেহারা! পরিবেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন উনি। ওঁর চাকরের দিকে দেখলাম, বেঁটে খাটো রোগা মত লোকটা পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল, তার মুখে মাটন চপের মত জরুল। দেখে অবাক লাগল লোকটির চোখে কি বিশ্রী চাউনি। লোকটা যেন বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছিল।

তারপর দুদিন পরে আবার চার্লস মিশে গেলেন আমাদের সঙ্গে। তাঁর প্রাণখোলা হাসি আর প্রাণভরানো মধুর ব্যবহারে আমরা ব্যাপারটা ভুলেই গেলাম।

কিন্তু তৃতীয় দিন ডাইনিং রুমে আবার ঘটল সাংঘাতিক ঐ অঘটনটা।

আমরা ডাইনিং রুমে ঢুকতেই দেখি চার্লস মালাক্কা ছড়ি হাতে প্রাতর্ভ্রমণ সেরে ফিরছেন। ঘরভর্তি লোক ব্রেকফাস্ট সারছে। ঘরের চারদিকের জানলায় ঝুলছে ভারী পর্দা। মনের আনন্দে খুশী ভরা মানুষ বসে গল্প করছে। যেন আনন্দের হিল্লোল উঠেছে বাতাসে।

খুশীর সুরে চার্লস বলেন—প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিন ম্যাডেম, দেখবেন যা খেয়েছেন সব হজম হয়ে গেছে!

বলেই তিনি পর্দাটার দিকে সন্দেহ ভরা চোখে তাকালেন। কিছু একটা বুঝতে পেরে ভারী পায়ে ওদিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর পর্দাটার ওপরে আঘাত হানলেন সজোরে। পর্দাটা একটানে ছিঁড়ে ফেলতেই দেখা গেল ভাঙা ঘড়ির টুকরো ছড়ানো আছে। ঐ ঘটনাটা আমাকে এতখানি আঘাত দিয়েছিল যে আমি কাত হয়ে পড়ে যাই। লেডী মেয়ো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরে ফেললেন।

মিস ফরসাইথ থামলেন, একটু বাদে চোখ বড় বড় করে বল-লেন—চার্লস যে শুধু ঘড়ি ভাঙে তাই নয়, সে নাকি বরফের নীচে বা নিজের ঘরের দেয়াল আলমারীর মধ্যে ঘড়ি লুকিয়ে রাখে ভবিষ্যতে ভাঙবে বলে!

শার্লক হোমস যে ক্রমেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে সেটা তার আচ-রণে বোঝা গেল। সে চোখ বন্ধ করে বসেছিল। এবার চোখ খুলে তাকাল, ভ্রু দুটি কাঁপাল আর গম্ভীর স্বরে বলল — দেয়াল আলমারির মধ্যে লুকিরে রাখে? ব্যাপারটা যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে। আপনি কোথা থেকে ঐ খবরটা শুনলেন?

—চার্লসের চাকরের মুখ থেকে।

—চাকরের মুখে? তার মানে ঐ বেঁটেখাটো রোগা লোকটা; মুখে জরুলের দাগ? লোকটার নাম মনে করতে পারেন?

—যতোদূর মনে পড়ছে তার নাম ট্রেপলে। কারন চার্লস ঐ নামে লোকটাকে ডাকতো। দেখে মনে হয় চেহারাটা কদাকার হলে কি হবে লোকটা বিশ্বাসী আর অনুগত। সারা দুনিয়াতে তার মত অনুগত চাকর আর মিলবে না।

ঐ ট্রেপলে বলেছে যে তার সাহেব নাকি আরও পাঁচ খানা ঘড়ি দেয়াল আলমারিতে লুকিয়ে রেখেছে অথবা বরফে পুঁতে দিয়েছে। এসব শুনে আপনি হয়তো ভাবছেন যে চার্লসের মাথার গোলমাল হয়েছে, কিন্তু বিশ্বাস করুন ও পাগল নয়। এর পরে যা ঘটল সেটা শুনলে আপনিও তাকে উন্মাদ বলতে পারবেন না।

—বলুন।

হোমস কৌতূহলী হয়ে বলে।

—ঘটনাটার বয়েস মাত্র চার দিন। লেডী মেয়োর স্যুইটের ড্রয়িং রুমে একটা পিয়ানো ছিল! আদ্যিকালের কারুকাজ করা দামী পিয়ানো। গানবাজনা আমার রক্তের মধ্যে মিশে আছে। পিয়ানো বাজাতে আমি খুব ভালোবাসি। রোজই চায়ের পরে লেডী মেয়ো আর চার্লসের সামনে বসে পিয়ানো বাজাতাম। মনে হত আমার আঙুলের ছোঁয়া পেয়ে মৃত ঐ যন্ত্র যেন ক্ষণকালের জন্য প্রাণ ফিরে পায়।

সেদিন আমি বাজনা শুরু করেছি, চার্লস মন দিয়ে শুনছেন, এমন সময় হোটেল বেয়ারা এসে চার্লসকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। চার্লস—

—একটু বাধা দিচ্ছি বলে দুঃখিত আচ্ছা, মিস ফরসাইথ আপনি কি চিঠির পোস্টমার্কটা দেখেছিলেন? মানে কোন দেশ থেকে ওটা এসেছিল?

মিস ফরসাইথকে থামিয়ে হোমস বলে।

—হ্যাঁ, বিদেশী ডাকঘরের চিহ্ন।

মিস ফরসাইথ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন। কিন্তু তাঁর আচরণে কি বিরক্তির রেশ? তিনি একটু রেগে বলেন—এটা জানবার কোন দরকার ছিল না। কারণ আপনি—

—আমি? বলুন, আমি কি?

আমাদের অতিথিকে দেখে বোঝা গেল যে তিনি বেশ চটেগেছেন। মুখের ভাব গোপন করে তিনি বলতে থাকেন—চার্লস খামটা ছিঁড়ে পড়তে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখটি হল মরার মত বিবর্ণ। তিনি বিড় বিড় করে কি যেন বকলেন। প্রলাপের মত মনে হল। তারপর অস্ফুট চীৎকার করে ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেলেন।

আধ ঘন্টা বাদে আমরা নীচে গেলাম। চার্লসের আচরনে লেডী মেয়ো বেশ অবাক হয়েছিলেন। হোটেলের ম্যানেজার মিস্টার ব্রাঙ্গার জানালেন যে চার্লস তাঁর সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে গেছে ঐ ট্রেপলে নামে চাকরটা।

উনি কোন চিঠি লিখে যান নি। এমনকি এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ ও ছিল না। ম্যানেজারকে মুখে বলেও যাননি যে কোথায় গেলেন উনি। ভাবতে পারেন ঐ কদিনের ঘনিষ্টতার কোন মূল্য তিনি দিলেন না।

তারপর থেকে তাকে আর দেখিনি!

মিস সেলিয়া ফরসাইথ মাথা নীচু করলেন। মুক্তোর মত দুফোঁটা অশ্রু তার আয়ত চোখের তারায় চিক চিক করছে। যেন ঐ আঘাতটা এখনও তার কোমল প্রাণে বাজছে।

—মিস্টার হোমস, আমি তো আপনাকে সব জানালাম। কোথাও কিছু বাদ রাখিনি। আমি চাই যে আপনিও জানাবেন যে ঐ চিঠিতে কি লেখা ছিল? বলুন, আপনি চার্লসকে কি লিখেছেন?

আমি এবারে রীতিমত চমকে গেলাম। আমার ধুরন্ধর বন্ধুটির কাজ করতে করতে এর আগে বহুবার অনেক অভাবিত ঘটনার মুখে দাঁড়াতে হয়েছে আমাকে, অনেক অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের মোকাবিলা করেছি, তবে হঠাৎ ঐ চমক আমাকে বিদ্ধ করল।

শার্লক হোমসের কোন ভাবান্তর নেই, সে এক মনে ধূমপান করে চলেছে। কিছুক্ষণ বাদে সে বলে—আপনি ঠিক জানেন যে ঐ চিঠিটা আমি লিখেছিলাম ?

—হ্যাঁ, আপনিই।

—কি করে বুঝলেন ?

—আমি আপনার নাম ও সই দেখেছি। আর সেকথা জানতেই এখানে আমার ছুটে আসা।

হোমস এর পরেও চুপ করে বসে রইল। নীল রঙের ধোঁয়া সরীসৃপের মত ওপরে উঠছে। ওর বুদ্ধিদৃপ্ত দুটি চোখ ম্যান্টল সেলফে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকানো।

—দেখুন মিস ফরসাইথ, চিঠিতে আমি কি লিখেছিলাম সে কথা বলবার সময় এখনো হয় নি। জানেন তো ঠিক সময় না এলে আমি মুখ খুলি না। তাছাড়া ঠিক সময় ছাড়া কোন কথা অসময়ে বলতে নেই। তাতে শুধু ক্ষতিই বাড়ে।

সেলিয়ার সমস্ত আশা যেন ফুৎকারে নিভে গেল। বেচারী মেয়ে। কোন দিকে উত্তর না পেয়ে হোমসের কাছে এসেছিল সমস্যার সমাধানে।

—আর একটা মাত্র প্রশ্ন করবো।

—বলুন।

—আচ্ছা, লেডী মেয়ো কি মিষ্টার চার্লস হেনডেনের প্রতি বন্ধুত্ব-পূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন ? নাকি তাঁর আচরণে বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছিল ?

—উঁহু লেডী মেয়ো চার্লসকে বেশ ভালভাবেই নিয়েছিলেন। তাঁকে আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি যে তিনি চার্লসকে তাঁর ডাক নামে ডাকছেন।

—নামটা জানাতে কোন আপত্তি আছে কি ?

—আপত্তি থাকবে কেন ? উনি ডাকতেন এলেক বলে। বুঝতেই পারছেন যে ওঁদের বন্ধুত্ব কতদূর ছিল।

মিস ফরসাইথ চুপ করেন, তারপর সন্দেহ নিয়ে বলেন—কিন্তু এ প্রশ্নের অর্থ তো বুঝলাম না।

হোমস দুপায়ে ভর রেখে দাঁড়াল।

সরাসরি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেমে থেমে বলল—মানেটা হল যে আমি এই কেসটির পুরো দায়িত্ব নিলাম। আপনি লেডী মেয়োর কাছে ফিরে যান। গ্রেক্সটন লো হলে থাকবেন।

হতবাক ফরসাইথ বলেন—কিন্তু আপনিও আমার কোন প্রশ্নের জবাব দিলেন না ?

আপনি কি আজ আর কিছুই বলবেন না ?

—আমি আমার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে কাজ করি মিস সেলিম

ওয়াটসন আপনাকে বোঝাতে পারবে। যাইহোক কিছু ভাববেন বলে— এক সপ্তাহ বাদে এখানে আসতে পারেন। অথবা ধরুন সা বাদে ঠিক রাত ন'টাতে। সেদিন কিছু উত্তর দেবার চেষ্টা আপাততঃ আপনার কৌতুহল চেপে রাখুন মিস ফরসাইথ।

দখছি।

হোমস থেমে গেল।

মিস ফরসাইথ উঠে দাঁড়ালেন। করুন চোখে হোমসের তাকালেন। দেখে মনে হল উনি যেন পায়ের নীচের মাটি হারা এবং বসেছেন।

আমি সেলিয়াকে আশ্বাস দিয়ে বলি—ভয় পাবেন না মিস, হোমস এই ভাবেই কাজ করে। ক'দিন আনন্দে কাটান।

তারপর সৌজন্যের সঙ্গে ওর হাতখানি তুলে নিয়ে আমি বলি, আমার বন্ধু মিষ্টার হোমসের ওপরে আপনি পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন।

পুরস্কার পেয়ে গেলাম। সেলিয়ার মত কিশোরী মেয়ের সুন্দর একটুকরো পবিত্র হাসির ঝিলিক। অবশ্য ঐ হাসির মধ্যে অনেক দুঃখ মেশানো।

আমাদের অতিথি চলে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করে আমি একটু রেগে বন্ধু হোমসকে বললাম—ছোট্ট মেয়েটাকে আর একটু সমবেদনা দেখানো উচিত ছিল।

তারপর চেয়ারে বসে বলি—ঐ মানসিক রোগীটাকে কি লিখেছিলে?

হোমস আমার দিকে তর্জনী তুলে বলল—ওয়াটসন, আমি কোন চিঠি লিখি নি।

নে. —কি বললে?

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠি। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে মেয়ে। হচ্ছে।

সমস্যার—চুপ করো। আমার নাম নিয়ে চিঠি লেখার এই ঘটনা প্রথম া। তোমার অবাক হবার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে ওয়াটসন।

—ক আমিই ভুল করলাম?

পূর্ণ —তার মানে গোটা ব্যাপারটাকে বেশ গভীর ভাবে নিয়েছো পো মি?

—অবশ্যই।

—এখন কি করবে ?

—আজ রাতেই কন্টিনেন্ট বেরিয়ে পড়ছি।

—কন্টিনেন্টে ? মানে সুইজারল্যাণ্ডে ?

—না না সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে কি হবে ? এর উৎস হল আরও অনেক দূরে।

—তাহলে কোথায় যাবে ?

—সহজ কথা ভেবে দেখো।

—হোমস !

আমি অসহায়ের মত বলি। যেন কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

—ওয়াটসন, তুমি তো সব শুনলে। তাছাড়া আমি কিভাবে কাজ করি সেটা তো তোমার অজানা নয়। একটুখানি মাথা ঘামাও।

আমি ভাবতে থাকি। ঘন কুয়াশার মধ্যে বেকার স্ট্রীটে বাতি-গুলো মিট মিট করে জ্বলছে। আমার বন্ধু গোছগাছ সেরে নিল। লম্বা রোগা শার্লক হোমস কানঢাকা একটা ট্রাভেলিং ক্যাপ পড়েছে, ওর পায়ের কাছে রয়েছে একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগ।

আমার দিকে অনেকক্ষণ পলকহীন চোখে তাকিয়ে থেকে বলে—তার মানে এখনো কিছুই বোধগম্য হল না ?

আমি বোকার মত মাথা নাড়ি।

—না ওয়াটসন, তোমার ওপর আর ভরসা রাখা যাবে না দেখছি।

হাসতে হাসতে হোমস বলে।

—আচ্ছা একটা কথা বলে দিই, মিষ্টার চার্লস হেনডেন এবং ঘড়ি....

—দেখলেই ভেঙে ফেলেন, এই তো ? এটা তো আমার জানা।

বাধা দিয়ে আমি বলি।

হোমস মাথা নাড়ে।

—ঠিক তা নয়। আমি ঐ পাঁচটি ঘড়ির কথা বলতে চাই যেগুলো আছে আলমারীতে তোলা। যার কথা বলেছে ঐ বিদঘুটে চাকরটা। কি ওয়াটসন মনে পড়ছে।

—কিন্তু মিষ্টার হেনডেন তো ওগুলো ভাঙেন নি।

—হ্যাঁ, তাইতো ভেবে দেখতে বললাম! ঠিক আছে ওয়াটসন, ঠিক সাত দিন বাদে এইখানে রাত ন'টায় দেখা হচ্ছে, কেমন!

তারপর টুপীটাকে টেনে নামিয়ে বলে, গুড নাইট।

—গুড নাইট।

আমিও বলি।

চেয়ে দেখি যে আমি একা। তারপর ঘন কুয়াশা ভেঙে শীতের মধ্যে একা বাড়ী ফিরলাম। সারা পথে সেলিয়ার নিষ্পাপ মুখখানি শুধু চোখে ভেসেছে।

পৌঁছতে হবে। মিস
হোমস আমার

## ॥ দুই ॥

এক এক করে সাতটি দিন কেটে গেল। নিজেকে যতটা সম্ভব কাজের মধ্যে ব্যস্ত রেখেছিলাম যাতে কোন বিষন্নতা আমাকে গ্রাস না করে।

অনেক রাত অবধি ব্যস্ত থাকতাম বার্কটনের সঙ্গে বিলিয়ার্ডস খেলে। পাইপ টানার পরিমাণ গেল বেড়ে। তারই মধ্যে মিষ্টার হেনডেনের কথা মনে পড়ত। তাঁর ঐ অদ্ভুত ঘড়ি ভাঙার ব্যাপারটাও।

মিস ফরসাইথের চোখ দুটি ও তাঁর কথা বলার সুচারু ভঙ্গিমা-টুকুও মনে গেঁথে গেল। বেচারী ফরসাইথ, বিষাদের কালো ছায়া তাকে গ্রাস করেছে। অমন রূপসী আর নিষ্পাপ মেয়েটি!

এমন মানুষের সাথে তার অনুরাগ যে মানুষটি অদ্ভুত আচরণ করে।

শার্লক হোমসের সঙ্গে বেশীদিন একসঙ্গে কাটালে বিশ্লেষণী ক্ষমতা বেড়ে যায়। আমি নিজে নিজে কেসটা সাজিয়ে নিলাম। হেনডেনকে আমি বিশ্বাস করি না যতই সে সুন্দর ব্যবহার করুক আর গোঁফ জোড়া নেড়ে নেড়ে হাসুক না কেন। ট্রেনের কামরাতে সে মিস ফরসাইথের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যেই জানলাটা বন্ধ করেছিল।

লোকটা মোটেই ভালো নয়।

—দেখলেই তে

বাধা দি ২টে ঐ মেয়েটির প্রতি আমার স্নেহই তাকে খারাপ

.ণ।

হো

লেডী মেয়েকেও বিশ্বাস করছি না। রহস্যময়ী ঐ রমনী অভিজাত বংশের হলেও তাঁর আচরণে রহস্য রহস্য গন্ধ।

২৩শে নভেম্বর, বুধবার আমার স্ত্রী ফিরল। ক'দিন আমি বিচ্ছিন্ন ছিলাম পরিবার থেকে, ঐদিন আবার সব মনে পড়ল! স্ত্রী এনেছে সুসংবাদ, আমি কিছু দিনের মধ্যেই ছোটখাট প্র্যাকটিস করতে পারব। ওর বাড়ী ফেরাতে আমার বিষণ্ণ জীবনে খুশীর ঢেউ উঠল।

সেই রাতেও বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল! আমরা হাতে হাত রেখে অনেকক্ষন চুল্লীর ধারে বসে রইলাম। আমার ঘরে আবার নেমে এল আনন্দঘন মুহূর্ত্তগুলো।

আমি ধীরে ওকে মিস ফরসাইথের কেসটা বলি। তার অদ্ভুত সমস্যার কথা শুনে ও অবাক হয়ে গেল।

মিস ফরসাইথের অল্প বয়েস, তার কমনীয়তা, সৌন্দর্য, তার ভয়বিহ্বল চাউনি আর নিস্পাপ কথা মেরীকে শুনিয়ে দিলাম।

মেরী কোন জবাব না দিয়ে চেয়ে রইল ভাবনা ভরা চোখে।

হয়তো আমার মত সেও চিন্তা করছে চার্লস হেনজেনের অদ্ভুত ব্যবহার নিয়ে।

দূরে বিগ বেনে ঢং করে রাত সাড়ে আটটার ঘন্টা বাজল।

আমি যেন চমকে গেলাম। মেরীকে বলি—মেরী, আমাকে আজ যেতেই হবে, আমি ভুলতে বসেছিলাম।

—ভুলেছিলে?

মেরী মৃদু প্রতিধ্বনি তুলল।

—বেকার স্ট্রীটে রাত নটাতে আমাকে পৌঁছতে হবে। মিস ফরসাইথ আসবে। আমাকে যেতেই হবে মেরী। হোমস আমার জন্যে বসে থাকবে।

মেরী যেন একটু আহত হল আমার কথায়। এতদিন বাদে ও ফিরেছে, হয়তো চেয়েছিল যে আজকের রাতটা ওর উষ্ণ সান্নিধ্যে কাটাব। ও ঠাণ্ডা স্বরে বলে—ঠিক আছে তুমি যেতে পার। মিষ্টার শার্লক হোমসের কেস নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি আছে?

আমি একটু হাসলাম। মেরী কি করে বুঝবে যে হোমসের কেস মানে কি চমকপ্রদ ব্যাপার।

ওর কথায় একটু মনঃক্ষুন্ন হলাম। টুপীটা তুলে নিয়ে নীরবে পা রাখি শীতার্ত রাতে। তীব্র হিমেল হাওয়া। জমাট কুয়াশা, রাস্তার কাদায় যেন পা আটকে যাবে।

একটা হ্যানসম্ ডেকে থামাই। ওটা আমাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে বেকার স্ট্রীটে শার্লক হোমসের কাছে পৌঁছে দিল।

অনেক উত্তেজনা বুকে ধরে আমি হোমসের ঘরে ঢুকলাম।

সাতটি দিন ছিলাম তৃষিত, আজ তৃষ্ণা মেটাতেই হবে।

দেখি, শার্লক হোমস তার কাজ সেরে ফিরেছে, ওপরের আলোকিত জানলাতে ওর দীর্ঘ ঋজু ছায়াটি এদিক ওদিক দুলছে। তার মানে পায়চারী করছে সে!

পায়চারী সে কখন করে?

যখন কোন রহস্য তার মাথায় চেপে বসে। অথবা যখন সে ঐ রহস্য জাল ছিঁড়ে বেরোবার চেষ্টা করে।

এখন কোনটি ঘটেছে?

দরজা খুলে শান্ত পায়ে সিঁড়ি পার হয়ে ওপরে উঠি, বসার ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ি।

হোমস সবে মাত্র ফিরেছে। ওর পুরোনো গ্লাড্স্টোনের ব্যাগটা, টুপী আর অন্য সব ছড়ানো আছে চারিদিকে। এটাও তার সহজাত ব্যাপার।

হোমস ওর ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমার দিকে পেছন করা। দরজা ঠেলার শব্দে ঘুরে বলে, আরে তুমি যে, আমি ভেবে-ছিলাম বুঝি মিস ফরসাইথ। বড্ড দেরী হচ্ছে তার।

ওর গলাতে উত্তেজনাটা বেশ ধরা পড়ল।

—হোমস! ঐ শয়তানগুলো কিছু না করে বসে।

—শয়তান কারা?

—আমি মিষ্টার চার্লস হেনডেনের কথা বলছি। লেডী মেয়োকেও বাদ দিতে পারছি না। ওরা যুক্তি করে মেয়েটিকে বিপদে ফেলছে।

হোমসের মুখের কঠিন ভাবটা কেটে গেল, সেখানে ফুটেছে নরম আভা। ও একটু হেসে বলে, হায় বন্ধু। সুন্দরী মুখ দেখলে এখনো তোমার মন ভিজে যায়। এবং এইখানেই তুমি বার বার ভুল করো। ভাগ্যিস তুমি নিজের হাতে কোন কেস তুলে নাওনা। তাহলে রূপসী মেয়েরা চিরদিনই জিতে যেত।

হোমসের ঐ উক্তির যথার্থতা আছে। তবুও আমি বার বার রূপসী দেখে গলতে চাই। তার মৃদু ভর্ৎসনাকে হজম করে বলি—কন্টিনেন্টে তোমার কাজ কেমন হয়েছে?

—আমি ঝড়ের বেগে একটা ইউরোপীয়ান শহরে ছুটে গেলাম আর ফিরে এলাম।

একটু দম নিয়ে শার্লক হোমস আবার বলে—এই মিষ্টার হেনডেন লোকটি দারুন ভীতু প্রকৃতির। সে যা করে থাকে তার পেছনে

কারন আছে। কিন্তু ওর স্বভাবের সুযোগ নিয়ে ওকে একটা জাল চিঠি দেওয়া হয়েছে। এমন ভাবেই ওকে ফাঁদে ফেলা হল। আমি কিন্তু তার কোন ঠিকানা পেলাম না। লোকটা যে কোথায় গেল?

ভাবনাটা তার গলার স্বরে ফুটবো ফুটবো করে ফুটল না, স্বাভাবিক ভাবে হোমস বলে—তুমি ওকে শয়তান ভাবছ কেন?

—ঠিক বলতে পারব না, হয়তো উত্তেজনার মাথায় বলে ফেলেছি। ঐ লোকটাকে আমি কিছুতেই পছন্দ করতে পারছি না।

—কেন বলতো?

—যেমন ধরো ঐ লোকটা যেন নিজেকে বড্ড বেশী জাহির করবার চেষ্টা করে, ট্রেনের কামরা থেকে সে যেমন করে হোক মিস ফরসাইথের চোখে পড়বার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল। তার গায়ে পড়া ভাবটা আমার একদম ভালো লাগছে না হোমস। তাছাড়া কথায় কথায় তার মাথা ঝুঁকে বো করাটাও মানতে পারছি না। ওদিকে দেখো কণ্টিনেন্টাল কায়দাতে লেডী মেয়েকে ম্যাডামের বদলে ম্যাডেম বলাটাও সমর্থন করতে পারছি না। ওটা যে অন ইংলিশ ব্যবহার সেটাতো স্বীকার করবেই!

খানিকটা বিস্মিত চোখে আমার বন্ধু এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, কিছু যেন বলতে যায়, এমন সময় একটা চার চাকার গাড়ী সামনে এসে থামল। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করি। আমাদের উত্তেজনা মিটতে চলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মিস সেলিয়া ফরসাইথ ঘরে ঢোকে, তার সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য এখনো ছড়ানো আছে, তার পেছনে এল বেঁটেখাটো রোগা লোক, মুখে জরুল।

ও হল ট্রেপলে, চার্লসের চাকর। সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে

যেন। মিস করসাইথের সঙ্গে ট্রেপলের আগমণ আমাকে অবাক করে দিল।

—মিষ্টার হোমস, উত্তেজিত মিস ফরসাইথ প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, চার্লস ইংল্যাণ্ডে।

—হ্যাঁ, আমি ঠিক এই রকমটি ভেবেছিলাম। কোথায় আছেন?

—গ্রেক্সটন লো হলে! গতকালই আমি আপনাকে টেলিগ্রাম করবো ভেবেছিলাম, কিন্তু লেডী মেয়ে করতে দিলেন না।

—ইস আমার ভাগ্যটাই খারাপ।

হোমস তার ডেস্কে ঘুষি মারতে গেল।

—আপনিই না বলেছিলেন যে লোকালয় থেকে অনেক দূরে ঐ হলটা। নির্জনতা তাকে ঢেকে রেখেছে। ওয়াটসন, সারের একটা ম্যাপ খুঁজে আনোতো। বেশ বড় মাপের। তাড়াতাড়ি করো।

আমি দৌড়ে গেলাম তার লাইব্রেরীতে। সারের ম্যাপটা পেয়ে গেলাম, হোমসের হাতে ধরিয়ে দিই।

—পেয়ে গেছো, এতেই হবে।

—ম্যাপ দিয়ে কি হবে হোমস?

—দাঁড়াও, দাঁড়াও, এই তো বিরাট খোলা জমি। বনজঙ্গলে ঢাকা। গ্রেক্সটন লো হলের সবচেয়ে কাছের ষ্টেশন তিন মাইল দূরে। মিস ফরসাইথ আপনাকে বেশ কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

—আমি কি উত্তর দেবো মিস্টার হোমস? একের পর এক ঘটনা আমার সব বুদ্ধিকে গুলিয়ে দিয়েছে। আমি কিছু বলতে পারছি না মিস্টার হোমস। চার্লস আর লেডী মেয়োও কিছু বলছেন না।

নিজের আবেগকে সংযত করে সেলিয়া বলে, এই দেখুন না চার্লস ট্রেপলেকে একটা চিঠি দিয়ে লণ্ডন পাঠিয়েছেন হাতে হাতে পৌঁছে দেবার জন্যে। কিন্তু এর মধ্যে কি আছে ছাই আমি নিজেও জানি না।

—দুঃখিত মিস। আমি দেখাতে পারবো না।

লোকটি গম্ভীর ভাবে বলে। যেন ঐ হুকুম পেয়েছে সে।

ট্রেপলে যেন নতুন বরের মত সেজেছে। দুটি শক্ত হাতের মধ্যে শক্ত করে ধরা ঐ খামটি, যেন কেউ এখুনি কেড়ে নিতে আসছে। ওর বিবর্ণ শীতল দুটি চোখ ঘরের চারদিকে ঘুরছে। শার্লক হোমস ওর দিকে এগিয়ে গেল।

শক্ত কণ্ঠে সে বলে—তোমার হাতের ঐ খামটা আমাকে একবার দেখাবে কি ?

আমি আগেও দেখেছি যে বোকা লোকেরা বেশী ভক্তি করে। ট্রেপলের চোখ দুটিও প্রায় উন্মাদের মত দেখাচ্ছে।

—মাফ করবেন স্যার। আমাকে যেরকম হুকুম করা হয়েছে আমি তেমন কাজ করছি।

—শোন, তোমার বাজে কথা শুনে সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার হাতে নেই। আমি তোমার চিঠি পড়তে চাইছি না! আমি শুধু খামের সামনের দিকের ঠিকানাটা দেখবো আর পেছন দিকের শীলটা দেখবো। মনে রেখো তোমার মণিবের প্রাণ এতে বিপন্ন হতে পারে।

ট্রেপলে কিছুটা থমকে গেল। ইতস্তত করল, তারপর শুকনো [illegible]ট দিয়ে ভিজিয়ে দিল খামটা, শেষ পর্যন্ত হাতের মুঠোর মধ্যে [illegible]টা ধরে হোমসের সামনে মেলে ধরল।

—আরে চিঠিটা দেখছি লেখা হয়েছে মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনারকে। উনি হলেন স্যার চার্লস ওয়ারেন। আর শীলটা দেখাও, ঠিক বা ভেবেছি তাই। চিঠিটা তুমি এখুনি দিয়ে এসো।

—হ্যাঁ, মিষ্টার হোমস।

—তাহলে এখুনি চলে যাও, তবে গাড়ী নিও না। আমাদের এখুনি কাজে লাগবে গাড়ীটা।

ট্রেপলে নেমে গেল, সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। ততক্ষণ হোমস চুপ করে ছিল! ট্রেপলে চলে যেতে হোমস বলে—ওয়াটসন, ড্রয়ারটা খুলে দেখতো কটায় ট্রেন আছে? তোমার কোন অস্ত্র আছে কি?

—আমার হাতে শুধু লাঠিটা আছে।

আমি কোন রকমে বলি।

টাইম টেবিলটা দেখে নিলাম। হোমস বলে—এটা রাখো।

হোমস ওর ডেস্ক টেবিলের বাঁদিকের ড্রয়ারটা খুলে একটা বত্রিশ ওয়েম্বলে নিল।

—কোটের পকেটে ঢুকিয়ে নাও, দেখে নাও এটাতে দু নম্বর কার্টিজ লাগে।

রিভলভারটা আমার হাতে তুলে দিল। ব্যারেলে আলো পড়ে ঝকমক করছে!

ম্যান্টেলপীসের ওপর দেহের ভর দিয়ে মিস ফরসাইথ তার কণ্ঠে উৎকণ্ঠা এনে বলে, মিষ্টার হোমস, একটু থামল সে, নিজেকে সামলে নিল, আবার বলল, গ্রেক্সটন ষ্টেশনের অনেক ট্রেন আছে। কুড়ি মিনিট বাদে একটি ট্রেন আছে।

—বাঃ!

—কিন্তু ঐ ট্রেনটা আমরা ধরতে পারবো না।

মিস ফরসাইথের উক্তি আমাদের অবাক করে দিল।

—কেন?

হোমস বিস্মিত হয়ে বলে।

—আমি আপনাকে বলতে সময় পাই নি যে লেডী মেয়ো আপনার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। আমি আজ বিকেলে তাঁকে আপনার কথা বলেছিলাম। তিনি বলেন যে আমরা সবাই যেন আজ রাত দশটা পঁচিশের ট্রেনে যাই। ওটাই হবে আজকের শেষ ট্রেন।

লেডী মেয়োর কথাটা মেনে নিতে পারলাম না। তিনি হঠাৎ কেন ঐ উক্তি করলেন বলতে পারবো না।

তাঁর কথা মত আমরা রাত করে বেড়োলাম! কিন্তু ঐ শেষ ট্রেনটি প্রায় ছেড়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় জমে রয়েছে বরফের কাদা, বরফের কথা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম! শেষ মুহূর্তে আমরা ওয়াটর্লু ষ্টেশনে পৌঁছে গেছি।

## ॥ তিন ॥

ট্রেনটা চলতে শুরু করল। বেশী লোক নেই, প্রায় ফাঁকা কামরাগুলো। ট্রেনটা খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটছে। আমাদের ঐ আলোকভরা কামরাটি যেন রহস্যভরা আবরণ ছিঁড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে! বিন্দু বিন্দু ভয় জমছে আমাদের মনে!

হোমস সামান্য ঝুঁকে বসে আছে। কোন চিন্তাতে মগ্ন সে। সেলিয়াব মুখেও হাসি নেই।

নরম উজ্জ্বল চাঁদের স্নিগ্ধ মায়াবী আলো যেন কিছুটা লজ্জা পেয়েছে। হোমস যেন বাজপাখির মত দেখতে, অন্তত তার ছায়া তাই বলছে।

এমন ভাবে নির্জন প্রান্তর পার হয়ে আমাদের ট্রেন অবশেষে গন্তব্যস্থানে পোঁছল।

ঘড়িতে তখন বাজে রাত সাড়ে এগারোটা। রেলপথের পাশে পড়ে থাকা ছোট্ট ষ্টেশনটা ঘুমিয়ে পড়েছে, চারপাশের জনপদ অনেক আগেই নীরব হয়ে পড়েছে। আলো সব নেভানো, জীবনের কোন স্পন্দন নেই।

নীরব নিস্তব্ধ রাতে ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে শুধু, এছাড়া আর কোন শব্দ নেই!

ষ্টেশনের পাশে একটা মাথা খোলা ল্যাণ্ডু দাঁড়িয়ে আছে, ঘোড়াগুলো নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে, ঠিক তার ওপরে বসে আছে কোচ-

ম্যান। কোচম্যানকে ঐ পরিবেশে কেমন যেন অপার্থিব মনে হল। আমরা এগিয়ে গেলাম, পেছনের সীটে বসেছিলেন একজন বয়স্কা মহিলা, উনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

আমাদের দেখতে পেলেন উনি। আমরা ধীর পদক্ষেপে হাঁটছি। আমাদের ক্লান্ত ছায়া কাঁপছে।

মিস ফরসাইথ কিছু বলতে গেল, তাকে থামিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা, বললেন—আপনিই তো মিষ্টার শার্লক হোমস?

গলাটা তাঁর গম্ভীর আর ভরাট, তিনি আবার বলেন—তাহলে ইনি হলেন আপনার বন্ধু ওয়াটসন। আমিই লেডী মেয়ো।

তীক্ষ্ণ চোখে তিনি আমাদের পর্যবেক্ষণ করলেন। আমরাও তাকালাম, ভদ্রমহিলার দেহে দৃঢ়তার ছাপ, মুখে কর্তব্যপরায়ণতার ছায়া।

—আপনারা গাড়ীতে আসুন।

আমরা এগিয়ে যাই।

—খোলা গাড়ীতে যেতে এই শীতের রাতে আপনাদের ভীষণ অসুবিধে হবে, সেটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার কোচোয়ানটা দ্রুত গাড়ী চালায়, সে গাড়ীর অ্যাপ্রেলটা ভেঙে ফেলেছে।

আমরা গাড়ীতে ঢুকে পড়ি! তিনি কোচোয়ানকে জোরে চালাতে বললেন। অবশ্য আমি ওতে কিছু মনে করলাম না। কেননা সারা জীবন ধরে আমি দ্রুত চলতে ভালোবাসি! তখন জীবন ছিল বিপন্নতায় ভরা, যৌবনটাই কেটেছে শুধু ছুটে আর ছুটে।

গাড়ীটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনী দিয়ে ছুটতে শুরু করল।

—দেখো হোমস আমি ছুটে চলাই ভালোবাসি!

আমি হোমসকে বললাম।

—আমাদের ঐ বন্ধুটির জীবন এখন দারুন বিপন্ন!

শার্লক হোমস বলে।

—মিস্টার হোমস, আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারছি কি?

লেডী মেয়ো প্রশ্ন করলেন।

—লেডী মেয়ো, আমার প্রশ্নের কোন জবাব পেলাম না। মিষ্টার চার্লসের অবস্থা কেমন?

—ভয় পাবেন না মিস্টার হোমস। সে এখন ভালোই আছে।

—আপনি কি ঠিক জানেন?

—আমিতো বলছি যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, চার্লস এখন নিরাপদ। গ্রেক্সটন লো হলে পাহারা আছে, ওরা তাকে আক্রমণ করতে পারবে না।

তীব্র স্বরে ল্যাণ্ডুর ঘণ্টা বাজছে, নীরবতার মধ্যে আর কোন আওয়াজ নেই।

বরফ বাতাস ধেয়ে আসছে। সারা দেহ কেঁপে কেঁপে ওঠে।

আমি হঠাৎ বোকার মত প্রশ্ন করি—মাপ করবে হোমস, তোমাদের কথাবার্তা আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। কি নিয়ে কথা বলছেন লেডী মেয়ো? কে ঐ মিষ্টার চার্লস হেনডেন? কেনই বা তাঁর জীবন বিপন্ন?

—ওয়াটসন, চুপ করো। তুমিই তো আমাকে বলেছিলে যে ঐ ভদ্রলোক কে। সে যে বৃটিশ নয় সেটাও তো তুমিই ধরিয়ে দাও।

—ইংলিশম্যান নয়?

সেলিয়ার কণ্ঠে বিস্ময়।

—তার মানে তিনি অভিজাত ঘরের ছেলে নন?

আমি বলি।

—ঠিক তার উল্টো ওয়াটসন। মিস ফরসাইথ আসবার আগে আমি তোমাকে কি বলেছিলাম তোমার মনে আছে কি?

আমি ভুলেই গেছি। হোমস বলে—আমি কাগজ পড়তে পড়তে বলেছিলাম যে নিহিলিষ্টরা রাশিয়া আক্রমণ করবে। তারা গোটা রুশ সাম্রাজ্য ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এ কথাও হয়তো বলেছিলাম যে তারা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে। অডেসাতে তারা গ্রাণ্ড ডিউক অ্যালেক্সির বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত করেছে। গ্রাণ্ড ডিউক অ্যালেক্সি নামটা ছোট করে ডাকলে কি হতে পারে?

—আলেক।

আমি চীৎকার করে বলি। অভাবিত ঐ আবিষ্কারে আমি নিজেই চমকে গেলাম। আলেক, আলেক শব্দটা মনের মধ্যে ঘুরতে থাকে।

—এবার বলোতো লেডী মেয়ো চার্লস হেনডেনকে কি নামে ডাকতেন?

—এলেক নামে। হোমস, অসাধারণ!

আমি চীৎকার করে বলি। বিস্ময়ে উত্তেজনাতে আমার গলা কেঁপে ওঠে।

—ব্যাপারটা কি নেহাত মিল?

হোমস কাঁধ ঝাঁকাল।

—যাই হোক মনে করে দেখো যে ১৮৮১ সালে সমস্ত রাশিয়াকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছিল ডিনামাইট বিস্ফোরণে। বোমা

হল দু ধরণের, এক রকম হল লোহার পাতে ঢাকা, ফিউজে আগুন ধরালে জ্বলে ওঠে। অন্যটি হল একটু অন্য রকম। ঘড়ির কাঁটাকে কাজে লাগানো হয়। শব্দটাকে চাপা দেবার জন্যে। কিন্তু ঘড়ির টিক টিক শব্দ ওর উপস্থিতি ঘোষণা করে। এটা মারাত্মক অসুবিধে। তবে দুর্ভাগ্য যে সেই বোমার টিকটিক শব্দটা পিয়ানোর শব্দে ঢাকা পড়ে গেছিল।

আমি রুদ্ধশ্বাসে শুনছি।

কোচম্যানের চাবুক আবার আওয়াজ তুলল। আমরা বাইরে তাকাই, ধীরে ধীরে চাঁদ যেন হেলে পড়ছে, নির্জন প্রান্তর দিয়ে চলেছে ল্যাণ্ডু গাড়ী।

লেডী মেয়ো আর সেলিয়া ফরসাইথ থাকে নীরবে, তাদের মুখে নরম চাঁদের স্নিগ্ধ আলো, ওরা যেন স্বর্গের রমণী। গোটা ঘটনাটি যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।

—হোমস, এতক্ষণে আমি সব বুঝতে পারছি।

আমি বলি।

—তাই ঐ ভদ্রলোক ঘড়ি দেখতে পারতেন না!

—উঁহু, দেখতে না, শুনতে।

—তার মানে?

—উনি ঘড়ির আওয়াজ শুনতে পারেন না।

—সে কি?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই, এই কথাই তোমাকে বলতে চাই। তোমার ছটফটে স্বভাবটাকে শান্ত রেখো। তুমি নিজেই আমাকে বাধা দিয়েছিলে। মনে আছে হোটেল সপ্লেনডাইডের ডাইনিং রুমে তিনি

যে ঘড়িটা চুরমার করেন সেটা তিনি একবারও দেখেননি! সেটা ছিল পর্দার আড়ালে।

—কিন্তু লাঠির আঘাতেই তো বোমাটা ফেটে যেতে পারতো? আমি প্রতিবাদ করি।

—সত্যি সত্যি বোমা হলে, হয়তো পারতো! কিন্তু লোহার আবরণের নীচে না ফাটারই সম্ভাবনা ছিল বেশী, হোমস কাঁধ ঝাকায়, ভদ্রলোক নিঃসন্দেহে সাহসী। বাবার মৃত্যুর স্মৃতি তিনি ভুলতে পারছেন না, সেই একই দল যে তাঁকে কায়দায় পাবার জন্যে ক্ষ্যাপার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে তাও তিনি জানেন। সব মিলিয়ে তাঁকে খানিকটা পাগলের মত করে তুলছে। ঘড়ির শব্দটাই আজ তাঁর কাছে আতঙ্ক।

—তারপর?

অপার্থিব অন্ধকারে ছুটন্ত গাছপালার দিকে চোখ রেখে হোমস বলতে থাকে, মিথ্যে চিঠি দিয়ে তাকে অডেসাতে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে ফাঁদ পাতা হল। কিন্তু আমিতো আগেই বলেছি তিনি আগেই সন্দেহ করেছিলেন। ফলে তিনি, অডেসা না গিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলেন।

—অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে, আমি বলি এবং বিশদ ভাবে বলতে গেলে গ্রেক্সটন লো হলে। যেখানে তিনি একটি অল্পবয়সী সুন্দরী তরুনীর হৃদয় আকর্ষণ করেছেন। আপনি কাঁদবেন না মিস ফরসাইথ, চোখ মুছে ফেলুন। আমি কোমল গলায় অনুরোধ করি।

—হ্যাঁ সম্ভাবনার কথা বলতে গেলে সেটাই প্রথম মনে আসে। কারণ মিস ফরসাইথের সাথে আলাপের সময়ই বুঝতে পারি পূর্ব পরিচিত না হলে লেডী মেয়োর মত কেউ একজন এক তরুন যুবকের

সাথে বহুদিনের পরিচিত জনের মত করে কথা বলতে পারেন না। বিশেষনটাও মিস ফরসাইথেরই।

—আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারি নি, মিঃ শার্লক হোমস, সেলিয়ার এলিয়ে দেওয়া মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে লেডী মেয়া বলেন, অ্যালেক্সিকে আমি সেন্ট পিটার্সবার্গে থাকতে এতটুকু বয়স থেকে জানি।

—যেখানে আপনার স্বামী বৃটিশ এমব্যাসীর ফার্ষ্ট সেক্রেটারী ছিলেন, এ খবরও আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি। আর অডেসাতে আমি আর একটা বিশেষ জরুরী সংবাদ আবিষ্কার করি।

—কি সংবাদ?

—নিহিলিস্টদের যে চিফ এজেন্ট, একজন দুর্ধর্ষ উন্মত্ত লোক, তার নাম এবং তিনি যে কিছুদিন যাবৎ গ্র্যাণ্ড ডিউকের খুব কাছাকাছি আছেন সেই খবর।

—অসম্ভব। আপনি শুনে রাখুন মিঃ হোমস এলেকের চিঠি এতক্ষণে পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস ওয়ারেনের কাছে পৌছে গেছে। আর আবার বলছি পার্কে পাহারা বসেছে, বাড়ীতে প্রহরী রয়েছে।

—হ্যাঁ সে চিঠি আমি দেখেছি আর তাতে যে ইম্পিরিয়াল রাশিয়ান আর্মস এর সিল রয়েছে তাও দেখেছি। কিন্তু খেঁকশিয়ালরা চিরদিনই হাউণ্ডদের চোখে ধুলো দেয়, তাও বোধ হয় আপনি জানেন!

—আপনি জানেন না মিঃ হোমস, শুধু পাহারাই সব নয়। বেচারী এলেক এখন একটা পুরোন, মোটা দেওয়ালের ঘরে বসে আছে। শক্ত দরজায় ভেতর থেকে ডবল তালা লাগান। জানলাগুলো এমন শক্ত করে আটকানো যে কেউ শত চেষ্টা করেও একখানা হাতও গলাতে পারবে না। চিমনী পিসটা অনেক পুরোন আর হুড়ে আট-

কানো। ওর ছিদ্রটা এত সরু যে লোক গলতে পারবে না। তাছাড়া ফায়ার প্লেসে তো আগুন জ্বলছে। কি ভাবে ওরা আক্রমণ করবে এলেককে?"

—কি ভাবে? হোমস বিড়বিড় করতে থাকে, ঠোঁট কামড়ায়, আঙ্গুলগুলো ঠুকতে থাকে হাঁটুতে; হয়তো একটা রাতের জন্য সে নিরাপদ কারন—

লেডী মেয়ো বিজয়ীর হাসি হাসেন, সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থাই করা হয়েছে। এমনকি ছাদের ওপরও পাহারা রয়েছে। এলেকের চাকর ট্রেপলে আগের একটা ট্রেনে ফিরে এসেছে। গ্রামের কার কাছ থেকে একটা ঘোড়া চেয়ে নিয়ে এসেছে, ওকে ছাদের ওপর পাহারায় রেখেছি।

শেষ কথাটার এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। হোমস হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়, ছাদের ওপর? বলেন কি ছাদের ওপর? ঘুরে দাঁড়িয়ে কোচম্যানের কাঁধ ধরে সজোরে ঝাঁকুনি লাগায়, ঘোড়া গুলোকে চাবুক লাগাও। আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা যাবে না, ঘোড়াগুলোকে চাবকাও।

সপাং সপাং চাবুকটা চিৎকার করে ওঠে, ঘোড়াগুলো লাফিয়ে ওঠে, হ্রেষা রব তুলে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে শুরু করে। আমরা ধাঁধায় পড়ে যাই।

—মিঃ হোমস আপনি কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন? রাগত স্বরে লেডী মেয়ো বলেন!

—আপনি দেখতেই পাবেন ফেলেছি কিনা। মিস ফরসাইথ আপনি কখনও গ্রাণ্ড ডিউককে ট্রেপলে বলে ডাকতে শুনেছেন লোকটাকে?

—আমি? না আমতা আমতা করে সেলিয়া ফরসাইথ বলে

আমিতো বলেছি চার্লস-মানে গ্রাণ্ড ডিউক তাকে ট্রেপ বলে ডাকতেন। আমি ধরে নিয়েছিলাম।

—ঠিক তাই আপনি ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু তার আসল নাম ট্রেপফ্, আপনার বর্ণনা শুনেই আমি বুঝেছিলাম লোকটা মিথ্যুক কিংবা বিশ্বাসঘাতক।

ঝোপঝাড়গুলো একাকার হয়ে সরে যেতে থাকে পেছনে, ঝড়ের বেগে উড়ে চলে।

—আপনার মনে আছে লোকটা বলেছিল মিঃ চার্লস হেনডেন পাঁচটা ঘড়ি দেয়াল আলমারীতে লুকিয়ে রেখেছে। ঘড়ি অর্থাৎ জীবন্ত বোমা পাগল ছাড়া কে লুকিয়ে রাখবে আলমারীতে? আর গ্রাণ্ড ডিউক অ্যালেক্সী তা কখনই রাখেন নি।

—কিন্তু হোমস' আমি প্রতিবাদ করি, ট্রেপফ ওর নিজের চাকর।

—জোরে কোচম্যান, আরো জোরে। কি বলছো ওয়াটসন?

—মনিবকে খুন করবার কত রকম সুযোগইতো ট্রেপফ পেতে পারে। ছোরা বিষ এত সব নিরাপদ অস্ত্র ছেড়ে সে বোমা বেছে নিতে যাবে কেন?

—নিশ্চয়ই পারতো। তবে এটাই ঐ দলের বিশেষ অস্ত্র। এই অস্ত্র ছাড়া ওরা এক পাও এগোবে না। ওদের পথের কাঁটাকে ওরা টুকরো টুকরো করে ছিটিয়ে দেবে বোমার আঘাতে। না হলে পৃথিবী ওদের শক্তিকে জানবে কেমন করে? অন্ততঃ ওরা তাই ভাবে।

—তাহলে স্যার চার্লস ওয়ারেনের চিঠিটা? লেডী মেয়োর গলার স্বরে উত্তেজনা।

—আপনাকে নিঃসন্দেহে জানাতে পারি সেটা কাছাকাছি কোন রাস্তার নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে।

ওইতো! ওটাই নিশ্চয়ই গ্রেক্সটন লো হল?

এর পরের ঘটনাগুলো আমায় মনের মধ্যে কেমন গোলমাল পাকিয়ে গেছে। যতদুর মনে পড়ে জ্যাকবিয়ান ধাঁচের একটা লালচে ইঁটের নিচু বাড়ী, সমতল ছাদ। মনে হচ্ছিল বাড়ীটা আমাদের দিকে ছুটে আসছে। গাড়ী থামতেই লেডী মেয়ো একপাল নার্ভাস চাকরের পালকে তীক্ষ্ণস্বরে নির্দেশ দিতে থাকেন। আমি আর হোমস মিস ফরসাইথের পিছু পিছু ছুটি, একটি প্রশস্ত ওক কাঠের সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠি। সিঁড়ি শেষ হয়ে একটা মইয়ের মত সরু সিঁড়ি উঠে গেছে ছাদে। এর গোড়ায় এসে এক মুহূর্ত থামে হোমস, মিস ফরসাইথের বাহুতে আঙ্গুল রেখে শান্ত স্বরে বলে—আপনি এখানে থাকুন। হোমস পকেটে হাত রাখতেই ক্লিক করে একটি ধাতব শব্দ বাজে। বুঝতে পারি হোমসও সশস্ত্র!

—এসো ওয়াটসন। আমরা ওপরে উঠি। হোমস নিঃশব্দে ছাদের দরজা খুলতে খুলতে বলে, কোন শব্দ নয় আর ওকে দেখলেই

হঠাৎ একটি দেশলাই জ্বলে ওঠে, একটি জলন্ত ফিউজের হিসহিস শব্দ শুনতে পাই, চিমনির গায়ে একটি ঠুকঠুক শব্দ শোনা যায়। হোমস সামনের দিকে ছুটে যায়।

—গুলি কর ওয়াটসন।

দুজনের পিস্তল একসাথে গর্জে ওঠে। চকিতে দেখতে পাই ট্রেপফের ফ্যাকাশে মুখটা ঝাঁকুনী দিয়ে আমাদের দিকে ঘুরে যায়, সাথে সাথে একটা সাদা অগ্নিবলয়ের মধ্যে দিয়ে গোটা চিমনিটা সোজা আকাশে উঠে যায়। অস্পষ্ট চেতনার মধ্যে ছাদটা ভেঙে পড়ে আমার

পায়ের নিচে, গড়িয়ে পড়ে যেতে থাকি আমি। উৎক্ষিপ্ত ইটের টুকরোর আঘাতে গম্বুজটার ওপরে ধাতব শব্দ বাজতে থাকে ক্রমাগত।

হোমস কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—তোমার কি লেগেছে, ওয়াটসন?

বহু কষ্টে দম নিল ও।

—সামান্য একটু। ভাগ্যক্রমে আমবা পরস্পরের মুখের ওপর ছিটকে পড়েছিলাম, নাহলে—

আঙুল তুলে টুকরো টুকরো ভাঙা চিমনিটার দিকে দেখাই।

ঘন ধোঁয়ার আস্তরনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অবশেষে এসে যাই বহু আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির কাছে।

—আমাদের দেখে লোকটা হঠাৎ চমকে গিয়েছিল, তাই বোমটা সে ঠিক মত ফেলতে পারে নি, চিমনির ওপরে ওটা ফেটে গেছে।

হোমস বলে।

—আমাদের বোধহয় সামান্য দেরী হয়ে গেল, ওয়াটসন। জানিনা ভাগ্যে কি আছে। গ্রাণ্ড ডিউককে কি বাঁচাতে পারবো?

হঠাৎ ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—লেডী মেয়োর কথাটা তোমার মনে আছে ওয়াটসন?

—কোন কথা?

আমি বোকার মত বলি।

—ঐ যে চিমনিটা ভেতর দিয়ে আটকানো। তাড়াতাড়ি এসো ওয়াটসন, একমুহূর্ত সময় নেই আমাদের হাতে।

আমারা ছাদের দরজা দিয়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে এলাম। ধোঁয়ার আবরণের মধ্যে দিয়ে টুকরো টুকরো ভাঙা দরজা দেখতে পাই।

তারপরেই ডিউকের শোবার ঘরে ঢুকে পড়ি। ঢুকতেই যা দেখলাম তাতে হোমসের মত লোক শব্দ করে ওঠে।

আমরা দেখলাম যে ভারী পাথরের ধ্বংসাবশেষ? নীচে পড়ে আছে বিরাট একটা গহ্বর। দেখলেই মনে হবে যে ওটা ছিল প্রাচীন কোন চুল্লী।

তার মুখ থেকে আগুন ছিটকে পড়েছে। ঘরের বাতাস ধোঁয়াতে দূষিত। সারা ঘরে ছড়ানো আছে মুঠো মুঠো ছাইয়ের গুঁড়ো।

ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে হোমস তীরের মত ছুটে গেল, ভেঙেপড়া পিয়ানোর ওপর হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়ে বলে—ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি।

তারপর চীৎকার করে ওঠে, মনে হচ্ছে এখনও বেঁচে আছে।

আমি ডিউককে দেখতে পেলাম। পিয়ানোর ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছে দেহটা।

বাকী রাতটুকু কেটে গেল প্রচণ্ড সংগ্রামে। ডিউককে নিয়ে আমরা লড়ছি ঘনীভূত মৃত্যুর সনে। গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে রাত ফুরিয়ে আসে। সূর্য এসে উঁকি মারে পূবের আকাশে। ডিউক তখন স্বাভাবিক নিদ্রাতে মগ্ন।

—আঘাতটা খুব বেশী নয় ওয়াটসন। আহত হননি তার জন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। শব্দটাই ভয়াবহ হতে পারতো। ঐ শব্দটাই তো মৃত্যু এনে দেয়। সেলিয়া ফরসাইথের সেবাই এখন ডিউককে সারিয়ে তুলবে।

হোমস মন্তব্য করে। আমরা ঘরের মধ্যে ডিউক আর তার মাথার কাছে উদ্বেল-আকুল সেলিয়াকে রেখে বাইরে এলাম।

আমাদের কাজ ফুরিয়ে গেছে। এবার শুরু ওদের খেলা।

রৌদ্রে ঢাকা ভোরে শিশির ভেজা ঘাসের বুকে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে আমি মন্তব্য করি—হোমস, সবটুকু কৃতিত্ব তুমিই পাবে। তোমার সাহস আর বুদ্ধি ডিউককে বাঁচিয়ে তুলেছে।

অন্যমনস্ক হয়ে হোমস বলে—না, ওয়াটসন। এক্ষেত্রে আমি হয়তো হেরেই যেতাম যদি না ঐ বাড়ীটা অমন ভাবে তৈরী হত।

—তার মানে?

আমি অবাক হয়ে বলি।

—ভেবে দেখ তো, দুশ বছরের পুরোন একটা আগুনের চুল্লীর চিমনী আমাদের ডিউককে বাঁচিয়ে তুলল। গ্রাণ্ড ডিউক অ্যালেক্সির ভাগ্য ভালো যে ঐ বাড়ীতে সে ছিল। নাহলে বোমার আঘাতে জীবন নাশ হত তার। আমার সবটুকু বাহবা পাবে কিং জেমসের সময়ের লোকেরা যারা দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বাড়ীটাকে বাঁচাবার সমস্ত কায়দা জানতো।

হোমস চুপ করল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ষ্টেশনে এলাম।

দূরে, অনেক দূরে গ্রেক্সটন লো হলের প্রাসাদটা ধীরে মলিন হয়ে আসে।

যদি কখনো এখানে আবার আমি আসি তাহলে ঐ ভয়ঙ্কর সব মুহূর্তগুলোর কথা মনে পড়বে।

* * *

এখনও মাঝে মাঝে ঐ কাহিনীটি আমার মনে পড়ে। তখন ক্ষণকালের জন্যে সেলিয়ার মুখখানি মনের অ্যালবামে ভেসে ওঠে।

জানতে ইচ্ছে করে ডিউকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে কি না। হাজার কাজের ভীড়ে জানা আর হয় না। যদি হয়ে থাকে তবে সে কি হোমসকে কৃতজ্ঞতা জানাবে তার ডিউককে সারিয়ে তোলার জন্যে?

অবশ্য আমার বন্ধু শার্লক হোমস কারও কৃতজ্ঞতার পরোয়া করে না।

সে এক অদ্ভুত মানুষ।

## ॥ চার ॥

হোমসের ঘরে ঢুকেই দেখি গম্ভীর মুখে সে তাকিয়ে আছে খবরের কাগজের দিকে।

তখন সবে বিকেলটা শেষ হয়েছে, গ্যাসবাতিগুলো জ্বলছে ধূসর বিবর্ণতা নিয়ে, ধীর কুয়াশার ঘন আস্তরণটা ক্রমেই যেন টুঁটি চেপে ধরবে।

এমনভাবে প্রতিদিনই সূর্য বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সর্বনাশা কুয়াশা এসে ছেয়ে ফেলে লণ্ডনকে। এক হাত দূরের মানুষকে পর্যন্ত চেনা যায় না, এমনই ঘন তার প্রলেপ।

ফায়ারপ্লেসের আগুনে শীতভাবটা একটু কমলেও তার প্রকোপ বড় বেশী। থেকে থেকে দমকা বাতাস চোরা পায়ে ঢুকে পড়ছে খোলা জানলা দিয়ে।

ভাবছিলাম, ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটের এই ঘরটিতে বসে আমার বন্ধুটি কত দুরূহ সমস্যার সমাধান করেছে।

ঐ সিঁড়ি বেয়ে প্রতিদিন এসে হাজির হয়েছে বিচিত্র ধরণের মানুষ। তাদের কেউ বা এসেছে দামী গাড়ীতে চড়ে, কারও ঘোড়ার

গাড়ী সশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে, কেউ বা পায়ে হেঁটেই পথটুকু অতিক্রম করেছে।

বয়েসে, চেহারাতে, সামাজিক পদমর্যাদাতে তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ। কেউ বা অল্প বয়েসের কিশোরী কোন অভাবিত ঘটনাতে বিমূঢ়া, তাদের পবিত্র চোখের কোণে বিস্ময় আর ভীতি ঝিকিয়ে ওঠে, তারা হোমসের কাছে আত্মসমর্পণ করে সাহায্য প্রার্থনা করে।

আবার অনেকে হলেন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের চড়াই উতরাই-গুলো সযত্নে পার হওয়া বয়স্কা ভদ্রমহিলা। যাঁরা মনে মনে ভীতা শঙ্কিতা হলেও বাইরের ঘন আবরণে সেই ভয়টাকে চেপে রাখবার প্রয়াস করেন! যাঁরা সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন এবং তাঁদের আচার-আচরণে সেই ভাবটা প্রকাশ করতে কসুর করেন না। এঁরা চেপে হাসেন, সেই হাসি কখনো উচ্চস্বরের হবে না, ভীষণ ভয় পেলেও চোখের কোনে ফুটিয়ে রাখেন তাচ্ছিল্য ভাব। হোমসকে এঁরা খুব বেশী পাত্তা দেন না।

আবার কাজের শেষে এঁদের শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টিতে দেখেছি অশেষ কৃতজ্ঞতা ঝরতে।

হোমসের পাশে বসে থাকতে থাকতে ঐ দুধরনের মহিলাই আমি দেখেছি। তবু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে বেপরোয়া কিশোরীদের আমার ভালো লাগে। তাদের আচরণে যে খোলাখুলি ভঙ্গিমাটুকু আছে সেটা আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করে। তাই বোধ হয় হোমস প্রায়ই আমার ঐ দুর্বলতাকে ব্যঙ্গ করে বলে, ওয়াটসন, মনে রেখো সুন্দরী তরুণীরাও অপরাধ করতে পারে।

আমি নিজের দুর্বলতার কথা জানি। রূপবতী কিশোরীদের মনের মধ্যে যে জঘন্য ষড়যন্ত্রের কুটিল কোন অভিসন্ধির বীজ বোনা হতে পারে সেটা আমার সম্পূর্ণ অজানা।

তাইত দেখা গেছে যে তারা হল ভয়ঙ্কর কোন পাপচক্রের হাতের পুতুল।

পুরুষদের মধ্যেও এই প্রকৃতিগত পার্থক্য চোখে পড়ে।

খটখটে লাঠি ঠুকে ঠুকে প্রবীন আভিজাত্যের তীব্র আহমিকা বোধ নিয়ে সামনে হাজির হন কোন বৃদ্ধ, যাঁর মনের মধ্যে ঐ পৃথিবী সম্পর্কে দারুন বিতৃষ্ণা। যিনি বর্তমান যুগের সব কিছুকেই অভিসম্পাত করেন। হোমসের মত অল্পবয়সী ছোকরাকে তাঁর মনেই ধরে না।

তিনি দৃঢ় ভাবে পাইপ টেনে টেনে তাঁর সমস্যার কথা বলতে শুরু করেন।

যেন বেকার স্ট্রীটে আসবার আগে প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছেন যে কিছুতেই কম বয়েসী ঐ হোমসের কাছে ভেঙে পড়বেন না।

আবার তাঁকেই দেখেছি হোমসের অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্যের কাছে মাথা নত করতে।

কখনো দরজাতে মৃদু টোকা দেন মাঝবয়েসী গম্ভীর পুরুষ। সফলতার চিহ্ন তাঁদের সর্বাঙ্গে, পরিপাটি করে আঁচড়নো চুল, নিখুঁত করে কামানো দাড়ি, কোট আণ্ডার কোট শার্ট অথবা টাউজার্সে নিপুনতার ছোঁয়া, এমনকি জুতো জোড়া পর্যন্ত চকচক করছে।

বিপদে পড়লেও তাঁরা নিজেদের মর্যাদাকে বিসর্জন দেন না।

হোমসের সঙ্গে খুব ভেবে চিন্তে আচরণ করেন। প্রতি মুহুর্ত্তে তাদের ভয় থাকে যে ঐ মহান অহংকারের প্রাচীরটা যেন ভেঙে না যায়।

আমি ওদের একদম পছন্দ করি না। তার চেয়ে আমার অনেক ভালো লাগে হৈ হৈ করে বেল না বাজিয়ে দরজাতে করাঘাত না করে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকে পড়া তরুণ ছেলেদের।

তারা চেয়ারে ধপ করে বসেই তাদের কথা বলতে শুরু করে, কথার মধ্যে ফুটে ওঠে তাদের হতাশাবোধ অথবা দুঃখ।

কোন অনুভূতিকে তারা চেপে রাখেনা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোসে। তারপর যদি প্রেম ঘটিত কোন সমস্যা হয় তো তারা নির্দ্বিধায় সব বলে দেয়।

এই একটি ব্যাপারে মেয়েরা, বিশেষ করে কমবয়েসী মেয়েরা দারুন চাপা, অনুরাগ যদি মঞ্জরিত হয় তারা থাকে দারুন মৌনা, এমন কি দয়িতের নাম উচ্চারণে তাদের গালে দেখা দেয় সলাজ আভা। তারা আঙুলে আঙুল রেখে মাথা নীচু করে ঘটনাটা বলে যায়!

প্রেমিকের প্রতি ঐ দুর্বলতাটুকু আমার দারুন ভালো লাগে।

শুধু আচরনেই নয় অন্য সব দিকেও অনেক প্রভেদ চোখে পড়ে।

কেউ যা থাকেন অভিজাত মহল্লাতে, কারও বাস মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মহলে, অনেকে আসে শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে।

প্রাচীন রাজবংশের গৌরব কারও রক্তে থাকে, কেউ বা পেয়েছে মধ্যযুগীয় সামন্ত তন্ত্রের আগুন, অনেকে নেহাত মানুষ বলেই পরিচিত।

এমনভাবে বেকার স্ট্রীটের ঘরে বসে আমি যেন গোটা পৃথিবী-টাকে দেখতে পাই। দেখতে পাই বিচিত্রময় মানুষদের। সব কিছুতে তফাত হলেও অন্তরে তারা সবাই এক। তাদের সবার মনে অনুভুতি আছে, আছে প্রেম দুঃখ অভিমান।

পুত্রের জন্য তারা সবাই উৎকণ্ঠিত হয়, প্রেয়সীর জন্যে থাকে উদ্বেল-ব্যাকুল, ভয়ঙ্কর কোন ঘটনা তাদের হৃদপিণ্ডে ঝড় তোলে, হত্যা রক্তের মধ্যে দামামা বাজায়।

তারা সবাই মানুষ।

কেন জানি না হোমসের সামনে বসে ঐ সব এলোমেলো কথা মনে পড়ছিল।

হয়তো বা সামনে বসা হোমসের নীরবতাই এর জন্যে দায়ী।

সে গভীর মনোযোগ দিয়ে কাগজগুলো পড়ছে। আমি বুঝতে পারছি যে এখন তার মনের মধ্যে নীরব ঝড় উঠেছে। উত্তাল হয়েছে সমুদ্র, সে কোন বিষয়ে মন দেবার চেষ্টা করছে।

প্রথম প্রথম এই অবস্থায় দারুন কষ্ট হত আমার। চোখের সামনে দেখছি যে একজন মানুষ রহস্য জালে আটকা পড়েছে, অথচ আমি তার বিন্দুমাত্র জানি না।

এখন জানি যে এটাই হল তার অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি। সে প্রথমে থাকে একেবারে নীরব, তারপরে ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করে, অবশেষে সব রহস্য-সমাধান হলে পুরো কাহিনী তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমাতে বলে দেয়।

তাই এখন আর দুঃখিত হই না, আবেগকে সংযত করে রাখি।

হোমস যেন কিছুক্ষণ বাদে কাগজের পাতা থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল।

আমি কড়িকাঠ গুণছিলাম। তাকাচ্ছিলাম বাইরের দিকে, কুয়াশা যেন অক্টোপাস হয়ে আঁকড়ে ধরবে শহরটার গলা, তারপর হোমসের মুখের দিকে চোখ পড়ল।

হোমস একটু হেসে বলে—কি বন্ধু, বড় একা মনে হচ্ছে?

আমি মাথা নাড়ি।

—এই কাগজটা দেখো। আমার মনে হয় আগামী ক'দিনের উত্তেজনার খোরাক এখানে পাবে।

এই বলে শার্লক হোমস্ কাগজখানা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

আমি দেখলাম। প্রথম পাতাতেই বড় বড় অক্ষরের শিরোনাম—

## বিশ্ববিখ্যাত অভিনেত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু !

তিন কলমজুড়ে খবরটা ছাপা হয়েছে। বিখ্যাত নায়িকা এডিসা ব্রাউন খুন হয়েছে।

খবরটা পড়ে দারুন আঘাত পেলাম আমি। ইংল্যাণ্ডের সমস্ত মানুষ এডিসার অভিনয়ে মুগ্ধ। বলা যেতে পারে সে হল সমকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়িকা। শহরে শহরে তার যে কত গুণমুগ্ধ ছড়িয়ে আছে কেউ তা বলতে পারে না।

আমি খবরটা পড়তে থাকি—

অসামান্য নায়িকা এডিসা ব্রাউনের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। সে মারা গেছে তার' লণ্ডন নর্থ ফোরের ব্রাউনস উড রোডের নিজস্ব বাড়ীতে।

পুলিশী সূত্রে জানা গেছে যে গতকাল রাতে পুলিশ টেলিফোনে খবর পায় ঐ বাড়ীতে এক মহিলার মৃতদেহ পড়ে আছে।

তখন থানাতে ছিলেন ইন্সপেক্টর স্মিথ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উড রোডের বাড়ীতে ছুটে গেলেন।

তখন বেশ রাত হয়েছে। ইন্সপেক্টর টমাস স্মিথ এডিসাকে পরে থাকতে দেখলেন। নিজের বেডরুমে শোয়ানো ছিল [illegible] দেহটা।

বিছানাতে লুটিয়ে আছে এডিসার দেহটা।

ইন্সপেক্টর স্মিথ তদন্ত শুরু করেছেন।

আমার অনুভূতিরা স্তব্ধ হতে থাকে। নিমেষে মন চলে গেল উড রোডের ঐ বাড়ীটির বেডরুমে।

সঙ্গে সঙ্গে হোমস বলে—কি কবি, কাতর হয়োনা। আমাদের এখুনি বেরোতে হবে। এই দেখো—

তার হাতে ধরা একটি চিঠি। লিখছেন পুলিশ কমিশনার। তাঁর অনুরোধ যে হোমস যেন নিজে ঐ খুনের ব্যাপারে তদন্ত করেন।

আমি অভাবিত আনন্দে কেঁপে উঠি। যদিও দুঃখের একটা গাঢ় ছায়া আমাকে গ্রাস করেছিল, কেননা এডিসা ব্রাউনের মত নায়িকা আজ মৃত রমণী।

ঐ ভাবনাটা মনের মধ্যে কাঁটার মত খচ খচ করছিল।

—চলো ওয়াটসন, এখুনি যেতে হবে।

আমরা কুয়াশা ঢাকা রাস্তায় এলাম। শীতের সন্ধে, পথিক বেশী নেই। গাড়ী চলেছে ধীর ভাবে।

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই উড রোডে পৌঁছে গেছি। সারা পথে হোমস কোন কথা বলেনি।

শহর থেকে একটু দূরে খোলামেলা পরিবেশে এডিসা ব্রাউনের বাড়ীটি। চারিদিকে বাগান, মাঝখানে ঐ সুন্দর বাড়ী। যেখানে জীবনের অনেকগুলো দিন এডিসা কাটিয়ে গেছে।

ইন্সপেক্টর টমাস স্মিথের সঙ্গে দেখা হল। তিনি নীচের ঘরে বসে বাড়ীর পরিচারিকা ও দারোয়ানের জবানবন্দী নিতে ব্যস্ত ছিলেন।

তরুন ইন্সপেক্টর, নিজের উপর গভীর আস্থা আছে তাঁর। হোমস ঢুকলেন কিন্তু উনি কোন অভিনন্দন জানালেন না।

হোমস তাঁর দিকে চেয়ে ধীরে বলে—দেখুন মিস্টার টমাস স্মিথ, আমি একবার এডিসা ব্রাউনের বেডরুমটা দেখতে চাই।

হোমসের অসামান্য কৌতুহলে যেন বিরক্ত হয়েছেন টমাস স্মিথ। তিনি প্রশ্ন করেন—ও ঘরতো সীল বন্ধ। মৃতদেহ এখনো সরানো হয় নি। আমি কাউকে ঢুকতে দিতে পারি না।

হোমসের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। শান্ত স্বভাবের জন্য তার সুনাম আছে। যে কোন পরিস্থিতিতে সে মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

ধীর ভাবে পকেট থেকে ঐ চিঠিটা বের করে ইন্সপেক্টরের সামনে মেলে ধরল। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, আশাকরি এবারে আমাকে ঢুকতে দিতে কোন আপত্তি হবে না আপনার?

মুহূর্তের মধ্যে যেন বদলে গেলেন ইন্সপেক্টর স্মিথ। তাঁর উদ্ধত আচরণে কোমল স্পর্শ পড়েছে।

তিনি অমায়িক ভাবে বলেন—আপনিই হোমস! আসুন আমি সব দেখাচ্ছি।

তাঁর এই শ্রদ্ধা হোমসের সুনামের প্রতি অথবা কমিশনারের নির্দেশের প্রতি, সেটা বোঝা গেল না।

বাগানে একটি গ্যাস বাতি জ্বলছে।

ইন্সপেক্টর টমাস স্মিথকে অনুসরণ করে আমরা দোতলার সিঁড়িতে পা রাখলাম।

এডিসা ব্রাউন শুধু অভিনেত্রী ছিল না, তার শখ ছিল সুন্দর করে বাড়ী সাজানো। আমরা প্রমাণ পেলাম।

টানা বারান্দার শেষ ঘরটি তালাবন্ধ। একজন পুলিশ পাহারাতে বসে আছে!

ইন্সপেক্টর টমাস স্মিথ চাবি খুললেন। আমি ভেতরে ঢুকলাম। অন্ধকার ঘর। উনি বাতি জ্বাললেন। মৃদু আলোকে উদ্ভাসিত হল ঘরখানি।

ভ্যাপসা একটা গন্ধ আসছে নাকে। ঘরের এককোনে বিছানাতে শোয়ানো আছে এডিসা ব্রাউনের মৃতদেহ। ওপরে সাদা চাদর ঢাকা।

হোমস খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করল। এডিসার দেহের দিকে তাকানো যায় না। অমন ঢলঢলে মুখখানিতে আতঙ্কের ছাপ! প্রায় বিবস্ত্রা সে, মনে হয় মরবার আগে অবধি আততায়ীর সঙ্গে লড়াই করেছে।

এডিসার বুকের বাঁ দিকে ক্ষত চিহ্ন। রক্তে বিছানা ভেসে গেছে। তার ডান হাতটা মুঠো করে ধরা, তার মধ্যে কিছু একটা রয়েছে।

হোমস মৃতদেহ দেখে এবার ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল।

পরিপাটি করে সাজান বেডরুম, একধারে ড্রেসিং টেবিল, অন্যদিকে বেডসাইড টেবিল।

সব দেখে সে জানলাতে দাঁড়ালো। দূরের আকাশে চাঁদ উঠেছে। কুয়াশা ঢাকা বিবর্ণ মলিন চাঁদ।

ইন্সপেক্টর টমাস স্মিথ হোমসের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তার আগ্রহ দেখে হোমস বলে—আমি এখন চলি, মিস্টার স্মিথ। যথা-সময়ে আবার হাজির হব। আপনি মিস ব্রাউনের দেহটা সরিয়ে ফেলুন।

আমরা ফিরে এলাম! উড রোডের বাড়ীটি তার অভিশাপ বুকে নিয়ে একলা দাঁড়িয়ে রইল।

সারা পথে সে কোন কথা বলে নি। যেন থমথমে ঐ পরিবেশটার জের আমরা টেনে চলেছি।

## ॥ পাঁচ ॥

"এডিসা ব্রাউন। লণ্ডনের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বিখ্যাত ইম্পি-রিয়াল থিয়েটার হলের বিতর্কিত নায়িকা। যে নাটক মঞ্চস্থ হত তার নায়িকার ভূমিকাতে অবতীর্ণ হত ঐ এডিসা। তিরিশের মধ্যে বয়েস, সুন্দরী বললে কম বলা হবে, নিখাদ দেহের গড়ন, অপরূপ তার দুটি চোখ। সারা দেহে মধ্য যৌবনের প্লাবন। লাস্যময়ী এডিসাকে দেখলে মনে হবে যেন কুড়ি-বাইশের উদ্ভিন্ন ললনা।

ইতিমধ্যে দু'বার বিয়ে করেছিল সে। কোন বিয়েই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। প্রথম স্বামীর নাম জন হাওয়ার্থ, দ্বিতীয় জন টম স্ক্রীম্যান, বিয়ের ছ'মাস থেকে এক বছরের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়েছিল। ইদানীং একাই থাকত সে।

তার চরিত্র ঘিরে কোন কলঙ্ক রটে নি। অভিনেত্রী জীবনের স্বেচ্ছাচারকে বাদ দিলে তার জীবনে বিতর্কের কোন অবকাশ ছিল না।

হল হিসেবে ঐ ইম্পিরিয়াল হলের বিশেষ আভিজাত্য আছে। দুশো বছরের ওপর বয়েস হল তার। ঐ বিরাট প্রাসাদটিকে রাজগৃহ বললে ঠিক বলা হয়। ইংল্যাণ্ডের সামন্তযুগে ঐ হলটি ছিল বীর নাইট আলেকজাণ্ডার ডুমারের। পরে অনেক ভেঙেচুরে বর্ত্তমান রূপটি পেয়েছে।

সেক্সপীয়রের সমস্ত নাটক তারা অভিনীত করেছে। গল্প আছে যে সেক্সপীয়র নাকি নিজে এখানে অভিনয় করে গেছেন। এককালে এই থিয়েটার হলে সাধারণ লোক ঢুকতে পারত না, এত বেশী ছিল এখানকার টিকিটের দাম।"

আমি শেষ করলাম। কাগজে এডিসা ব্রাউনের পুরো কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

আমার সামনে উত্তেজিত হোমস পায়চারী করছে। আমি জানি তার মনে এখন কি ঘটে চলেছে। এই অবস্থাটা দুঃসহ, সে নিজেকে স্থির রাখতে পারে না।

—দেখো, ওয়াটসন, এডিসা খুন হয়েছে, এতে অবাক হবার কি আছে? সুন্দরী এক যুবতী একা থাকে। তার ওপরে অভিনয় করে, তাকে ঘিরে রহস্য তো দানা বাঁধবেই! তবে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এডিসার জীবনে এমন কোন কলঙ্ক ছিল না যার জন্যে তাকে হত্যা করা হতে পারে।

—জন হাওয়ার্থ কি বললেন?

ভেবেছিলাম এডিসার প্রথম স্বামীর নামটা বলে চমকে দেব হোমসকে। হোমস সহজ ভাবে বলে, না ওয়াটসন, জন হাওয়ার্থ আমাকে নিরাশ করেছেন। নেহাৎ ভদ্রলোক উনি, স্কুলের শিক্ষক।

এডিসার সঙ্গে তাঁর বাল্যপ্রেম। তারই পরিণতি ঐ বিয়ে। অবশ্য দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হয় নি। আট মাস বাদে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল।

—টম ফ্রীম্যান।

ঠোঁট উল্টে হোমস বলে, একই রকম। তবে পুরুষ হিসেবে টম যেকোন রমণীর কাম্য হতে পারে। চেহারাতে সুন্দর, অর্থের প্রাচুর্যে অহংকারী এক দাম্ভিক ব্যবসায়ী। এডিসাকে তিনি একটি নাটকে দেখে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করেন। এডিসাও হয়তো নেহাত শখ করে বিয়ে করেছিল তাঁকে। অবশ্য এডিসার সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়াতে তিনি এতটুকু ক্ষুন্ন হন নি। কিছুদিন আগে আবার বিয়ে করেছেন টম ফ্রীম্যান।

দু'জন প্রাক্তন স্বামীকে বাদ দিলে সন্দেহটা কার ওপর পড়বে সেটা আমার বুদ্ধির বাইরে।

—শোনো ওয়াটসন, তোমার কি মনে আছে যে ঠিক এক বছর আগে টেমস নদীর ধারে এক রূপসী যুবতীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল?

আমার দুর্বল স্মৃতিশক্তির ওপর কোন আস্থা নেই আমার। আমি মাথা নেড়ে না বললাম।

অন্য সময় হলে এ নিয়ে রসিকতা করত হোমস, এখন সে এসবের উর্দ্ধে। তাড়াতাড়ি বলে—ঐ যুবতীর রক্তাক্ত দেহটি এক সকালে পুলিশের চোখে পড়ে। যেখানে মৃতদেহটি পাওয়া যায় তার কাছে আর কখনো কোন হত্যাকাণ্ড ঘটেনি।

অনুসন্ধান জানা গেল যে মেয়েটির নাম বারবারা, বয়েস চব্বিশ। ঐ যুবতীর ডান হাতের আঙুল থেকে কবজী অবধি কাটা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করে। বারবারার বাড়ীর লোকেরা তার এক

প্রাক্তন প্রেমিকের নাম বলল, ছেলেটির নাম পিটার। পুলিশ তার অপরাধ প্রমান করতে পারে নি।

পাইপে অগ্নি সংযোগ করে ধোঁয়া ছেড়ে হোমস বলে—আজও ওটা ধাঁধা হয়ে আছে! তবে আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয় বারবারা আর এডিসাকে একজন খুনী হত্যা করেছে।

—এমন মনে হবার কারন?

—কেননা ওদের হত্যার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ দেখো বারবারা আর এডিসার মধ্যে বয়েসের ব্যবধান ছ'বছর হলেও দু'জনেই যুবতী এবং অসামান্য রূপবতী। দ্বিতীয়তঃ ওদের হত্যা করা হয়েছে শেষ রাতে। তাই আততায়ীর সঙ্গে বেশ ঘনিষ্টতা ছিল ওদের। নাহলে সারা রাত তার সঙ্গে কাটাতে পারে না। এবং তৃতীয়তঃ—

হোমস হঠাৎ চুপ করে গেল। পাইপে ঘন ঘন টান মেরে বলে, ওদের হাত কেটে ফেলা হয়েছে! এডিসার ক্ষেত্রে হত্যাকারী সময় পায় নি! চলো ওয়াটসন, কমিশনারের কাছে যেতে হবে।

আমাকে অবাক হবার সুযোগ না দিয়ে হোমস উঠে দাঁড়ায়।

তখন দুপুর হতে চলেছে। আজ রোদ যেন একটু প্রখর।

আমরা কমিশনারেব অফিসে পৌছলাম। পুলিশ অফিসাররা এডিসার মুঠোবন্ধ হাতখানি কেটে ফেলেছে। বন্ধ মুঠি থেকে পাওয়া গেছে একটা ছোট শৌখীন নস্যির কৌটার ঢাকনা। তার ভেতরে সামান্য সুরভিত নস্যির গুঁড়ো।

হোমস সাবধানে নস্যির স্বাস নিল। কৌটোটা সন্তর্পণে দেখল। ঢাকনিতে ইংরেজী "এ" অক্ষর লেখা। ওটা সে নিজের কাছে রেখে দিল!

পুলিশ অফিসার হোমসকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, তাঁর দৃঢ় ধারণা যে হোমস নিশ্চয় ঐ সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

টমাস স্মিথের রিপোর্ট পাওয়া গেল। এডিসার পরিচারিকা কিছুই জানে না। ঘটনার দিন কোন পুরুষকে সে ঢুকতে দেখে নি। কেননা সে কাজ সেরে সন্ধের মধ্যেই ফিরতো। স্থানীয় লোকেরা কিছু বলতে পারল না। তাছাড়া অভিনেত্রী বলে এডিসাকে সবাই এড়িয়ে চলতো, এডিসাও পাড়াতে কারো সঙ্গে মিশতো না।

তখনকার মত বিদায় নিতে হল। বিকেলে তার সঙ্গে ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে যেতে হবে।

লণ্ডন শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এক বিরাট প্রাসাদে ঐ ইম্পি-রিয়াল থিয়েটার হল। যেটি আগে ছিল এক নাইটের বিলাস ভূমি, এখন যেখানে প্রতি রাতে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে এসে দাঁড়ায় কুশীলবেরা।

একদিন এডিসা ব্রাউনও সহস্র দর্শকের করতালি পেত।

হোমস সোজা গেল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে। ইম্পিরিয়াল থিয়েটার কোম্পানী পুলিশের কাছ থেকে এডিসার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছে। আজ তাঁরা কোন অভিনয় করছেন না। এডিসার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হলে সমস্ত অভিনয় বন্ধ আছে।

হোমস ম্যানেজিং ডিরেকটরকে এডিসার কথা জিজ্ঞেস করল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বেশ সহানুভূতি ভরা কণ্ঠে বলেন—দেখুন, আমার হলে এডিসা অনেকবার অভিনয় করেছে। বলতে গেলে আমার সব কটি মঞ্চ সফল নাটকে সে ছিল প্রধান চরিত্রের শিল্পী, তার অভাব আমি কোনদিনই পূর্ণ করতে পারব না।

হোমস বলে—আচ্ছা মিষ্টার গ্রাহাম, আপনি কি ঐ হত্যাকাণ্ডের কোন সূত্র দিতে পারেন।

মিস্টার গ্রাহাম চিন্তিত হয়ে বললেন—দেখুন, আমি যতোদূর জানি যে মেয়েটির কোন শত্রু ছিল না। সব লোকের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত সে। তার মিষ্টি স্বভাবের জন্যে সবাই তাকে ভালো-বাসতো। তবে হলের বাইরে তো তার বিস্তৃত জীবন ছিল। সেই জীবনের খবর আমার জানা নেই।

—আপনি কি মনে করেন যে এডিসার ব্যক্তিগত জীবনে কোন কালিমা ছিল ?

মাথা নেড়ে গ্রাহাম বলেন—আমার সামনে সে কোন কিছু করে নি। অভিনেত্রী হিসেবে সকলে তাকে সম্মান করত।

—আচ্ছা আপনার কি মনে হয় ? এডিসাকে কেউ কি প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপারে হত্যা করেছে ? না কি এর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে ?

হোমস প্রশ্ন করে।

তাদের সংলাপের মধ্যে আমার কোন ভুমিকা নেই। আমি নীরব দর্শকের মত শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি বিরাট হলের ভাস্কর্য। ম্যানেজারের ঘরটি হয়তো মধ্যযুগের দরবার হল ছিল। প্রকাণ্ড ঘরের ছাদে গম্বুজাকৃতি খিলান।

—জানেন মিষ্টার; আমার মনে হয় এই বাড়ীটা অভিশপ্ত।

—একথা বলছেন কেন ?

হোমস জীবনে কখনো কোন সংস্কারকে মানে নি। তার প্রখর বাস্তববাদী মন সর্বদা জমে থাকা সংস্কার ভেঙে দিয়েছে।

—বলছি অনেক অভিজ্ঞতার ফলে।

গ্রাহাম কেমন রহস্য ঢাকা গলাতে বলেন।

—কি অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার ?

—এই ইম্পিরিয়াল থিয়েটার হল আগে ছিল আলেকজাণ্ডার ডুমারের বিলাস-প্রাসাদে। ভাবুন তো প্রতিটি ঘরে লেখা হয়েছে কত অত্যাচারের দেয়াল লিপি। আমার মনে হয় পাথরের দেয়াল যদি মুখর হতে পারে তবে তারা কথিত সেই কাহিনী শোনাবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর একটু দম নিয়ে বলেন—দেখুন, এই হলের সঙ্গে যুক্ত থাকলে নানা ধরনের বিপদ আসে! যেমন দেখুন না আগে যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন তিনি বুড়ো বয়সে হঠাৎ গলাতে দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। ভদ্রলোকের নাম ছিল লর্ড জেমস। ফূর্তিবাজ মানুষ, আত্মহত্যার কোন কারন ছিল না তাঁর। তিনি ভালো মাইনে পেতেন, সংসারে ছিল অনুরাগী স্ত্রী আর মেয়ে।

তারপর আমি এলাম এই পদে। যোগ দেবার সাতদিনের মধ্যে আমার একমাত্র মেয়ে পামেলা জলে ডুবে মারা গেল। সবাই আমাকে বারন করল। ঐ চাকরীটা ছেড়ে দিতে বলল। আমি পারলাম না। ইম্পিরিয়াল হল যেন অজানা হাতছানিতে আমাকে ডাকছে। দুর্বার তার আকর্ষন। আমার সাধ্য কি তাকে ভুলে যাবো ?

ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উনি, মানুষের যে কতরকম ব্যথা আছে।

—শুনেছি ইম্পিরিয়াল থিয়েটারের আর এক নামী অভিনেত্রী নানা অভিনয় সেরে রাতে বাড়ী ফেরার সময় মোটর দুর্ঘটনাতে মারা যায়। অবশ্য এ ঘটনা ঘটে তিরিশ বছর আগে।

তারপর দেখুন মর্গারেটের কথা। এডিসার আগে মার্গারেট ছিল এখানকার অভিনেত্রী। রূপযৌবনে তার ধারে কাছে আসতে

।রে এমন কেউ আজ আর নেই। আমি মার্গারেটের অভিনয় দেখেছি। কান্নার দৃশ্যে সে যেন চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেত।

ঐ মার্গারেট একদিন হঠাৎ অভিনয় করতে করতে ভীষণ কাঁদতে শুরু করল। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম ও বুঝি অভিনয়ের জন্যে কাঁদছে। সে কান্না তার আর থামেনি। মার্গারেট হঠাৎ উন্মাদিনী হয়ে গেল। শুধু হাসত কাঁদত আর বিড় বিড় করে সংলাপ বলত।

গ্রাহাম থামলেন, সারা ঘরে বিরাজ করছে নীরবতা।

তিনি আবার বলেন—তারপর এডিসাকে দেখা গেল। আমি জানতাম যে ইম্পিরিয়াল থিয়েটার হলের অন্যসব নায়িকার মত তার জীবনেও নেমে আসবে অভিশাপ। নানার মত সে হয়তো মোটর দুর্ঘটনা ঘটাবে অথবা মার্গারেটের মত কাঁদতে থাকবে। অবশ্য এডিসার পরিনতিটা আরও মর্মন্তুদ।

আমি শুনেছি এই প্রাসাদে নাকি অশরীরী আত্মা আছে। বাতাসে ভর দিয়ে সে হেঁটে বেড়ায়। মধ্য রাতে তার ফিস ফিস শোনা যায়।

তিনি হলেন আলেকজাণ্ডার ডুমার। প্রতি রাতে একটার পরে তিনি হাজির হন তাঁর হলে, যেটি এখন আমাদের লাইব্রেরী হয়েছে। সেখানে তিনি নাকি মেয়েদের নিয়ে হল্লা করেন। মেয়েদের হাসির শব্দ শোনা যায়, সঙ্গীত ভেসে আসে। অনেকে নাকি দেখেছে যে আলেকজাণ্ডার ডুমার রাজার মত পোষাক পরে বসে আছেন। তাঁর চারপাশে রঙ্গিনী মেয়েদের ভীড়।

আবার সকাল হলে সব মিলিয়ে যায়।

—আপনি নিজে দেখেছেন? আপনি কি ভাবেন যে এসব গল্প এখনো চলবে?

হোমস সরাসরি আক্রমণ করলেন গ্রাহামকে। গ্রাহাম একটু থেমে বলেন—দেখুন মিষ্টার হোমস আমাদের চেনা অনুভূতির বাইরে আর একটা জগত আছে। সেখানে অনেক কিছু ঘটে আমরা যার খোঁজ রাখি না। তা বলে সব কিছুকে অস্বীকার করতে পারি কি?

—আপনি নিজের চোখে দেখেছেন? বলুন।

—আমি দেখিনি। আমার দেখার কোন ইচ্ছেও নেই। আপনার ইচ্ছে হলে বিশ্বাস করবেন, নাহলে আজগুবি বলে উড়িয়ে দেবেন। আমাদের এক প্রহরী ঐ দৃশ্য থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেকদিন পরে হাই-ওয়েতে তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাই বলছি সব এমন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন না।

—না মিষ্টার গ্রাহাম, একথা আমি মানতে পারছি না, আজ-গুবী কোন ভুতুড়ে গল্পে আমার আস্থা নেই।

মিষ্টার গ্রাহাম যেন কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেন হোমসের কথায়।

—আচ্ছা ম্যানেজার আপনাদের অভিনয় আবার কবে থেকে শুরু হবে?

হোমস প্রশ্ন করল।

—দেখুন এখনও আমরা ঠিক বলতে পারছি না। কেননা এডিসা যে ভূমিকাতে অবতীর্ণ হত সেই ভূমিকার জন্যে মনের মত নায়িকা মিলছে না। আমি ভাবছি যে হলিউড থেকে নায়িকা আনবো। তবে হলিউডের নায়িকার খোরাক মেটাতে পারবো না। ইতালীর কোন নায়িকাকে রাজী করাতে হবে। খরচ অনেক কম পড়বে। তাছাড়া ইতালীর মেয়েরা যে কোন ধরনের দৃশ্য করতে রাজী হবে দেখা যাক কি হয়।

—আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?

—বলুন।

—আপনি দু একদিনের মধ্যে পুরোনো নাটকটি মঞ্চস্থ করবার চেষ্টা করবেন ? এটা আমার বিশেষ আবেদন। অন্ততঃ একদিনের জন্যে এডিসার অভিনীত নাটকটি করুন।

—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব মিষ্টার হোমস।

হোমস চেয়ার ছেড়ে উঠল। হঠাৎ সে বলে—আচ্ছা মিষ্টার গ্রাহাম, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি। আপনার কি কোন নেশা আছে ?

প্রশ্নটা এত অদ্ভুত যে আমিও অবাক হলাম।

—দেখুন হোমস, আমার নেশা বলতে সিগারেট আর দামী মদ।

—এখানে কোন লোক নস্যি নেয় ?

—আমি যতোদূর জানি ঐ নেশাটি কারো নেই।

—আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ।

—দেখুন, মিষ্টার হোমস, ইম্পিরিয়াল থিয়েটার হল সত্যিই অভিশপ্ত। এখানকার বাতাসে সঞ্চিত আছে তীব্র ব্যথা। তাই যখন শেষ দৃশ্যের অভিনয় সমাপ্ত হয়, ধীরে ধীরে নিভে যায় আলো, আসন ছেড়ে দর্শকেরা ফিরে চলে বাড়ীর দিকে, তখন গ্রীনরুমে কোথায় কে যেন কাঁদতে থাকে। আমি নিজের কানে সেই কান্না শুনেছি। ইচ্ছে হলে আপনিও শুনতে পারেন।

গ্রাহামের কথায় এমন একটা তীব্র আকুতি ছিল যে হোমস নির্বাক হয়ে গেল।

নিস্তব্ধ ঐ প্রাসাদপুরীটাকে সত্যি অভিশপ্ত মনে হল আমার। যেন কত শতাব্দীর ঘৃণা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

ইম্পিরিয়াল হল থেকে বেরিয়ে হোমস বলে—ওয়াটসন, কেমন দেখলে।

—ভদ্রলোক খুবই ভীতু স্বভাবের।

—উঁহু, আকর্ষনীয় পুরুষ ঐ মিষ্টার গ্রাহাম। কে বলতে পারে ওটা তাঁর মুখোস কি না। চলো ওয়াটসন, একবার ইন্সপেক্টরের খোঁজ নিয়ে যাই।

হোমসের মন্তব্যটা মানতে পারলাম না। আবার মনে হল হতেও পারে।

ইন্সপেক্টর টমাস স্মিথের কথায় সন্দেহটা আরও দৃঢ় হল। গ্রাহামকে তিনি সন্দেহ করছেন। অথচ প্রমান অভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাচ্ছে না।

ক'দিন ধরে গ্রাহামের সঙ্গে এডিসার উঁচু গলার ঝগড়া শোনা গেছে। এডিসাকে কোন ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছেন মিষ্টার গ্রাহাম। রহস্যটা এখনও জানা গেল না।

## ॥ ছয় ॥

হু'দিন বাদে আবার আমরা হাজির হলাম ইম্পিরিয়াল থিয়েটার হলে ।

আজ ঐ প্রাসাদ যেন শোকের পাথর সরিয়ে নতুন সাজে সেজেছে। দর্শক আসন ভর্তি। আজ আবার এডিসা অভিনীত নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

ঐ নাটকটির নাম—লষ্ট লাভ অর্থাৎ ভালোবাসা নিরুদ্দেশ।

এডিসার জায়গাতে যে মেয়েটি অভিনয় করবে তার নাম কেটি। বয়েস কম হলেও বেশ চটক আছে চেহারাতে।

হোমস তাকে ডেকে নিয়ে কিছু উপদেশ দিল।

আমরা বক্সে আসন নিলাম। এখান থেকে যে কোন দর্শকের ওপর নজর রাখা যেতে পারে। তাদের অজান্তে তাদের প্রতিটি হাবভাব আমরা দেখতে পাবো।

নাটক শুরু হল। তার আগে মিষ্টার গ্রাহাম এডিসার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন। নাটকটির প্রথম দৃশ্যে ব্যর্থ নায়িকার ভুমিকা কেটি বেশ দরদ নিয়ে অভিনয় করছে।

হোমস নিবিষ্ট চিত্তে সবাইকে নিরীক্ষণ করছে। আধো-অন্ধকারে আমার কিছুই চোখে পড়ছে না।

সবাই যেন একমনে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথম

সারির সকলে তো চোখের পলক ফেলছে না। তাদের মধ্যে কোথায় বসে আছে ঘাতক হোমস কি তার সন্ধান পাবে ?

আমার কোমরে খোঁচা মারল। আমি তাকালাম।

—ওয়াটসন, দেখো।

আমি তাকাই।

—ঐ চতুর্থ সারির প্রথম যুবকটি্কে দেখো।

হোমসের নির্দেশ মত দেখলাম। চতুর্থ সারির প্রথম আসনে বসা যুবকটিকে সুশ্রী বলা যেতে পারে। হোমস বলবার পরে মনে হল যুবকটি যেন আনমনা। সে মাঝে মাঝে চোখ মুছছে আর ভীত চোখে এদিক ওদিক দেখছে। যেন অস্বস্তির মধ্যে আছে সে।

পঞ্চম দৃশ্যে আছে যে ওই নায়িকা আত্মহত্যা করবে। এই চরমতম মুহূর্তে হোমস আমার হাত ধরে বলে, ওয়াটসন, তাড়াতাড়ি যুবকটি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে।

আমি তাকিয়ে দেখলাম যে সত্যি যুবকটি নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—এসো আমরা ওকে অনুসরণ করি।

হোমস কানের কাছে বলল।

আমরা ওর পেছনে হাঁটতে শুরু করেছি। হল থেকে বেরিয়ে চারিদিক দেখে নিয়ে ছেলেটি হাঁটতে থাকে। আমরাও নিরাপদ দূরত্ব রেখে হাঁটছি।

কাছেই একটি গলিতে ঢুকল সে। হোমসও ঢুকে পড়েছে। বাঁ দিকের একটা বাড়ীতে সে অদৃশ্য হল।

হোমস ঠিকানাটা দেখে নিল।

সেদিনের মত অন্বেষন শেষ হল। ছেলেটির নাম জানা গেল, তার নাম আলফ্রেড, ডাক নাম ফ্রেডি। ভাল স্বভাবের যুবক, পাড়াতে বিশেষ তাকে দেখা যায় না।

পরের দিন হোমস আমাকে একটা দায়িত্ব দিল। ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমার সঙ্গে থাকবে ডেলা নামের একটি মেয়ে। আমি ডেলাকে ঐ যুবকটির কাছে কয়েক ঘন্টার জন্যে রেখে আসব।

ডেলা হল টাইপিষ্ট মেয়ে। হোমসের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক আছে। সে মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করে।

বেশ চটপটে স্বভাবের মেয়ে।

আমি সকাল হতেই ডেলাকে সঙ্গে নিয়ে ফ্রেডির বাড়ীতে গেলাম।

অত সকালে ফ্রেডি বাড়ীতেই ছিল। আমি তাকে বলি—একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে এলাম। আমার এই বোন নতুন শহরে এসেছে। পথঘাট কিছুই চেনে না। আমি চাকরীর সন্ধানে যাবো। যদি আপনি কয়েক ঘন্টা একে রাখেন তাহলে বড় উপকার হয়।

ফ্রেডি সুন্দরী ডেলার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে রাখতে রাজী হল। আমি ওর সঙ্গে দুটি একটি কথা বললাম।

কথায় কথায় জানা গেল যে ফ্রেডির বাবা-মা বেঁচে নেই। পৈত্রিক সূত্রে সে বিরাট সম্পত্তি পেয়েছে। আপাতত কোন চাকরী অথবা ব্যবসা করছে না।

ফ্রেডির সঙ্গে কথা বলে তাকে বেশ সরল স্বভাবের বলে মনে হল। পাড়ার স্থানীয় লোকেরা তার সম্পর্কে যে কথা বলেছে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে চরিত্র তার ভালো।

ডেলা বুদ্ধিমতী মেয়ে, যেকোন পরিস্থিতি সে সামলে দিতে পারবে।

ডেলাকে তার বাড়ীতে রেখে আমি বাইরে এলাম। তখন বেলা বেড়েছে, শহরের পথে পথে কর্মচাঞ্চল্য বাড়ছে।

২২৪ বি, বেকার স্ট্রীটের ঐ ঘরে হোমস গম্ভীর মুখে বসেছিল! আমাকে দেখেই সোৎসাহে প্রশ্ন করে, কি বন্ধু ডেলাকে বাঘের খপ্পরে দিয়ে এলে ?

—বাঘ বলছ কেন, বল হরিণ ছানা।

আমি হেসে বলি। ফ্রেডিকে আমার ছেলেমানুষ মনে হয়েছে। তার দ্বারা কোন মেয়ের কোন ক্ষতি সম্ভব হবে না।

হোমস নীরবে ধূমপান করে চলেছে। ফায়ারপ্লেসের আগুন থেকে তাপ আসছে। বাড়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নেই অনেকদিন।

স্ত্রীর মুখ ভার হয়েছে। ভাবছি এবার কিছুদিন তার সঙ্গে বেড়াতে যাব। এডিসার রহস্যটা মিটে গেলে বেড়াতে হবে।

—ওয়াটসন, এখন তুমি কি তোমার প্রেমময়ী স্ত্রীর কথা ভাবছ ?

দারুণ চমকে গেলাম। হোমস কি যাদু জানে ?

আমাকে চমকে উঠতে দেখে সে বলে—দেখো ওয়াটসন, মানুষ যাই ভাবুক না কেন তার মুখে সেই ভাবনার প্রতিফলন পড়বে। তোমার মুখে আমি কি দেখলাম জানো, দেখলাম সুখের ছায়া। আবার বিরক্তিও লেগে আছে। তাই সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হলনা যে তুমি সংসারের চিন্তায় মগ্ন। বিরক্তি এনেছে তোমার কাজ আর এই বন্ধুটির উদ্ভট সমস্যা, কি ঠিক বলছি তো ?

বাহবা দেবার মত ভাষা আমার জানা নেই। হোমস আবার বলে—আজ আমাদের আসল কাজ। যদি ফ্রেডির কাছ থেকে ঠিক মত ক্লু না পাই তাহলে সব বদলে যাবে! ওয়াটসন, যাও এখন-কার মত ছুটি। ঠিক বিকেল চারটেতে আমরা ফ্রেডির সঙ্গে দেখা করব! আমি যে তোমার বন্ধু।

আমি বেকার স্ট্রীটে পা রাখি।

ডেলা বেশ ভালোই ছিল।

ফ্রেডি আমাদেব বসবার ঘরে নিয়ে গেল। তার বাপমার সুখী জীবনের কোন ছবি চোখে পড়ল না। কথাটা অবশ্য হোমস বলল।

ফ্রেডির সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিল সে। যেকোন মানুষকে আপন করবার সুন্দর গুণ আছে তার।

সে এমন ভাবে আলাপ করে যে অচেনা লোকটি মুহূর্তের মধ্যে তার কতকালের চেনা হয়ে যায়। অকপটে স্বীকার করে সব কথা। তার দুর্বলতম স্থানে নিপুণ ভাবে আঘাত করে হোমস।

তাকে জানতেও দেয় না যে তার সমস্ত তথ্য এখন হোমসের হাতের মুঠোয়। হোমস পকেট থেকে কৌটো বের করে নস্যি নিল। তাকে নস্যি নিতে মাঝে মাঝে দেখেছি আমি।

ছেলেটিও পকেট থেকে সুন্দর রূপোর কৌটো বের করে নস্যি নিল।

কৌটোটা দেখে হোমসের চোখের কোনে অনাস্বাদিত আনন্দ চিক চিক করে ওঠে। সে দেখতে পেল যে কৌটোটার মাঝে একটা কম দামী কর্কের ঢাকনী আঁটা।

অমন দামী রুপোর কৌটোতে ঢাকনীটা বেমানান মনে হল।

—দেখি আপনার কৌটোটা, বাঃ বেশ দেখতে তো। কোথায় পেলেন এটি ?

হোমস প্রশ্ন করে।

—এটি ছিল আমার বাবার। বাবা এটা থেকে নস্যি নিতেন।

বলতে বলতে ফ্রেডির চোখ বড় হয়ে ওঠে। হোমস যেন কত আনন্দ পেয়েছে কৌটাটা দেখে!

তখনই ডেলা ডাক দিল—ফ্রেডি, একবার এ ঘরে এসো তো।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। ক'ঘন্টাব মধ্যে অচেনা যুবকটির

সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ডেলা। অন্তত: তার গলার স্বর তাই তাই বলছে।

মেয়েরা সত্যি রহস্যময়ী।

ফ্রেডি ঘর থেকে যেতেই হোমসের মধ্যে সেই পুরোনো অনুসন্ধিৎসা ফিরে এল। সে নাকের কাছে নিয়ে গেল কৌটোটি, গভীর ভাবে ঘ্রাণ নিল।

তারপর পকেট থেকে ঢাকনীটা বের করে মিলিয়ে দেখল যে খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে।

হোমসের চোখ চক চক করে ওঠে।

—বুঝলে ওয়াটসন, ঈশ্বর সাহসীদের সাহায্য করেন।

ফ্রেডি প্রবেশ করল! তার পাশে ডেলা। কৌটোটা ফিরিয়ে দিয়ে হোমস বলে—একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, এমন দামী কৌটোর ঢাকনীটা কর্কের কেন? আপনি কি ঢাকনাটা হারিয়ে ফেলেছেন?

ফ্রেডি বেশ একটু শিউরে ওঠে।

তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে হ্যাঁ, ওটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কৌটোটা সত্যি দারুন দেখতে, যে দেখেছে সেই প্রশংসা করেছে।

প্রসঙ্গটা ঘোরাবার চেষ্টা করছে সে। হোমস এবার দৃঢ়ভাবে বলল—আমি যদি আপনার হারানো ঢাকনাটি খুঁজে দিতে পারি, কি দেবেন আমাকে?

ফ্রেডি এবার চোখের সামনেই কেঁপে উঠল।

আমতা আমতা করে বলল—ওটা কোথায় পড়ে গেছে মিষ্টার, আপনি পেতেই পারেন না।

মুহূর্তের মধ্যে পকেট থেকে ঢাকনীটা বের করল শার্লক হোমস। সেটাকে আঙ্গুলের ফাঁকে রেখে বলল—আশা করি এটা চিনতে আপনার কোনই অসুবিধে হচ্ছে না মিষ্টার আলফ্রেড। ভালো

করে দেখুন, এর গায়ে লেখা আছে 'এ' অক্ষরটি। আপনার বাবার নাম ছিল যোশেফ কুক। কোথাও 'এ' অক্ষরটি আছে কি? তার মানে অনায়াসে মিথ্যে বলছেন আপনি।

যুবকটির দিকে তাকালাম। মনে হল তার সমস্ত রক্ত বুঝি শুষে নেওয়া হয়েছে। ঝোড়ো বাতাসে ওড়া শুকনো পাতার মত কাঁপছে তার দুটি বিবর্ণ ঠোঁট।

সে কিছু বলবার প্রবল চেষ্টা করছে, কিন্তু কোন কথা বলতে পারছে না!

—আশা করি আপনি সব দোষ স্বীকার করবেন। আমার নাম শার্লক হোমস, এ হল আমার বন্ধু ওয়াটসন। আর যে মেয়েটিকে আপনার কাছে রাখা হয়েছিল তার নাম ডেলা। লণ্ডন শহরে তার জন্ম।

একটির পর একটি আঘাত দিয়ে ছেলেটিকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিল হোমস।

তারপর ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া টেনে বলল—বলুন আপনার কাহিনী শোনা যাক। দু দুটো নারী হত্যার পেছনে কি মোটিভ আছে সেটা জানতেই হবে।

ছেলেটি অবশেষে স্বীকার করল। তার বাবা মা দাম্পত্য জীবনে খুব সুখী ছিলনা। ছোট থেকেই সে শুধু ঝগড়া আর বিবাদ দেখে এসেছে।

ঐ ঘটনাবলী তার চরিত্রে ছাপ ফেলে। তারপর এক দুর্ঘটনাতে তার বাপ ও মা মারা গেল। ফ্রেডি একা হল!

তার যৌবনের দিনে সে অসৎসঙ্গে মেসে। বেহিসেবী আনন্দ আনতে ছুটে যায় কুখ্যাত পল্লীতে। তার ফলে মারাত্মক রোগ তাকে আক্রমণ করল।

অবশেষে বারবারার প্রেমে পড়ল সে। বারবারা তাকে গভীর ভাবে ভালবাসে।

কিন্তু বারবারা জানতে পারল যে তার হবু স্বামীর ভয়ানক রোগ আছে। ঐ কথা জানবার পরে সে ফ্রেডিকে বিয়ে করতে অসম্মত হল।

ফ্রেডির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে বারবারাকে টেমস নদীর ধারে ডেকে আনে। সারারাত তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করল। অবশেষে ভোরের দিকে ধারাল ছোরা দিয়ে বারবারাকে খুন করল।

বারবারা তার মাথার ক'গাছি চুল ছিঁড়ে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছিল। ভয় পেয়ে ফ্রেডি বারবারার হাত কব্জী অবধি কেটে ফেলে।

ঐ হত্যাকাণ্ডের পরে তার মনটা আরও দমে গেল। সে ঘরে একাই থাকত, বিশেষ কোথাও যেত না।

হঠাৎ একদিন ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে নাটক দেখতে গেল। সেখানে এডিসাকে দেখে গভীর ভাবে ভালোবেসে ফেলে। এডিসা তার চেয়ে বছর তিনেকের বড় হলেও এডিসাকে সে প্রেম নিবেদন করে বসল।

এডিসাও তার ডাকে সাড়া দিল। হয়তো নতুন কোন অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছে ছিল রঙ্গিনী নায়িকার।

বেশ কিছুদিনের প্রেমপর্ব চলল। পরে এডিসাও তার রোগের কথা জানতে পারল। ফ্রেডিকে সে প্রত্যাখ্যান করল।

আবার মাথায় ঝোঁক চেপে গেল ফ্রেডির। সে রাতে সে তৈরী হয়েই এল। এডিসা[illegible]টা। [illegible] তাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে [illegible]য়া। মন্টেকু প্লেস থেকে পোষ্ট তার নস্যির কৌটোর ঢাকনা

নাহলে টেমস নদীর তীরের ঐ অনুদঘাটিত হত্যা রহস্যের পাশে স্থান পেত এডিসার মৃত্যু।

আমরা ফ্রেডিকে পুলিশের হাতে দিলাম। বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল।

মিস্টার গ্রাহাম নাকি এখনও অদ্ভুত কত দৃশ্য দেখেন। শুনতে পান বীভৎস চীৎকার।

অবশেষে একদিন তাঁকে ঝুলতে দেখা গেল ঐ হল ঘরে, যেখানে আলেজাণ্ডার ডুমারের বিলাসের আসর বসত।

ঐ রহস্যটা কিন্তু উদঘাটিত হ'ল না।

## ॥ সাত ॥

বসন্ত তখন জাগ্রত দ্বারে।

বলতে পারি প্রথম দখিনা বাতাসের হিল্লোল। ঘন কুয়াশা ভেঙে রোদ উঠেছে, শীতল প্রভাতের শীত অনেক কম।

প্রাতঃরাশের শেষে আমরা বেকার স্ট্রীটের পুরোনো ঘরে বসে আছি।

সামনে জ্বলছে আগুন, যদিও তার উপস্থিতির দরকার নেই। কুয়াশা বিলীন হলেও পাতলা পর্দার মত জড়ানো ছিল আবরণ। সেটাকে কুয়াশা বললে বেশী বলা হবে।

[illegible] হলুদ রঙা ধোঁয়ার জালের
আনতে ছুটে যায় কুখ্যাত পল্লীতে ছবি। কালো রঙের উচ্ছ্বাস
তাকে আক্রমণ করল।

ঘরের মধ্যে গ্যাস জ্বলছে, খাবার টেবিলটা দারুন নোংরা বলে বাসনকোসনগুলো ওখানেই স্তুপাকৃতি বসানো। তাতে পড়েছে আলো, চিক চিক করছে।

সারা সকালটা হোমস চোখ বুলিয়েছে সেদিনের ডেইলী টেলিগ্রাফের পাতায়। কোন দিকে নজর ছিল না তার। সে যেন কি এক অজানা জগতে ভেসে গিয়েছিল।

অবশেষে কাগজটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুখের দীর্ঘ পাইপে মৃদুমন্দ টান দিয়ে তাকাল আগুন-চুল্লীর দিকে।

আমি তার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। এমনকি তার ভাবী সংলাপটুকু ধরতে পারছি।

সে বলে, আগেকার মত আর কেস মিলছে না। মানুষ যেন জোলো হয়ে পড়েছে।

তারপর একটু হতাশ হয়ে, বলে, দেখো অপরাধীদের চাতুরী নষ্ট হতে বসেছে। তারা আর আগের মত বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারছে না। সেই সাহস আর মৌলিকত্ব আর নেই। আমার এই ছোট্ট গোয়েন্দাগিরিটাও বোধহয় এবার তুলে দিতে হবে। কিংবা আমাকে লোক ডাকবে কারো হারানো পেন্সিল খুঁজে দিতে অথবা কোন বোর্ডিং-এর মেয়েকে উপদেশ দিতে!

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে—বুঝলে ওয়াটসন, ভাবছি সম্মান থাকতে থাকতে ছেড়ে দেবো। এই চিরকুটটা পড়ে দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে। নামতে নামতে কোথায় চলেছি বলতে পারো?

আমি হোমসের হাত থেকে চিঠিটা নিলাম।

আগের দিনের তারিখ দেওয়া। মন্টেকু প্লেস থেকে পোষ্ট করা হয়েছে।

ঐ চিঠিতে লেখা—

প্রিয় মিষ্টার হোমস,

আমাকে গভর্নেস হতে বলা হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি না যে ঐ প্রস্তাবে রাজী হব কিনা। এবিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রার্থনা করছি।

আপনার বুদ্ধিমত্তার ওপর আমার অগাধ আস্থা। আমি একবার মুখোমুখি কথা বলতে চাই।

যদি আপনার কোন অসুবিধে না থাকে তাহলে আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটাতে আপনার সঙ্গে দেখা করছি।

আশাকরি আমাকে ফেরাবেন না।

নমস্কার নেবেন

ইতি—

মিস ভায়োলেট হান্টার

চিঠিটার মধ্যে কোন কৌতুহল নেই। নেহাৎই মেয়েলী ব্যাপার। এর মধ্যে হোমসকে জড়িয়ে পড়তে হবে ভেবে সত্যি কষ্ট পেলাম।

—মেয়েটিকে তুমি চেনো নাকি?

আমি কৌতুহলী হয়ে বলি।

—না।

হোমস মাথা নাড়ল।

তাহলে তো কোন উত্তেজনাই নেই। কিন্তু ঘড়িতে এখন যে বাজে ঠিক সাড়ে দশটা।

তার মানে ঐ ভায়োলেট এখন ঘণ্টা বাজাচ্ছেন দরজাতে।

আমি হোমসকে তাতিয়ে দেবার জন্য বলি, তুমি যা ভাবছ এটা তো তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অনেক সময় দারুন কেস এমন বাজে মুখোশ ঢেকে সামনে আসে। সেই ব্লু কার্বাঙ্কলের ঘটনাটা তোমার মনে নেই? গোড়াতে সেটা ছিল একটা বাজে

খেয়াল। পরে সেটাই পরিণত হল দামী সমস্যাতে। কে বলতে পারে এর মধ্যে তেমন কোন উপাদান আঁছে কি না।

আমার উৎসাহদানে একটু যেন আশা পেল হোমস। বলল—বলছ, তবে দেখা যাক। তোমার কথাই যেন ঠিক হয়। আমার যদি কোন ভুল না হয় তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি যে ঐ ভদ্রমহিলাই উঠে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে।

তার কথা শেষ হতে না হতেই দরজা ঠেলে প্রবেশ করল জনৈকা তরুণী। অল্প বয়েসের চটক আছে সারা দেহে। আছে নতুন যৌবনের স্নিগ্ধ হিল্লোল।

মেয়েটির পরণে দামী কোন পোষাক নেই। তবে পরিপাটি করে পরা ছিমছাম পোষাকটি। সাজের মধ্যেও রুচির পরিচয় মিলছে।

যে সব মেয়েরা পৃথিবীতে একলা চলতে ভালবাসে, কোন কারণে যারা পুরুষদের ওপর বিরক্ত অথবা আশাহত, ঠিক তেমন মেয়ের মত আচরণ তার। একটু জেদী আর স্বনির্ভর। তাই হয়ত বেশ সপ্রতিভ।

আমার বন্ধু চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল তাকে নিয়ে আসতে।

মেয়েটি সোজা বলে—আপনাকে কষ্ট দেবার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার হোমস। আমার আসবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা যে একা ঠিক সামলাতে পারিনি।

তারপর বলে—দেখুন, আমি একা। আমার কোন আত্মীয় নেই যার কাছে উপদেশ বা সাহায্য পেতে পারি। বলতে গেলে একেবারে অনাথা আমি। তাই ভাবলাম যে আপনার কাছে যাই। আপনিতো অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন। তাদের তুলনায় এটা কোন ব্যাপারই নয়। তবু হয়তো আপনি আমার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

—আগে আপনি বসুন মিস হান্টার। তারপর আপনার কাহিনী শুনবো। যদি কিছু করতে পারি নিজেকে সুখী বলে ভাববো।

হোমস বলে। তার চিরপরিচিত সৌজন্য প্রমাণ পেল। আনমনে আহত হলেও তার ব্যবহারে ঐ রাগ অথবা দুঃখের কোন ছাপ পড়ে না। হোমস এমন স্বভাবের।

মিস হান্টার বসল। হোমস যেন তার কথাবার্ত্তাতে খুশী হয়েছে। মার্জিত রুচির মেয়েদের সে পছন্দ করে।

কৌতুহলী চোখে মিস হান্টারের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা নামিয়ে, কোলের ওপর হাত রেখে আঙ্গুলে আঙ্গুল দিয়ে চিরচেনা ভঙ্গিমাতে হোমস তার কাহিনী শুনতে বসল।

মিস হান্টার জিভ দিয়ে শুকনো দুটি ঠোঁট ভিজিয়ে বলে—কর্ণেল স্পেন্স পুনারার পরিবারে আমি পাঁচ বছর ধরে গভর্ণেসের কাজ করছি। পরিবারে আমি মিশে ছিলাম। কিন্তু দুমাস আগে কর্ণেল লেভাস্পেসিয়ার হ্যালিফ্যান্স শহরে বদলী হয়ে যান। উনি সপরিবারে চলে গেলেন। ওঁরা যেতেই আমার চাকরীটা গেল। বলতে গেলে আমি বেকার হলাম।

কাগজে কাগজে চাকরীর কলমে বিজ্ঞাপন দিলাম! অন্যের দেওয়া বিজ্ঞাপনের উত্তরও দিলাম। কিন্তু কাজ আর পেলাম না। অনেক চেষ্টা করেও কিছু জুটল না আমার।

ধীরে ধীরে আমার সামান্য সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হয়ে গেল। ভাবতে বসলাম যে ঐ জমানো টাকা শেষ হলে কি হবে আমার? তার মধ্যে যে কোন কাজ পেতেই হবে। কিন্তু কি ভাবে? ভেবে ভেবে কোন কিনারা পেলাম না।

ওয়েষ্ট-এণ্ডে গভর্ণেসদের জন্যে একটা এজেন্সী আছে, অনেকটা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মত। আপনি নিশ্চয় ওটার নাম শুনেছেন?

নাম ওয়েষ্ট অ্যাওয়ে। আমি ঐ সংস্থার সদস্যা হলাম। প্রতি সপ্তাহে একবার করে ওখানে যেতাম কাজের সন্ধানে। ঐ সংস্থাটি পরিচালনা করতেন মিস স্টলার।

তিনি বসে থাকতেন একটা ছোট্ট ঘরে। তাঁর পাশে ছিল বন্ধ অ্যান্টি রুম যেখানে সার বেঁধে অপেক্ষা করতো কর্মপ্রার্থীরা, একে একে তাদের ডাক পড়তো।

ওয়েষ্ট অ্যাওয়ের নিয়ম অনুসারে প্রতি সপ্তাহে একবার করে দেখা করতে হয়। মিস স্টলার কর্মপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করতেন।

আমিও নিয়ম মতো প্রতি সাতদিন অন্তর দেখা করে চলেছি! মিস ষ্টলার আশ্বাস দিয়ে চলেছেন। ক্রমে আশাহত হয়ে পড়ছি আমি। অবশেষে গত সপ্তাহে তাঁর অফিসে গেলাম। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়েছিল, ব্যাঙ্ক থেকে শেষ সম্বলটুকু তুলে নিয়েছি। ভাবছি অন্য কোথাও চলে যাবো।

সেদিন দেখি মিস ষ্টলারের পাশে আর একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। ভদ্রলোক সোজা আমার দিকে তাকালেন। বেশ স্থূল চেহারা তাঁর, মুখে অমায়িক হাসির টুকরো, ভাঁজ খাওয়া ভারী চিবুক। চোখে হালকা ফ্রেমের চশমা। টেবিলে হাতের কনুই ঠেকিয়ে বসে আছেন, চোখ তাঁর সব মেয়েদের দিকে। যেসব মেয়েরা মিস ষ্টলারের সঙ্গে দেখা করতে ঢুকছে তিনি তাদের গভীর ভাবে লক্ষ্য করছেন!

আমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক যেন একটু চঞ্চল হলেন। মিস স্টলারকে বললেন, এই মেয়েটিকেই চাই। একেই আমার পছন্দ হয়েছে।

ভদ্রলোক হাতে হাত রাখলেন, আমি তাঁর দিকে তাকালাম। আমাকে পেয়ে তিনি যেন দারুন খুশী হয়েছেন, অন্ততঃ তাঁর আচরণে তাই মনে হল!

—আপনি একটা চাকরীর সন্ধানে এসেছেন ?

তিনি মোলায়েম ভাবে প্রশ্ন করেন। আমার তখন হাতে স্বর্গ পাবার মত অবস্থা। এ যেন ভগবানের অযাচিত দান।.

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললাম—হ্যাঁ।

—গভর্নেসের কাজ চাইছেন তো ?

—হ্যাঁ।

আমি ঘাড় নত করে বলি।

—কত টাকা মাইনে চান ?

—আমি এর আগে কর্ণেল স্পেন্সের কাছে ছিলাম। কর্ণেল আমাকে মাসে এক পাউণ্ড করে বেতন দিতেন।

আমার কথা শুনে যেন চমকে গেলেন ঐ ভদ্রলোক, জিভ কেটে বললেন—আরে ছি ছি, সামান্য টাকার বদলে লোকটা আপনাকে অনেক খাটিয়েছে।

ভদ্রলোক ধিক্কার করে বলেন—আপনার মতন এমন একজন আকর্ষনীয়া মহিলাকে তিনি যে কি করে ঐ সামান্য টাকা দিয়েছেন আমি ভাবতেই পারছি না। লজ্জা করত না কর্ণেলের ?

—আপনি যা ভেবেছেন অত যোগ্যতা আমার নেই।

আমি শান্ত কণ্ঠে বলি।

—দেখুন, কিছু ফরাসী আর কিছু জার্মান জানা আছে। আর জানি গান আর সামান্য সেলাই। এই তো আমার মোট জ্ঞানের বহর। এই বাজারে এই জ্ঞান নিয়ে কি বেশী টাকা দাবী করতে পারি ?

—উঁহু, ওসব যোগ্যতার কথা আমি মনেই করছি না। আমার কাছে মেয়েদের যোগ্যতা তার অর্জিত জ্ঞানে নয়, তার সম্পদ তার নারীত্ব। কিছু যদি মনে না করেন তবে বলতে পারি যে আপনি হলেন পুরো মাত্রার রমণী। গভর্নেস হতে হলে মেয়েদের একটাই গুন থাকা উচিত, সে হবে অন্তরে জননীর স্নেহ মায়া মমতার এক

প্রতিমা। নাহলে আগামী দিনের সুপ্রতিষ্ঠিত পুরুষের জন্ম হবে কেমন করে? ঐ ভদ্রলোক আপনার মত মমতাময়ী নারীর হাতে কি করে সামান্য কটা টাকা গুঁজে দিতেন, আমি এখনো ভেবে পাচ্ছি না।

ভদ্রলোকের লম্বা বক্তৃতা শোনবার মত মানসিক স্থৈর্য আমার ছিল না। আমাকে একটু বিব্রত দেখে উনি তাড়াতাড়ি বললেন—দেখুন মিস, আমি আপনাকে বছরে একশো পাউণ্ড করে দেবো! অবশ্য যদি আমার কাছে কাজ করতে আপনার কোন আপত্তি না থাকে।

আপনি ভেবে দেখুন মিষ্টার হোমস, আমার ঐ কপর্দকহীন অবস্থায় অভাবিত অর্থপ্রাপ্তির সুযোগটা এল। আমি ভাবতে পারি না যে সামান্য গভর্নেসের চাকরীর জন্যে কেউ অত মাইনে দিতে পারে। ঐ অকল্পনীয় অঙ্কের মাইনেটা আমার কাছে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন হয়ে দাঁড়াল। অবিশ্বাস্য একটা উপলব্ধি যেন।

সত্যি ঐ ভদ্রলোক টাকাটা আমাকে দেবেন তো? নাকি সবটাই হল তাঁর মোলায়েম মুখের কায়দা?

হয়তো আমার মনের ভাবনার কোন প্রতিফলন পড়েছিল আমার মুখে। সেটা লক্ষ্য করে উনি, তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবুক বের করে বললেন—আমার নিয়ম হচ্ছে যে যিনি আমার কাজে আসবেন তাঁকে বেতনের অর্ধেক টাকা আগেই দিয়ে দেওয়া। যাতে তাঁর আর কোন অসুবিধে না হতে পারে।

এমন মহান মানুষ এখনো আছেন পৃথিবীতে? আমি অবাক হয়ে গেলাম। বলতে গেলে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। জীবনে এর আগে আর কখনো এমন মহানুভব মানুষের দেখা পাই নি।

ইতিমধ্যেই বাজারে কিছু ধার হয়েছিল আমার। ভদ্রলোকের কাছে আগাম টাকা নিয়ে ধার শোধ দিতে হবে।

তবুও কেন জানিনা নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না।

আমার কেবলই মনে হল যে ভদ্রলোকের আপাত মহানুভবতার অন্তরালে কোন দুরভিসন্ধি আছে। তাঁর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে উৎসুক হয়ে উঠলাম। কোথায় যেন অস্বাভাবিকতার ছায়া দেখছি। ভদ্রলোকের দয়ার কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে নিবেদন করার আগে ভেবে দেখতে হবে। আমি নম্র কণ্ঠে প্রশ্ন রাখি—আমায় কাজ করতে কোথায় যেতে হবে স্যার?

—হ্যাম্পশায়ারে। চমৎকার জায়গাটা। গ্রামীন পরিবেশে নির্জনতার মধ্যে অবস্থিত। শহরের কোন কোলাহল ওখানে পৌঁছতে পারে না। নাম হল কপার বীচেস। উইনচেষ্টার থেকে পাঁচ মাইল দূরে। যেমন সুন্দর অঞ্চলটি তেমন সুন্দর তার প্রকৃতি। আপনার মন বসে যাবে।

—কি করতে হবে আমাকে?

পরিবেশটার চমকপ্রদ বর্ণনাতেও মন ভরেনি আমার। কাজের বহরটাও জেনে নিতে হবে।

—একটি মাত্র বাচ্চাকে দেখাশোনা করতে হবে। বাচ্চা বলতে ছ'বছরের একটা শিশু! বলতে পারেন দুষ্টু মিষ্টি একটি ছেলে। ওহো, সে আবার চটি দিয়ে আরশোলা মারে। তার মারের ধরণটা যদি দেখতেন—

বলেই ভদ্রলোক হেসে ওঠেন। যেন ঐ ব্যাপাটার মধ্যে ভীষণ লজ্জা লুকিয়ে আছে। তারপর অতি কষ্টে হাসি কমিয়ে বলেন—চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতেই তিনটে আরশোলা খতম।

ছেলেটির আনন্দের উদাহরণ শুনে আমি একটু দমে গেলাম।

তবে এটা হয় তো সত্যি নয়, নেহাৎই একটা ঠাট্টা। প্রায় সব মেয়েরাই আরশোলা দেখলে ভয় পায়, ভদ্রলোক হয়তো তাই একটু ঠুকলেন আমাকে। আমিও যে আরশোলাকে ঘৃণা করিনা তা নয়, ঐ অদ্ভুত পতঙ্গটাকে দেখলে গাটা যেন ঘিন ঘিন করে।

—আমার কাজ কি শুধু ঐ ছেলেটিকে দেখাশোনা করা?

আমি বলি। কাজের পুরো পরিধিটা জেনে নিতে চাই, আর কি!

—না, না শুধু তা হবে কেন? আমার স্ত্রী হয় তো সঙ্গিনী হিসেবে আপনাকে চাইতে পারেন। নয়তো মেয়েলী খেয়ালে কোন অনুরোধ করবেন তিনি। নিজের কোন হালকা কাজের দায়িত্ব তুলে দেবেন আপনার কাঁধে। আপনি সেটা করে দেবেন। কি পারবেন না—?

—বেশ, শুনি, আর কি করতে হবে—?

—আর একটা কথা। শুনে রাখুন আমার স্ত্রী হলেন শৌখীন স্বভাবের রমণী, খামখেয়ালী বলতে পারেন, তবে পাগল নয়। হয় তো একদিন তাঁর ইচ্ছে হল যে আপনি তার মনের মত সাজবেন, আপনি কি আর সেই মত পোষাক পড়বেন না? অথবা ধরুন তিনি চাইলেন যে আপনি কোন একটি বিশেষ চেয়ারে বসবেন, আপনি কি তা করবেন না? আপত্তি করবেন এই সামান্য চাওয়াতে?

বলে আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। আমার একটু অস্বস্তি হল।

অবাক হলেও সেটা বুঝতে দিলাম না।

—তা কেন? নিশ্চয়, পারব না কেন?

—কিংবা ধরুন আপনাকে বলা হল সন্ধ্যের দিকে আমাদের সঙ্গে বেড়োতে? কি, বেড়োবেন না?

—অবশ্যই যাবো।

—অথবা যদি আপনাকে চুল ছোট করে ফেলতে বলা হয়, আপনি কি তাতে অমত করবেন?

ভদ্রলোকের ঐ উক্তিতে আমি ভীষণ চমকে গেলাম। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস কয়তে পারছিনা। আপনি তো নিজের চোখে দেখছেন যে, সাধারণ ভাবে আমার চুলগুলো প্রাচ্যমেয়েদের মত বেশ বড়, সযত্নরক্ষিত আর চেষ্টনাট রঙের এক বিশেষ রঙ এ রাঙানো। অনেকেই আমার কেশবিন্যাসের প্রশংসা করেছেন। তবুও আমার এই একমাত্র বিলাস আর শখের জিনিসকে কারো বিকৃত রুচির-

অনুরোধে ছেটে ফেলার কথা কখনও ভাবতে পারি না। তাই গম্ভীর হয়ে জবাব দিলাম—মাপ করবেন, চুল কাটার ব্যাপারে আমার বিলক্ষণ আপত্তি আছে—

ভদ্রলোক উৎসুক চোখে চেয়ে ছিলেন আমার দিকে। আমার জবাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার স্মিত মুখের ওপর দিকে একটা ছায়া চলে গেল। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন—এটা কিন্তু খুব দরকারী। আমার স্ত্রীর ছোট চুল খুব পছন্দ। তাঁর একটা বাতিক বললেও চলে। আপনি তাহলে চুল ছাঁটতে রাজী নন?

—না স্যার। আমি সেজন্যে দুঃখিত।

—উত্তম। ব্যাপারটা তবে এখানেই মিটে গেল। আপনাকে ভারী পছন্দ হয়েছিল আমার।

সব দিক দিয়েই যোগ্য ছিলেন আপনি। শুধু ছোট্ট একটা ব্যাপারে এসে ঠেকে গেলেন আপনি। মিস স্টলার, কী আর-করা যায়? আপনি আরেকটি মেয়ের ইণ্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করুন তাহলে।

মিস স্টলার এতক্ষণ চুপচাপ বসে বসে আমাদের কথাবার্তা—শুনছিলেন। এবার তিনি যেরকম দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন আমার দিকে স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, তাঁর ভালো রকম একটা কমিশন হাত ছাড়া হয়ে গেল।

—মিস হাণ্টার, আপনি কি চান আপনার নাম আমাদের এজেন্সির রেজিস্টার বুক এ লেখা থাকুক? তিনি কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন আমায়।

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু আপনার আচরণে তা তো মনে হচ্ছে না। এমন সুন্দর অফারটা আপনি প্রত্যাখ্যান করছেন। এমন সুন্দর সুযোগ আর কখনো পাবেন বলে মনে করেন? ঠিক আছে। আপনি এখন আসতে পারেন। গুডডে মিস হাণ্টার। তিনি টেবিলে রাখা

কলিং বেলটা বাজাতে বাইরে অপেক্ষমান বেয়ারা দরজাটা খুলে ধরল আমার নিস্ক্রমনের জন্যে।

বাসায় ফিরে এলাম উদভ্রান্ত মনে। এসে দেখি, দু-তিন জায়গা থেকে টাকার তাগাদা দিয়ে চিঠি দিয়েছে দু-তিনজনে। ভাবতে বসলাম একান্ত মনে যে, সত্যিই কি আমি একটা বোকামির কাজ করে এলাম এই মাত্র? বহুলোকের বহুরকমের বিচিত্র খেয়াল আছে। সেই খেয়ালের পেছনে তারা অর্থব্যয়ও করে প্রচুর। এই ইংল্যাণ্ডেই কজন গভর্নেস আছে যে বছরে একশ পাউণ্ড মাইনে পায়, তা আঙুলের কড়েগুণে বলা যেতে পারে।। তাছাড়া এই চুল রেখেই বা, আমার লাভ কী? ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তই করলাম আমার উচিৎ, এজেন্সিতে অবিলম্বে খোঁজ নেওয়া -কাজটা এখনো খালি আছে কিনা।

পরের দিনই সেই ভদ্রলোকের একখানা চিঠি পেলাম ডাকে। চিঠিটা সঙ্গেই এনেছি, আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি, শুনুন—

দি কপার বীচেস, উইঞ্চেস্টারের নিকটে

প্রিয় মিস হান্টার,

মিস স্টলারের কাছে আপনার ঠিকানা পেয়ে, আপনাকে [illegible] থেকে এই মর্মে পত্র দিচ্ছি যে, আপনি ইতিমধ্যে আপনার [illegible]ন্ত পুনঃবিবেচনা করেছেন কিনা। আমার মুখে আপনার যাবতীয় খুঁ[illegible]নাটি শুনে, আপনাকে আনার জন্য আমার স্ত্রী খুবই ব্যগ্র হয়ে উ[illegible]ছেন। ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছি, আপনাকে বছরে এ[illegible]শো কুড়ি পাউণ্ড হিসেবে মাইনে দেওয়া হবে। এই বাড়তি কুড়ি [illegible]ও ধরুণ আপনার সখের চুল ছেঁটে ফেলার ক্ষতিপূরণ। যে [illegible]াকের কথা এর আগে আপনাকে কথাচ্ছলে বলেছিলাম, সেটা [illegible] ইলেকট্রিক ব্লু রঙের পোষাক। আপনি যতক্ষন বাড়ীতে থাক- [illegible] ততক্ষণ এই পোষাক পরে থাকবেন। কারন নীল রঙের এই

বিশেষ কোটটি আমার স্ত্রীর ভারী প্রিয়। অবশ্য এই রঙের পোষাক আপনাকে কিনতে হবে না। আমার বড় মেয়ে অ্যালিস, এখন যে ফিলাডেলফিয়ার রয়েছে—তারই এই রঙের পোশাক আছে। মনে হয়, মোটেই বেমানান হবে না আপনার দেহে। আর এখানে ওখানে বসার ব্যাপারটা তো মোটেই কঠিন নয়। তেমন অসুবিধাজনকও ঠেকবে না আপনার কাছে। চুলের কথা আগেই বলেছি। অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য নেই যে, ক্ষণিক দর্শন আমাদের মধ্যে হয়েছিল, তাতে আপনার চেহারার সঙ্গে ঐ ধরণের চুল খুবই মানানসই ঠেকেছিল আমার কাছে। কিন্তু আমার স্ত্রী মেয়ে মানুষের লম্বা লম্বা চুল পছন্দ করেন না। তাই আপনার চুলের ক্ষতিটুকু বাড়তি কিছু অর্থ দিয়ে পুষিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। ডিউটি যে খুব হালকা সে তো আগেই বলেছি আপনাকে। অনুগ্রহ করে আপনি এলে আমরা দুজনে আন্তরিক খুশি হব। কবে আসবেন জানাবেন। গাড়ি নিয়ে উইঞ্চেস্টারে হাজির থাকব।

ইতি

ভবদীয় জেফ্রো রুক্যাসল্

চিঠিখানা পেয়ে আমি আমার মন বদলে ফেলেছি, মিঃ হোমস্। তবু চরম পদক্ষেপ নেবার আগে আপনাকে সমস্ত ব্যাপার খুলে আপনার মতামত চাওয়া উচিত মনে না করে পারিনি।

হোমস স্মিত মুখে জবাব দিলে, মনই যখন ঠিক করে ফেলেছেন তখন তো ল্যাঠা চুকেই গেছে, মিস হান্টার। পরামর্শের প্রয়োজন কী?

—আপনার অমত নেই বলছেন তাহলে?

—মিস হান্টার, হোমস হাসিমুখ বজায় রেখে বলল, আমার করতে বাধা নেই যে, আমার কোনো বন্ধু এই কাজে আবেদন করুক এ আমি চাই না।

—তার মানে, মিঃ হোমস ?

—দেখুন, আমার কাছে সব তথ্য তো নেই, কাজেই কেন মানা করছি তা হয়তো সঠিক বলতে পারব না। তবে আপনার মনে যে কারণে দ্বিধা জেগেছে—যার দরুন আপনি আমার সিদ্ধান্তের কথা জানতে চান সেটা বলতে পারি।

মিঃ রুক্যাসলের এত আগ্রহের কারণ কি বুঝেছেন, বলুনতো।

—আচ্ছা,

—আমার মনে হচ্ছে, ভদ্রলোকের স্ত্রী নিশ্চয়ই পাগল। উনি চান না তাঁর স্ত্রীকে কোনো অ্যাসাইলামে ভর্তি করতে। চোখের সামনেই রাখতে চান। ফলে যে যে কারণে তাঁর স্ত্রী শান্ত থাকেন, পাগলামি করেন না, সেই সেই কারণগুলো ঘটাবার জন্যে আমাকে কাজে নিযুক্ত করতে চান।

—অসম্ভব নয়। তবে যে কোন কারণেই হোক একজন তরুণী নারীর পক্ষে এই পরিবারটি খুব আদর্শ স্থানীয় পরিবার নয়। টাকার কথাটাই একবার ভাবুন। সামান্য কাজের জন্য নিজের দায়ে না ঠেকলে কেউ কি অতো টাকা দিতে রাজী থাকেন ?

—সে কথা আমি ভেবেছি। কিন্তু বর্তমানে আমার যা আর্থিক বস্থা, তাতে এই কাজটা ছেড়ে দেওয়ার মত প্রচণ্ড বোকামি আর ছু নেই। অসুবিধে দেখলে ছাড়তে কতক্ষণ ? তবে যে টাকাটা আগাম পাব এই কাজের জন্যে তাতে মস্ত উপকার হবে র। কাজ ছেড়ে দিলেও ভবিষ্যতে আমার দুচার মাস চালিয়ে উঠে মতন সংস্থান থাকবে। অবশ্য আপনি যদি আমার সহায় কন তবে সেখানে গিয়েও আমার মনে যথেষ্ট বল ভরসা থাকবে।

—ঠিক আছে। আপনি তবে কাজে যোগ দিন। রুক্যাসল পরিবারের আবরণের মধ্যে অবশ্যই কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে। সেখানে গিয়ে যদি কোনো সন্দেহ জাগে মনে—যদি কোনো বিপদে পড়েন—

—বিপদ! কী বিপদ মিঃ হোমস ?

হোমস মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে বললে, বিপদের স্বরূপ আগে থাকতে চিনতে পারলে তো কোন সমস্যাই ছিল না আর। যাই হোক তেমন কিছু আঁচ পেলেই আমায় সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে দেবেন। আমি সশরীরে উপস্থিত হব সেখানে।

—তাহলেই যথেষ্ট হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন মিস হাণ্টার। হাসিটুকু নির্মল স্বচ্ছ। মুখে কোনো দুশ্চিন্তার ছায়া নেই। তিনি হাসতে লাগলেন, এবার আমি খোলা মনে যেতে পারব কপার বীচেসয়ে। আজ রাত্রেই আমার সাধের চুলগুলোকে জলাঞ্জলি দিয়ে মিঃ রুক্যাসনকে লিখে দেব যে, আগামীকাল সকালের ট্রেনেই আমি উইঞ্চেষ্টারে রওনা হচ্ছি।

মিস ভায়োলেট হাণ্টার চলে যাবার পর আমি বললাম, ভদ্রমহিলা যে স্বয়ংসম্পূর্ণা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

—এদের তাই হওয়াই উচিত ও দরকার। খুব যদি না ভুল করে থাকি আন্দাজে তবে কিছুদিন পরেই যে সেখানে যাবার আমন্ত্রণ পাব, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। হোমস অন্যমনস্ক ভাবে বলে।

## ॥ আট ॥

দিন পনেরোর ভেতরেই আমার বন্ধুর ভবিষ্যৎ বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল।

এই পনেরো দিনে মিস হান্টারের ব্যাপারটা নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। কিন্তু মূল রহস্যের কোনো কিনারা জানতে পারিনি। জোফ্রা রুক্যাসল লোকটা সত্যিই সদাশয় বদান্য ব্যক্তি; না নির্ভেজাল বদমাস—ঠিক বুঝতে পারলাম না। বিশেষ কোনো পরিবারিক কারণেই এই বদান্যতা না এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র আছে তাও টের পেলাম না। হোমসকে জিজ্ঞেস করে জবাব পাই নি। সে শুধু মুচকি হেসে বললে, আগে তথ্য জোগাড় হোক তবে তো সিদ্ধান্ত।

পনেরো দিনের দিন সকালে হোমসের বৈঠক খানায় ঢুকতেই আমায় গম্ভীর কণ্ঠে বললে, ব্র্যাডশখানা দেখে উইঞ্চেষ্টরের ট্রেনের টাইমটা বলতো। বলে সে একখানা টেলিগ্রাম বাড়িয়ে ধরল আমার দিকে। পড়ে দেখলাম—উইনঞ্চেষ্টারের ব্ল্যাক সোয়ান হোটেলে আগামী দুপুরে হাজির থাকবেন। আমি খেই হারিয়ে ফেলেছি, ভায়োলেট,

—তুমিও যাবে তো ওয়াটসন? হোমস জিজ্ঞেস করল আমায়।

—ইচ্ছে তো সেই রকমই। জবাব দিলাম আমি।

—ট্রেন কটায় দেখলে?

—একটা ট্রেন রয়েছে সকাল সাড়ে নটায়, পৌঁছবে সাড়ে এগারোটায়।

—বেশ এই ট্রেনেই যাব।

*   *   *

পরের দিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদই আমরা দুজনে ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন সেই রাজধানীতে গিয়ে পদার্পণ করলাম। হোমস সারাটা রাস্তা শুধু খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই এসেছে। কিন্তু হ্যাম্পশায়ারের সীমানা পার হতেই কাগজ ফেলে দিয়ে সে প্রকৃতি পিয়াসী হয়ে উঠল।

এ এক আদর্শ বাসন্তী দিন। নির্মল সুনীল আকাশ, তাতে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, সূর্যের আলো অমলিন ভাবে এসে পড়েছে পৃথিবীর বুকে। বাতাসে তবু অল্প অল্প শীতলতার আমেজ। এমন পরিবেশে মানুষের কর্মক্ষমতা আর উৎসাহ অনেক গুণ বেড়ে যায়।

উইঞ্চেষ্টারের হাই স্ট্রীটের ওপরই ব্ল্যাক সোয়ান্ ইন্। বেশ খানদানী আর খ্যাতিমান হোটেল। ষ্টেশনের কাছেই। আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন মিস হান্টার। একটা রুম ভাড়া নিয়েছিলেন তিনি। লাঞ্চেরও অর্ডার দেওয়া ছিল।

—আপনারা আসাতে আমি সত্যিই ভারী প্রীত হয়েছি, মিঃ হোমস, সাগ্রহে বললেন তিনি। আমি বেজায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। এ সময়ে আপনার উপদেশ পাওয়া আমার কাছে অমূল্য পাওয়ার সামিল মনে হবে।

কী, ব্যাপারটা কী?

বলছি। সব কিছুই খুলে বলছি আপনাকে। তবে যা বলব, তা আমাকে তাড়াতাড়িই বলতে হবে। কারণ মিঃ রুক্যাসলয়ের কাছে আমি তিনটের মধ্যে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। অবশ্য তিনি জানেন না আমার এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য কী।

হোমস টেবিলের পাশ দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তার লম্বা লম্বা

শীর্ণ পা দুটো ছড়িয়ে, আড়াল করে ওকে বলল, যা বলবেন তা পরপর ক্রমানুযায়ী সাজিয়েই বলবেন কিন্তু। কিছু বাদ দেবেন না।

মিস হান্টার মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে বললেন, প্রথমেই বলে রাখা ভালো, মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রুক্যাসলয়ের কাছ থেকে এ পর্যন্ত কোনো দুর্ব্যবহার আমি পাইনি।

এইটুকুই যা প্রশংসার! আর ওঁদের আজও আমি বুঝতে পারিনি আর সে জন্যে ওঁদের সম্পর্কে আমার মনে অস্বাচ্ছন্দ্যেরও শেষ নেই।

—ওঁদের কোন জিনিষটা বুঝতে পারেন নি আপনি —? ওঁদের স্বভাব প্রথম যখন ওঁদের কথায় বীচেসের বাড়ীতে আসি, উনি তখন আমায় বলেছিলেন বাড়িটা নাকি খুবই সুন্দর। কিন্তু দেখে হতাশই হতে হয়েছে আমাকে। কোনো গঠন শৈলী বা নৈপুণ্য নেই। শুধু চারকোনা ফাঁপা একটা পাথরের চাংড়া যেন। চুনকাম করা হয়েছে যদিও কিন্তু তাতে কালের কলঙ্ক আর স্ট্যাম্পের ভিজে দাগ মিলোয় নি। চারপাশে বিস্তৃত জমি—তিন দিকে বন একদিকে মাঠ। মাঠটা আবার ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাউদাম্পটন হাই রোডের দিকে। সদর দরজার দিকেই এই মাঠ। একশ গজ আন্দাজ গিয়ে মোড় ঘুরে, মিশেছে বড় রাস্তায়। বাড়ীর সামনে এই যে মাঠটুকু— একটা বাড়ীর মালিকেরই। তিন দিকেই বনাঞ্চল কিন্তু লর্ড সাউ-দকাটনের খাস এলাকা।

এ বাড়ীর সামনে সদর দরজা থেকে একটু দূরেই কপার বীচ ঝোপ থাকায় বাড়ীর নামও হয়েছে কপার বীচেস হাউস। যেদিন এলাম, সেদিন সন্ধ্যেবেলায় মিসেস রুক্যাসল আর বাচ্চাটির সঙ্গে পরিচয় হল। আপনার বেকার স্ট্রীটের বাড়ীতে বসে যা অনুমান আমরা করেছিলম মিঃ হোমস, তা কিন্তু নির্ভুল নয়। মিসেস রুক্যাসল আদৌ পাগল নন। স্বকল্লক, পবিত্র মুখশ্রীর মহিলা তিনি। স্বভাব গম্ভীর। স্বামীর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। বয়স আন্দাজ ত্রিশ। আর মিষ্টারের বয়স মনে হয় পঁয়তাল্লিশের বেশী

ছাড়া কম নয়। কথাবার্তা থেকে বুঝেছি তাঁদের বিয়ে হয়েছে সাত বছর। মিঃ রুক্যাসল বিপত্নীক। প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত একটি মেয়ে আছে—তারই নাম অ্যালিস—থাকে আমেরিকার ফিলাডেল-ফিয়ায়। মিঃ রুক্যাসল আমায় জনান্তিকে জানিয়েছেন, সৎ মায়ের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াই তার মেয়ের এই প্রবাস বাসের কারন। অস্বাভাবিক কিছু নয়। অ্যালিসের বয়স শুনলাম কুড়ি একুশ সাবা-লিকা। কাজেই রূপসী তরুণী ভার্যার সঙ্গে ঠিক ঠিক খাপ খাওয়ানো তার পক্ষে হয়তো সম্ভবপর হয়নি—বিশেষ করে সংসারে দুজনের কর্তৃত্ব আজ পদাধিকার নিয়ে।

মিসেস রুক্যাসল এক অনুজ্জ্বল আর আত্মকেন্দ্রিক মহিলা। আমিন্যকও বটে। তাঁকে আমার পছন্দ হয় নি আবার মনে দাগও কাটেন নি। আসলে তিনি সংসারে আছেন কি নেই, তাই মাঝে মাঝে মনে পড়ে না। তবে স্বামী-পুত্রকে খুবই ভালোবাসেন, স্বামী-টিও খুব পত্নীবৎসল।

তবু মনে হয় মনের কোনো গোপন দুঃখই মিলনের বিমর্ষতা আর গাম্ভীর্যের কারণ। মাঝে মাঝে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে যান তিনি। তখন তাঁর সারা মুখ জুড়ে এক গভীর বিষণ্ণতা টলমল করতে থাকে। আমি তো একাধিকবার তাঁকে বিরলে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখেছি। হয়তো ছেলেটার জন্যেই তাঁর এই মান-সিক ক্লেশ-কষ্ট। কারন এমন বদ, উগ্র আর নিষ্ঠুর স্বভাবের ছেলে আর আমি দুটি দেখিনি। দেখতে বাজে। দেহের তুলনায় মাথাটা বেশ বড় আর গোল। ফুটবলের মত। যতক্ষণ জেগে থাকবে একটার পর একটা দুষ্টুমি করে চলবে। এইসব দুষ্টুমির মধ্যে তার প্রধান দুষ্টুমি হল, ছোটো ছোটো পোকা মাকড়, পশু-পাখী ধরে ধরে তাদের অকথ্য যন্ত্রণা দেওয়া। মেরে ফেলা।

এত দূর একটানে বলে এসে, সম্ভবতঃ দম নেবার জন্যেই থামলেন মিস হাণ্টার। হোমস চুপ করে একাগ্র মনে শুনে যাচ্ছিল তাঁর

প্রতিটি কথা। এবার সে মুখ খুলল। খুঁটিনাটি বিবরণের জন্য ধন্যবাদ

মিস হান্টার সলজ্জভাবে বললেন, আমি চেষ্টা করেছি প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক কিছু না যাতে বাদ যায়। হয়তো তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে রহস্যের মূল সূত্রটুকু। কপার বীচেস এর আরো একটা কথা এখনো আপনাকে জানাইনি—তা হলো সেখানকার ঝি-চাকরের ব্যবহার।

সংখ্যায় মাত্র দুজন—স্বামী আর স্ত্রী। পুরুষটির নাম টেলার, বাবরি চুল, আর লম্বা জুলফিধারী, মুখ দিয়ে সর্বক্ষণ ভক্ ভক্ করে মদের দুর্গন্ধ বেরোয়। লোকটা যেমন কর্কশভাষী তেমনই অমার্জিত আর জবুথবু স্বভাবের। গত পনেরো দিনের ভেতর আমি তাকে দু-দুবার বেহেড্ মাতলামি করতে দেখেছি কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মিষ্টার অ্যাণ্ড মিসেস রুক্যাসলয়ের তা নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য নেই। টেলার গিন্নী দীর্ঘাঙ্গী এবং রীতিমত বলিষ্ঠকায়া জাঁদরেল মেয়েমানুষ। মিসেস রুক্যাসলয়ের মতই স্বভাব গম্ভীর তবু কিছুটা সৌহার্দ্যপূর্ণ।

কপার বীচসে আসার পরের দুদিন একরকম চুপ চাপই কেটে গেল আমার। তৃতীয় দিনের প্রাতরাশের ঠিক পরেই মিসেস রুক্যাসল তার ঘর থেকে নীচে নেমে এসে স্বামীর কানে কানে কিছু যেন বললেন।

কথাটা শোনার পর মিঃ রুক্যাসেল আমার দিকে চেয়ে বললেন, ও হ্যাঁ, তাতো বটেই, তাতো বটেই। আমাদের খেয়ালের সম্মান দিতে নিশ্চয় উনি ওঁর বড় সুখের চুলগুলোকে ছোট ছোট করে ছেঁটে ফেলেছেন। আপনি বিশ্বাস করুন, মিস হান্টার, এতে কিন্তু আপনার দৈহিক রূপলাবণ্যের এতটুকুও ঘাটতি হয় নি। এবার আমরা দেখতে চাই, ইলেকট্রিক ব্লু-রঙের পোষাকটায় আপনাকে কেমন মানায়। আপনার ঘরের বিছানার ওপরেই রেখে দেওয়া হয়েছে সেটা। মিস হান্টার, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার

স্ত্রীর আর একটা তুচ্ছ খেয়াল চরিতার্থ করেন—উনি সেই কথাটা আমায় বলছিলেন।

নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানার ওপর যে পোশাটিকে পড়ে থাকতে দেখলাম, তার রঙটা বাস্তবিকই একটু অদ্ভুত ধরনের। নীলের ওরকম শেড সচরাচর চোখে পড়ে না। নীলের মধ্যে উজ্জ্বল ধূসর ভাব। চমৎকার ডিজাইনের পোশাক।

চমৎকার পশমী কাপড়। পুরনোও ঠিক নয়, তবে পোষাকটি পূর্বব্যবহৃত। অ্যালিসের পোষাক। অ্যালিসই পরেছে সম্ভবত। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে পোষাকটা সত্যিই আমায় ফিট করল। মিষ্টার এণ্ড মিসেস ড্রইংরুমে বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নীল পোষাক পরা অবস্থায় আমার সেখানে ঢুকতে দেখে, দুজনই সমবেত ভাবে হর্ষ প্রকাশ করলেন। নির্ভেজাল আনন্দধ্বনি। পোষাকটা যে আমায় অতটা মানাবে এ যেন তাঁরা আগে ভাবেননি।

বিরাট ড্রইংরুম। বাড়িটার পুরো সামনের দিকটা জুড়ে বিস্তৃতি তিনটে বড় বড় জানলা মাঠের দিকে। মাঠের জানালার কাছে একখানা চেয়ার পাতা। অবশ্য পিছন দিক করে। আমাকে ঐ চেয়ারে বসতে বলা হল। বসলাম। তারপর রুক্যাসল ঘরময় ঘুরে ঘুরে নানান মজার মজার গল্প বলতে আর ক্যারিকেচার করতে শুরু করলেন। হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরার যোগাড়! ভদ্রলোক এত হাস্যরসিক। মিসেস রুক্যাসল তো একটি নীরস তরুবর বিশেষ। এঁর সেন্স অফ হিউমার বলে কোনো বালাই নেই। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য আর চোখে মুখে নির্ভেজাল বিষণ্ণতা আর উদ্বিগ্নতার ছাপ মাখিয়ে দু-হাত কোলে জড়ো করে কাঠের পুতুলের মত বসে রইলেন। ঘণ্টাখানেক পরে হঠাৎ যেন কি

রুক্যাসলয়ের খেয়াল পড়ল যে, আমার ডিউটির সময় হয়ে গেছে এবারে আমাকে এডোয়ার্ডের সঙ্গে তার নার্সারীতে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি তামাসা থামিয়ে তিনি সেই নির্দেশ দিলেন আমাকে।

দিন দুই পরে এই একই ব্যাপার ঠিক একইভাবে সংঘটিত হল। আবার আমি আমার পোষাক পাল্টে নীল পোষাক পরলাম.... ড্রইংরুমের মাঝের জানলার ধারে চেয়ার পেতে বসলাম.......... মিঃ রুক্যাসল কমিক করলেন.......আমি প্রাণভরে হাসতে লাগলাম। তারপর ঘণ্টাখানেক পরেই হঠাৎই পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল সমস্ত কিছুর ওপরে।

তবে এবারের নতুনত্বের মধ্যে ছিল, খানিকক্ষণ কমিক চালিয়ে আমার হাতে একটা হলদে জ্যাককভারের বই দিয়ে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে শোনাতে বললেন। বই পড়বার আগে চেয়ারখানাকে এমনভাবে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিলেন যাতে আমার ছায়া এসে না পড়ে বইয়ের পাতায়। অর্থাৎ সূর্যের আলো আমার পেছনে না থেকে আমার পাশে রইল। মিনিট দশেক পড়বার পর একটা পরিচ্ছেদ শেষ হবার আগেই, একটি বাক্য অসমাপ্ত থাকতেই মিঃ রুক্যাসল হঠাৎ আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে, আপনি এবার আপনার পোষাক পরে নিজের ডিউটিতে যান মিস হান্টার। ঠিক দুদিন পরে পুনরাবৃত্তি ঘটল একই ব্যাপারের। আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন, মিঃ হোমস যে এই অসাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমি কতটা ঔৎসুক্য বোধ করছিলাম, এবং অন্তর্নিহিত অর্থ জানবার জন্যে কতটা উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। তাঁরা সব সময়েই খুব সচেতন ছিলেন, যাতে আমি না আমার পেছনে কি হচ্ছে না হচ্ছে মুখ ঘুরিয়ে তা দেখবার কোনো সুযোগ পাই বা চেষ্টা করি। আমিও প্রথমে অসম্ভব ভেবেছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই

একটা উপায় বেরিয়ে গেল। আমার হাত আয়নাটা ভেঙে গেছিল। মনে মনে স্থির করলাম, রুমালের মধ্যে করে একটা ভাঙা টুকরো লুকিয়ে নিয়ে যাব এর পর। তারপর এক ফাঁকে মুখ মোছবার ছল করে পেছনে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা চট করে দেখে নেব। পরের বার নিজের মতলব মতই কাজ করলাম। তবে স্বীকার করছি, আমি হতাশই হলাম। আমার পেছনে কিছু ছিল না। অবশ্য সেটা আমার প্রাথমিক ধারণা ও দর্শন মাত্র। দ্বিতীয়বার দেখতে পেলাম ফুরফুরে দাড়ি গোঁফওয়ালা, ছাই রাঙ্গা স্যুট পরিহিত এক ভদ্রলোক সাউদাম্পটন রোড়ে দাঁড়িয়ে এই বাড়ীর দিকেই ঠায় চেয়ে রয়েছেন। রেলিং যেখানটায় প্রধান পথ আর আমাদের জমিকে সীমাবদ্ধ করেছে, সেইখানে রেলিং এ ভর দিয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কপার বীচেস এর দিকে।

মুখের ওপর থেকে রুমাল নামাতেই দেখি মিসেস রুক্যাসল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছেন। তিনি প্রকাশ্যে না বললেও বুঝলাম, আমার চালাকি তিনি খানিকটা ধরে ফেলেছেন! মিসেস রুক্যাসল উঠে দাঁড়ালেন তাঁর আসন ছেড়ে। জেফ্রো, তিনি ডাকলেন রাস্তায় একটা লোক মিস হান্টারেব দিকে কেমন অসভ্যের মত হাঁ করে চেয়ে রয়েছে।

মিঃ রুক্যাসেল উঁকি মেরে দেখে বললেন, আপনার কোনো বন্ধু নয় তো মিস হান্টার?

কী অভদ্র লোফার মার্কা। আপনি দয়া করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে ওখান থেকে সরে যেতে বলুন মিস হান্টার।

তার দরকার কী? লোকটাকে গ্রাহের মধ্যে না আনলেই তো হয়।

—না না তাড়িয়ে না দিলে ও এর পর আরো লাই পেয়ে যাবে। আর দিনের পর দিন এ ভাবে ঘুর ঘুর করতে থাকবে এখানে।

আপনি বরং ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে ওখান থেকে সরে যেতেই বলুন, মিস হান্টার।

আর কোনো জবাব না দিয়ে যেমনটি বললেন তেমনটি করলাম। সেই সঙ্গে মিসেস রুক্যাসল জানালার খড়খড়িটাও টেনে দিলেন। এ ঘটনা এক সপ্তাহ আগেকার। আশ্চর্য। তারপর থেকে কিন্তু আর আমায় নীল পোষাক পরে জানালার ধারে চেয়ার পেতে বসবার প্রয়োজন হয় নি। লোকটাকেও আর দেখিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে।

মিস হান্টার থামতেই হোমস বলল, থামবেন না, বলে যান, বলে যান। বেশ ইন্টারেষ্টিং লাগছে।

মিস হান্টার জবাব দিলেন, বলছি তবে হয়ত ঠিক পারম্পর্য রক্ষা করে বলতে পারিনি। তা না পারলেও আপনার মত স্থিতধী মানুষ নিশ্চয়ই তাদের পাশাপাশি এনে একটা বন্ধনের কাজ করে ফেলতে সক্ষম হবেন। কপার বীচেসয়ে পৌঁছবার প্রথম দিনেই মিঃ রুক্যাসল রান্নাঘরের কাছাকাছি তাদের ছোট আউট হাউস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে। ঘরের কাছাকাছি গিয়েই শুনতে পেলাম লোহার চেনের ঝনঝনে আওয়াজ আর কোন বড় ও ভারী জন্তুর ঘরময় অস্থির চরণে পায়চারি করে ফেরার শব্দ।

এখান দিয়ে দেখুন, ভদ্রলোক আমায় এক দিককার তক্তার জোড়ের ফাঁকে চোখ রাখতে ইসারা করলেন, যাকে বলে সাক্ষাৎ সৌন্দর্য তাই না?

সৌন্দর্য কিনা জানি না, তবে একজোড়া জ্বলন্ত চোখ আমার নজরে এলো, সেই একটা অস্পষ্ট কালো ছায়া, হয়ত আমার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। তাই দেখে আমার মনিব সহাস্যে জানালেন, ভয় পাবেন না, ও হচ্ছে কার্লো—আমার পোষা ম্যাষ্টিফ হাউণ্ড। আমি আমার পোষা বলছি আসলে আমাদের পরিচারক টোলার তারই অনুগত ওটা। টোলার ছাড়া ওকে বাগ মানা-

বার সাধ্য এ বাড়ির—শুধু বাড়ি কেন এ তল্লাটে কারো নেই। চব্বিশ ঘণ্টায় একবার মাত্র ওকে খাবার খেতে দেওয়া হয়, তাও পেট ভরে নয়, যাতে সব সময়ে ও ক্ষিধের জ্বালায় একটা ক্ষুদে রাক্ষস সেজে থাকে। রোজ রাত্তির বেলায় ওকে, ছেড়ে দেয় চরে বেড়াতে। ঈশ্বর না করুন, সেই সময়ে কোনো অনাহুত বা আগন্তুক প্রবেশকারী যদি ওর মুখোমুখি পড়ে যায়। তাহলে— কথাটা সেখানেই অসমাপ্ত রেখে তিনি আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, খবরদার ভুলেও যেন কোনো দিন রাত বিরেতে একা একা এ বাড়ির সদর চৌকাট পেরোবার চেষ্টা করবেন না, মিস হান্টার. তাহলে আর জীবন নিয়ে ফিরতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

সাবধানবাণী যে অসার নয়, তার প্রমাণ পেলাম কিছু দিন পরে এক নিদ্রাহীন রাতে। রাত তখন ছুটো আড়াইটে হবে। ঘুম আসছিল না বলে খোলা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। চমৎকার জোৎস্না রাত। সামনের মাঠটা রূপোর মত চকচক করছে। সমস্ত কিছু পরিস্কার নজরে আসছে দিনের বেলার মতই মুগ্ধ হয়ে দেখছি গ্রামাঞ্চলের নিশি সৌন্দর্য। হঠাৎ চমক ভাঙল কপার বীচ ঝোপগুলোর তলায় কী একটাকে নড়াচড়া করতে দেখে, কি ওটা? ভাবতে না ভাবতেই সেই সঞ্চরণশীল জন্তুটা উন্মুক্ত চাঁদের কিরণের মাঝামাঝি এসে পড়ল। পরিপূর্ণভাবে আমার দৃষ্টিগোচর হল সেটা।

বিরাটকায় একটা কুকুর।

কুকুর না বলে বাছুর বললেই মানায় ভাল। রাজসিকচালে কপার বীচের গেট থেকে বেরিয়ে মাঠ ঘুরে বাড়ির জন্য পাশে ঝোপের আড়ালে চলে গেল। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল ঐ রাক্ষস কুকুরটাকে দেখে। বাস্তবিক কোনো অবাঞ্ছিত কেউ যদি ওর সামনে পড়ে যায়, তবে তার যে কী হাল হবে, তা কল্পনা করতেও ভ হয়।

এবার আমি আমার সবচেয়ে আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে শোনাব মিঃ হোমস। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন যে, আমি কাজের খাতিরে আমার শখের চুলগুলোকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু বড় শখের আর সাধের চুল তো, ফেলে দিতে তাই মায়া হল। আমি কাটা চুলগুলোকে বেশ করে কাগজে মুড়ে আমার ট্রাঙ্কের তলায় রেখে সঙ্গে করে এনেছিলাম।

একদিন সন্ধ্যের পর, এডোয়ার্ড ঘুমিয়ে যেতে কী খেয়ালে কে জানে, আমি আমার ঘরের আসবাবপত্র পরীক্ষা করে দেখতে প্রবৃত্ত হলাম। সেই সঙ্গে নিজের যা জিনিষ, তাও গোছাতে বসলুম।

ঘরের মধ্যে টানাওলা একটা পুরোনো বড় দেরাজ ছিল। ওপরের টানাত্বটি ছিল খালি আর খোলা। কিন্তু নীচেরটি ছিল চাবিবন্ধ। আমার টুকিটাকি জিনিষে ওর ঘর ত্বটো বোঝাই হয়ে গেল। এখনো কিছু জিনিষ বাকি ছিল গোছাতে, বাধ্য হয়ে নীচের টানাটা দরকার পড়ল ব্যবহারের জন্য। কিন্তু খুলি কি ভাবে? চাবিবন্ধ যে। হয়তো এ টানাটাও খালি. ভুল করে চাবি খোলা হয় নি আমায় ব্যবহার করতে দেবার সময়ে। আমার নিজস্ব যে চাবির গোছা ছিল তাই দিয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম টানাটা খোলার।

অবাক কাণ্ড। প্রথম চাবিটাই লেগে গেল কাজে। টানাটাকে টেনে খুললাম। ঠিক খালি নয়—একটি মাত্র বস্তু ছিল তার মধ্যে। কী বস্তু জানেন? আপনি আন্দাজও করতে পারবেন না হাজার মাথা ঘামিয়ে।

বস্তুটি আর কিছু নয়—আমারই কাটা চুলের গোছা! কিন্তু আমার নয়—আর কারো। অথচ, পরীক্ষা করে দেখলাম রঙে, আকৃতিতে আর ঘনত্বের দিক দিয়ে আমার আর এই চুল হুবহু এক। এটা কি অসাধারণ ব্যাপার নয় কি হোমস? মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলাম না এই কেশ রহস্যের। চুলের গোছা যেমন ছিল

তেমনিই আবার রেখে দিলাম টানা বন্ধ করে। জিনিষপত্র আর সাজালাম না। এমন কি মিস্টার এণ্ড মিসেসকেও কিছু খুলে বললাম না এ ঘটনার কথা। কেননা, দোষ আমারই, আমিই ভুল করে ওঁদের চাবি দেওয়া টানা বেআইনীভাবে খুলেছি।

আমার স্বভাবই হল, যা দেখব তা খুঁটিয়ে দেখব। কপার বীচেস হাউসটাও তাই খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে ছাড়িনি। বাড়িটার একটা পরিত্যক্ত অংশ আছে। ঐ অংশে যে দরজাটি, সেটি চব্বিশ ঘণ্টা তালা বন্ধই থাকে। একদিন হঠাৎই আমার নজর পড়ল, মিঃ রুক্যাসল ঐ দরজাটি খুলে বেরিয়ে আসছেন। হাতে তালা চাবি। মুখের যা ভাব দেখলাম তাঁর। তাতে মনে হল, আমার রোজকার দেখা মিঃ রুক্যাসল আর এই মিঃ রুক্যাসল এক ব্যক্তি নন। এ মুখ একজন ভীষণ ক্রুদ্ধ, বদমেজাজী আর নিষ্ঠুর প্রকৃতির কোনো মানুষের। এত রেগে যাচ্ছেন যে, ওঁর রক্তের শিরাগুলো পর্যন্ত ফুলে উঠেছে বিশ্রীভাবে। তিনি দরজা বন্ধ করে হন হন করে ঠিক আমার পাশ ঘেঁষেই বেরিয়ে গেলেন নিজের গন্তব্যে, কিন্তু আমায় মোটেই লক্ষ্য করলেন না।

কৌতুহলী হয়ে উঠলাম। পরিত্যক্ত অংশে উনি গেছিলেন কোথায়? কেন গেছিলেন? অত রাগই বা হল কার উপর? প্রশ্ন তিনটির সদুত্তর না পাওয়া অবধি আমার এ কৌতুহলের নিরসন হবে না তা ঠিক। তাই পরের দিন যখন এডোয়ার্ড কে নিয়ে লনে বেড়াতে বেরোলাম তখন ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলাম ঐ পরিত্যক্ত অংশের দিকেই।

দেখলাম এই অংশে দোতলা পাশাপাশি চারটি জানালা রয়েছে। তিনটি জানালা অপরিস্কার, অপরিচ্ছন্ন। ঝুল কালি পড়া, এবং গন্ধ মাখা চতুর্থটি পরিস্কার, তবে বন্ধ হলেও খড়খড়ি খোলা। এধার ওধার ঘুরছি আর মাঝে মাঝেই চোখ তুলে তাকাচ্ছি জানালাগুলোর দিকে।

এমন সময় মিঃ রুক্যাসল সহাস্যমুখে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার গতকালের ব্যবহারে কিছু যেন মনে করবেন না, মিস হান্টার। ব্যবসাগত কারণে মনটা তখন খানিকটা উন্মনা ছিল।

আমি তাকে জানালাম যে, আমি কিছু মনে করিনি। তারপর কথাচ্ছলেই বললাম, ভালো কথা, এ বাড়ির দোতলায় কিছু খালি আর বাড়তি ঘরও রয়েছে দেখছি। ওগুলো কোনো কাজেই আসেনা বুঝি ?

মিঃ রুক্যাসল জবাব দিলেন, ফটোগ্রাফির বাতিক আছে আমার। ঐ খড়খড়ি তোলা জানালাগুলো ঘরটাকে ডার্করুম বানিয়েছি। আপনার চারিদিকে লক্ষ্য আছে তো।

কথাগুলো ভদ্রলোক শান্ত কণ্ঠে বললেও আমি তার চোখের তারায় সন্দেহ আর বিরক্তির ছায়াপাত লক্ষ্য করলুম। আমি সেই মুহূর্তেই বুঝে গেলাম, ঘরগুলোর পেছনে এমন কিছু রহস্য আছে যা আমার মনিব আমায় জানতে দিতে চায় না। আমার মন চঞ্চল হলো সেই রহস্যভেদ করতে। এ শুধুমাত্র কৌতুহলই নয়, তার চেয়েও অনেক বড়। আমার মন বলছিল যে, ঐ রহস্য আমি যদি ভেদ কয়তে পারি তবে শুভ ছাড়া অশুভ হবে না। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই একটা সহজাত প্রেরণা থাকে, আমার আগ্রহটাও হয়তো তেমনই কিছু। সেই থেকে তক্কে তক্কে রইলাম—কখন একটা সুবর্ণ সুযোগ পাই ঐ নিষিদ্ধ দরজাটি পার হওয়ার।

মাত্র গতকালই এলো সেই সুবর্ণ সুযোগ।

হ্যাঁ, আরো একটা কথা—মিঃ রুক্যাসল ছাড়া আরো দুজনের প্রবেশাধিকার ছিল সেই পরিত্যক্ত অংশে। তারা হলো টোলার আর তার স্ত্রী। একবার আমি টোলারকে একটা কালো রঙের বড়সড় লিনেন ব্যাগ নিয়ে ঢুকতে দেখেছিলাম ঐ দরজা দিয়ে। গতকাল খুব মদ খেয়েছিল টোলার। তারই ফলে হয়ত দরজায় চাবি

দিতে ভুলে গেছিল সে। ব্যাপারটা যখন আমার নজরে পড়ল তখন মনিব আর মনিবগিন্নী ছিলেন একতলায়। বাচ্চা এডোয়ার্ড তাদের কাছে ছিল। কাজেই আমায় লক্ষ্য করার মত কেউ তখন ছিলোনা দোতলায়। আমি সতর্ক দৃষ্টিতে ভালো করে চারপাশ দেখে নিয়ে দরজা খুলে স্যুট করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

সামনেই একটা শুঁড়ি পথ। খানিকটা সোজা গিয়ে ডান দিকে মোড় ঘুরেছে। মোড়ের এই কোণে পরপর তিনটি দরজা বসানো। প্রথম এবং তৃতীয় দরজাটি খোলা, দ্বিতীয়টি বন্ধ। খোলা দরজাগুলির সামনে গিয়ে দেখলাম ঘর ফাঁকা, এবং ন্যাক্যারজনকভাবে অপরিস্কার। একটি ঘরের জানালার সংখ্যা দুই, অপরটি এক, ঝুলকালি আর মাকড়সার জালে সমাচ্ছন্ন। সেই আবরণ ভেদ করে অতিকষ্টে বাইরের হলুদ রাঙা আলো সেখানে প্রবেশের চেষ্টা করছে।

মাঝের ঘরটার দরজা বন্ধ। শুধু তালা লাগানোই নয়, তাড়াতাড়ি ভাবে লোহার পাত লাগানোও বটে। পাতের মুখগুলোয় পর্যন্ত তালা দেওয়া, বুঝলাম, বাড়ির বাইরে থেকে খড়খড়ি তোলা যে জানালাটি আমার নজরে পড়েছিল, সেটি এই ঘরেরই। কপাটের জোড়ে ফাঁক ছিল চুলের মত সরু। সেই ফাঁকে চোখ রাখলাম ঘরের ভেতর কী আছে তার আন্দাজ পেতে। কেন এত সতর্কতা? সামান্য একটা ডার্করুম হলে কি আর এত ব্যারিকেড করা হত দরজায়?

কিন্তু চোখ লাগিয়েও কিছু দেখতে পেলাম না। সরে এসে ভাবছি আকাশ পাতাল, এমন সময়ে সুস্পষ্ট পদশব্দ উঠল সেই বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে। দরজার চৌকাঠের কাছের আলোকিত কোনটা মুহূর্ত্তের জন্যে অন্ধকার হয়ে আবার আলোকিত হয়ে গেল। মনে হল, কে যেন ঘরের একপাশ থেকে হেঁটে আর এক পাশে চলে গেল।

অকস্মাৎ একটা বন্য আর কঠিন ভয় এসে আমার সর্বদেহ-মন

গ্রাস করে বসল। পরিত্যক্ত অংশে, তালাবন্ধ ঘরে, এ কার পদশব্দ? অবিমিশ্র আতঙ্কে শিথিল হয়ে পড়ল স্নায়ুতন্ত্র। সেখানে দাঁড়াবার আর ভরসা হলো না আমার। আমি পেছন ফিরে চোখ কান বুজে ছুট লাগালাম দরজার দিকে। কেমন মনে হচ্ছিল, ঐ বুঝি একটা অশরীরী হাত চেপে ধরতে আসছে আমায়। বেখেয়ালে দৌড়তে এসে ধরা পড়লাম মিঃ রুক্যাসলের প্রসারিত দুবাহুর মাঝখানে।

ও আপনি? স্মিত মুখে তিনি বললেন, দরজা খোলা দেখেই আর আপনাকে খুঁজে না পেয়েই আমি সে রকম একটা আন্দাজ করছিলাম।

উঃ, যা ভয় পেয়েছিলাম! হাঁফাতে হাঁফাতে বলি আমি।

ভয় পেয়েছিলেন? কীসের ভয়? উনি আমার গায়ে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি যেন প্রয়োজনের চেয়েও অত্যধিক কোমলতা প্রকাশ করছেন তাঁর বাচনে এবং আচরণে—অন্তত তাই আমার মনে হলো তখন। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে পড়লাম। ঐ পরিত্যক্ত অংশটায় একা একা যাওয়াটাই আমার চূড়ান্ত বোকামী হয়েছিল। মিটমিটে আলো আঁধারিতে জায়গাটা এমন ভুতুড়ে আর নিরালা ঠেকল যে পালিয়ে আসতে পথ পাই না শেষে।

ব্যাস আর কিছু নয়? শুধু নিরালা আর ভুতুড়ে? তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন আমার চোখের পানে।

কেন বলুন তো? ভয় দেখানোর মত আরো কিছু ভয়াবহ জিনিষ সেখানে আছে নাকি? পাল্টা প্রশ্ন করি আমি।

উনিও আমার জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন আমায়।

দরজাটা চব্বিশ ঘণ্টাই বন্ধ রাখা হয় কেন জানেন?

না।

ওখানে যাদের কোন কাজ নেই, তারা যেন বিনা কারনে বিনা অনুমতিতে কোনো মতে প্রবেশ না করতে পারে। তাই। তখনো হাসছিলেন মিঃ রুক্যাসল।

—দুঃখিত। আমি যদি আগে জানতাম—

—যাই হোক, এবার তো জানলেন। কেউ যদি কোনো দিন ঐ চৌকাঠ মাড়িয়েছে তো—

মুহূর্তের মধ্যে কঠিন আর কুটিল হয়ে উঠল তাঁর হাসিমাখা মুখ। গলার স্বাদ হল কোমল থেকে কর্কশ। দৃষ্টি হল স্নেহ-রক্ষা থেকে অগ্নিঝরা। আমি তাহলে আপনাকে কার্লোর মুখে ফেলে দেব মনে রাখবেন।

শুনে আমি ছুটে পালিয়ে গেছিলাম নিজের ঘরে। আপনার কথা মনে পড়ল আমার। আপনার উপদেশ না পেলে আর এক-দণ্ডও আমি থাকতে পারব না ও বাড়িতে। ওখানকাব সব কিছুই এখন চোখেই ঠেকছে আমার কাছে। সবচেয়ে ভালো হতো, একবার যদি সশরীরে আপনাকে নিয়ে যেতে পারতাম। অবশ্য পালাতে কোনো বাধা নেই। জীবনের চেয়ে টাকা বড় নয়। কিন্তু একটা জিনিষ। আমার সমস্ত ভয়কেও ছাপিয়ে গেছে—তা হল কৌতুহল।

অতঃপর যে কায়দায় আমি বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরের পোষ্টাফিসে গিয়ে আপনাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আবার ফিরে এলুম বাড়িতে তা আর নাই বা শুনলেন। যাই হোক, সবই শোনালাম আপনাকে। এবার আমার ফিরে যাওয়া দরকার। তিনটের আগে যে করেই হোক পৌছতে হবে। কারন মিষ্টার অ্যাণ্ড মিসেস উইঞ্চেষ্টারে যেন কার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বিকেল চারটে নাগাদ। বাচ্চাটাকে সামলাতে হবে আমায়। এখন বলুন, যা যা শুনলেন তার মানে কী আর এক্ষেত্রে আমারই বা আশু কর্তব্য কী?

হোমস আর আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনছিলাম মিস ভায়োলেট

হান্টারের দীর্ঘ এবং অনন্য সাধারণ কাহিনী। হোমস উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। গভীর চিন্তান্বিত মুখে হোটেলের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটির এপাশ থেকে ওপাশে পদচারনা করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, টোলার এখন কি অবস্থায় রয়েছে? সে তো কাল সন্ধ্যে থেকেই বেহুঁস। আজও ওঠেনি বিছানা ছেড়ে। এতক্ষণ কারো নেশা থাকে নাকি? নেশা না থাক আজ আর কোনো কাজ করতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে তার বৌকে দিয়ে। আমি নিজের কানে শুনেছি সে কথা। রুক্যাসল দম্পতিও তো চারটের পর বাইরে যাচ্ছেন, কখন ফিরবেন কিছু ঠিক নেই। কেমন?

হ্যাঁ।

—আচ্ছা, ও বাড়িতে বেশ শক্ত মজবুত দরজাওলা কোনো সেলার আছে জানেন।

—আছে। মাটির নীচের মদের সেলার।

বেশ। এবার আমাদের জন্যে একটা শক্ত কাজ করতে পারবেন কি? আমি অবশ্য করতে বলতাম না আপনাকে। কিন্তু আপনি সাধারণ মেয়ে নন বলেই বলছি।

—নিশ্চয় করব। কাজটা কি?

—শুনুন তাহলে, সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আমরা গিয়ে হাজির হচ্ছি কপার বিচেসয়ে। ততক্ষণে আপনার মনিব আর মনিবানি চলে যাবেন অন্য জায়গায়। টোলার তো শয্যাশায়ী। বাচ্চাটা থাকছে নার্সারীতে। সচল আর সঙ্কট থাকছে শুধু টোলার গিন্নী। এখন আপনি যদি এই মহিলাটিকে কোনো ছল ছুতোয় মদের ভাঁড়ারে পাঠিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিতে পারেন, আমাদের কাজটা তবে সহজ হয়ে পড়ে অনেক।

পারবেন কি?

—নিশ্চয়ই পারব।

—চমৎকার! আপনার মুখে সমস্ত বিবরন শুনে একটা কথাই

বার বার আমার মনে হচ্ছে যে, আপনাকে যেন কারো নকল করতেই আনিয়েছেন ওঁরা। ছেলের তদারকী করবার জন্য নয়! আর যার স্থলাভিষিত হয়ে এসেছেন আপনি, সে হয়তো পরিত্যক্ত অংশের রুদ্ধদ্বার একটি কক্ষে বন্দীই হয়ে আছে। কে সে?' তার উত্তরও আমি ভেবে দেখেছি। বন্দী মিস অ্যালিস রুক্যাসল। ফিলা-ডেলফিয়ায় যাওয়ার কথা মিথ্যে বাজে। কিছু মনে করবেন না, মিস হান্টার, গভর্নেস হিসেবে আপনি এমন কিছু অনন্যসাধারণ গুণের অধিকারিনী নন, যার দরুণ অত টাকা মাইনে দিয়ে আপনাকে কাজে বহাল করতে হবে। আসলে আপনার উচ্চতা, দৈহিক গঠন, মুখের আদল, চুলের রং—সব কিছুই নিঃসন্দেহে মিস রুক্যাসলের সঙ্গে মিলে যায় বলেই আপনাকে বাছাই করা হয়েছে কাজের অছিলায়। মিস রুক্যাসলের খুব সম্ভব কোনো শক্ত অসুখ করেছিল, যার ফলে তার চুল ছোট ছোট করে ছেটে ফেলতে হয়। আপনাকেও তাই বিসর্জন দিতে হলআপনার সাধের কেমবাদামকে। রাস্তায় দাঁড়ানো আপনার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা সেই লোকটি সম্ভবত অ্যালিসের কোনো বন্ধু বা প্রণয়ী তাকে বোধ হয় মিষ্টার অ্যাণ্ড মিসেস স্বচক্ষে দেখেন না, অ্যালেসরূপী আপনাকে দিয়েই প্রত্যাখ্যাত করানো হয়েছে, তাকে শুধু তাই নয়! পাছে সে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি এসে অ্যালিশ ভেবে আপনার সঙ্গে দেখা করে, তাই কুকুরটাকে আধপেটা করে খাইয়ে, বুভুক্ষু রেখে তাকে হিংস্র করে তুলে ছেড়ে দেওয়া হয় রাত্তিরে। এই বাহ্য। কিন্তু সবচোয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, বাচ্ছাটাকে সব দিক দিয়ে বিকৃত করে তোলা।

তার মানে? এ ব্যাপারে তার যোগাযোগ কতটুকু? আমি সবটাই জিজ্ঞাসা না করে পারছি না।

মাই ডিয়ার ওয়াটসন, মেডিক্যাল ম্যান হিসেবে এ তথ্য তোমার অজানা নয় যে, মা কিংবা বাপের বিশেষ কোনো জৈব প্রকৃতিই তার সন্তানের মধ্যেও ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে। তেমনি কোন

বাচ্চাকে স্টাডি করলে তার বাপ মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও অনুমান করা কঠিন হয় না। বাচ্চা এডোয়ার্ডের চরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণের কথা তুমিও শুনেছ অহেতুক নিষ্ঠুরতা। ছোট ছোট পোকা মাকড়, পশু-পাখী ধরে ধরে তাদের জঘন্য যন্ত্রনা দিয়ে মেরে ফেলা এ বৈশিষ্ট্য সে পেল কোথায়? অবশ্যই মা-বাবার কারো তরফ থেকে। এখন বুঝে দেখ, এ হেন দুই নারী পুরুষের কবলে পড়েছে একটি অসহায়া মেয়ে তার ভবিষ্যৎ একবার চিন্তা করে নাও।

শুনে শিউরে উঠলাম আমরা দুজনেই। হোমস বললে, আমাদের খুব সাবধানে পা ফেলে এগোতে হবে এ ব্যাপারে। কারণ প্রতিপক্ষ যেমন নিষ্ঠুর তেমনই চতুর। মনে রাখবেন ঠিক সন্ধ্যে সাতটার সময়েই আমরা পৌছচ্ছি সেখানে।

ঠিক সাতটার সময়েই গিয়ে পৌছলাম কপার হাউসে। মিস হান্টারের সঙ্গে দেখা হতেই হোমস জিজ্ঞেস করল, যে কাজের ভার দিয়েছিলাম তা ঠিক ঠিক করতে পেরেছেন তো?

মিস হান্টার জবাব দেওয়ার আগেই দূর থেকে শোনা গেল, দুম দুম করে দরজা পেটানোর আওয়াজ।

মিস হান্টার ইঙ্গিতে জানালেন নিজের কাজের সশব্দ ফলশ্রুতি। বললেন, বউ বন্দিনী সেলারে আর পতি দেবতাটি নিজের ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। এই নিন, সেই পবিত্যক্ত অংশের বন্ধ প্রবেশ দরজার ডুপ্লিকেট চাবির গোছা।

চমৎকার। একমুখে আপনার তারিফ করব আনন্দে। সোৎসাহে অকৃত্রিম হর্ষ প্রকাশ করল হোমস। চলুন এবার যাওয়া যাক তাহলে শেষ করে দেওয়া হোক রুকাসলের কালো ধান্দা। বিনা কোন প্রতিবন্ধকতায় আমরা পৌঁছে গেলুম যথাস্থানে। দরজার গায়ে লোহার পাতও খুলে ফেলা হলো। এবার ঝোলানো তালার পালা। ঘরের ভেতরটা কিন্তু নিস্তব্ধ। কেউ যে আছে সেখানে এমন টের পাওয়া যাচ্ছে না।

খুব বেশী দেরী আমরা নিশ্চয় করিনি, হোমস বলল। আমার মনে হয়, মিস হান্টার আমাদের সঙ্গে এখনই আপনার ওই ঘরের ভেতরে ঢোকাটা ঠিক উচিত হবে না। আপনি বরং বাইরেই থাকুন আপাততঃ। মাই ডিয়ার ওয়াটসন, কব্জী লাগাও। দেখি দরজা খোলা যায় কি না।

কারণ হোমস তালা খুলতে পারেনি দরজার। পুরোন বাড়ির পুরোন দরজা। আমাদের যৌথ শক্তির সামনে হার স্বীকার করল। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল জোড়ার একটি কপাট। হুড়মুড় করে ঢুকলাম ঘরে। টর্চ জ্বাললাম।

কিন্তু এ কি! ঘর যে ফাঁকা। কেউ তো নেই। এক ব্যাগ কাপড় চোপড় ছিল শুধু। মাথার উপরকার স্কাইলাইট খোলা। বন্দিনী উধাও। নিশ্চয়ই কিছু শয়তানী চাল চালা হয়েছে এর মধ্যে, হোমস বলল, মিস হান্টারের মতলব বুঝে, আমরা আসার আগেই বন্দিনীকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এঘর থেকে।

কিন্তু কী ভাবে?

এই স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে। এক্ষুনি বোঝা যাবে কী ভাবে কী হয়েছে। টেবিলটা খাটেব উপর পাতো তো ওয়াটসন।

খাট আর টেবিলের সাহায্যে দীর্ঘদেহী হোমস অনায়াসেই স্কাইলাইটের ফাঁক গলে ছাদে চড়ে বসল। কিছুক্ষণ পরে নেমে এসে বললে, যা ভেবেছি ঠিক তাই। ঘরের ছাদের আড়ালে একটা লম্বা দড়ির মই দেখতে পেলাম।

অসম্ভব রুক্যাসল যখন চলে গেলেন বাইরে তখনো ওটা ওখানে ছিল না। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন মিস হান্টার।

—তখন ছিল না। পরে লাগানো হয়েছে। ভদ্রলোক ফিরে এসে এই কীর্তিটি করেছেন। যাতে তাঁর বিরুদ্ধে অ্যালিসকে খুন করে রাখার কোনো প্রমাণ না থাকে। ওহ্, অসম্ভব চতুর লোক। হঠাৎই উৎকর্ন হয়ে উঠল হোমস, পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি কারো। মিঃ

রুক্যাসলের হলে আশ্চর্য হক না। মাই ডিয়ার ওয়াটসন, সাবধানের মার নেই। পিস্তল রেডি রাখ।

হোমসের মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই সেই ঘরের দরজা জুড়ে দাঁড়াল একজন বিশালকায় হৃষ্টপুষ্ট লোক। হাতে মোটা আর ভারী ডাণ্ডা। তাকে দেখেই ভয়ে অস্ফুষ্ট আর্তনাদ করে ঘরের ভেতরকার দেওয়ালের সঙ্গে সিঁটিয়ে গেলেন মিস হান্টার। পিস্তলের বাঁটে আমার মুঠো দৃঢ় হয়ে গেল। আর হোমস এক সুদীর্ঘ লম্ফ ত্যাগ করে তার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল।

—ওরে শয়তান তোর মেয়ে কোথায় বল? লোকটিকে বিন্দুমাত্র সমীহ না করে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল আমার বন্ধু।

মিঃ রুক্যাসল সে কথায় কান না দিয়ে গোল গোল চোখে দেখলেন সারা ঘরটাকে। তারপর তাকালেন স্কাইলাইটের দিকে। অতঃপর চোখ নামিয়ে তিনিও সমান তেজে বললেন হোমসকে প্রশ্নটা আমারই করার কথা। ওরে ব্যাটা চোর। ওরে ব্যাটা গুপ্তচর। তোদের সব কজনকেই আজ হাতে নাতে ধরে ফেলেছি। দাঁড়া, কেমন শাস্তি দিতে হয় তোদের এক্ষুনি বোঝাচ্ছি। বলেই দ্রুত ফিরে গেলেন যেদিক থেকে এসেছিলেন সেই দিকে। মিস হান্টার আতঙ্কে বললেল, সর্বনাশ। কার্লোকে আনতে গেলেন উনি।

আনুক। ভয় পাই না। আমার হাতে রিভলবার রয়েছে। সতেজে জবাব দিলাম আমি।

তার চেয়ে ভালো হয় সদর দরজাটাকে বন্ধ করে দেওয়া। বলেই হোমস ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটল এই পরিত্যক্ত অংশের প্রধান প্রবেশ পথের দিকে। আমরাও অনুসরণ করলাম তাকে। সদর দরজা অবধি পৌঁছেছি কি পৌছাইনি কুকুরের পাশব গর্জন আর মানুষের যন্ত্রনাকাতর আর্তনাদ কানে এসে বাজল আমাদের! শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল সবাইকার? ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পাশের একটি ঘরের ভেতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো জনৈক দীর্ঘদেহী

মধ্যবয়স্ক পুরুষ। অনুমান করলাম সেই পরিচারক টোলার।

মাই গড! কুকুরটাকে কেউ খুলে দিয়েছে। দুদিন কিছু খায়নি ওটা। আপনারা কারা জানি না, কিন্তু তাড়াতাড়ি—খুব তাড়াতাড়ি আসুন আমার সঙ্গে। দেরী করলে সর্বনাশের আর কিছু বাকী থাকবে না। দারুন উৎকণ্ঠার সঙ্গে হাঁকাতে হাঁকাতে বলল সে।

টোলারের পেছন পেছন আমি আর হোমস ছুটলাম ঝড়ের বেগে। বাড়ির বাইরে ঘুরতেই সেই ভয়াবহ আর বীভৎস দৃশ্যটা চোখে পড়ল কী সাংঘাতিক আর ভরংকর দৃশ্য।

মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে মিঃ রুক্যাসল ছটফট করতে করতে গোঙ্গাচ্ছেন আর সেই দুশমণ চেহারার যমদূত সদৃশ কুকুরটা তার গলা কামড়ে ধরে চাপা গর্জন করতে করতে মাঝে মাঝে ঝাঁকানি দিচ্ছে। আর দেরী না করে কুকুরটিকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি কয়েকবার গুলি বর্ষন করলাম আমার রিভলবার থেকে। কুকুরটা মরণাহত আর্তনাদ করে ঢলে পড়ল মাটিতে ঠিক রুক্যাসলের পাশেই। তারপর মারা গেল।

মিঃ রুক্যাসলের কাছে গিয়ে তাঁকে তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করে দেখলাম, তিনি মরেন নি—জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন মাত্র। কুকুরের দাঁতগুলো বেশ গভীর হয়েই বসেছে গলায় আর ঘাড়ে। এক্ষুনি চিকিৎসার প্রয়োজন। হয়তো বাঁচলেও বাঁচতে পারেন। উপস্থিত রুমাল জড়িয়ে তার গলার উৎসারিত রক্ত বন্ধ করে তিনজনে আমরা ধরাধরি করে মিঃ রুক্যাসলের অচৈতন্য আর ভারী দেহটাকে বয়ে নিয়ে এলাম ড্রয়িংরুমে। টোলারকে হোমস পাঠিয়ে দিলেন মিসেস রুক্যাসলকে এই শোচনীয় দুসংবাদ দিতে।

সবাই যখন আমরা মিঃ রুক্যাসলকে নিয়ে ব্যস্ত, ঠিক তখনই ড্রইংরুমে এলেন এক দীর্ঘদেহী আর কঠিন স্বভাবের মেয়ে। মিসেস টোলার।

হোমস বিস্ময়ে বলে।

হ্যাঁ আমি। বাড়িতে ঢুকতেই মিষ্টার রুক্যাসল আমাকে দরজা

খুলে দিলেন। আমি মুক্তি পেলাম।

যদি আগে সব খুলে বলতেন তাহলে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হত না আপনাকে। হ্যাঁ; মনে হচ্ছে আপনি যেন অনেক কিছুই জানেন। তাই না মিসেস টোলার ?

হোমস বলে।

হ্যাঁ আমি যা জানি তা খুলে বলতে চাই। সবটা না বলা অবধি মুক্তি পাবনা।

মিসেস টোলার বলেন।

তাহলে অনুরোধ করছি যে আপনি সব বলুন। কেননা ঐ রহস্যের সব আবরণ আমি উন্মোচিত করতে পারিনি, তার জন্যে আমার লজ্জা নেই।

হোমসের অকপট স্বীকারোক্তি আমার ভালো লাগে। সত্য ভাষণে তার কোন দুঃখ নেই।

—বলবো, সব বলবো। যদি আমাকে পুলিশের সামনে দাঁড়াতে হয় তাহলেও বলবো। সব জানাতেই তো এসেছি মিষ্টার হোমস।

মিসেস টোলার যেন স্মৃতির পাতাগুলো দ্রুত উল্টে গেলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন—মিস হাণ্টার বুঝতে পেরেছিলেন কিনা জানিনা, তবে আমিই ছিলাম ঐ বাড়িতে একমাত্র নির্বাসিতা। যেমন ছিলেন মিস অ্যালিস রুক্যাসল।

তার বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর ভাগ্যের কষাঘাত নেমে আসে তার মাথায়। তাকে ধীরে ধীরে উপেক্ষা করা হল। সংসারের কোন ব্যাপারে তাকে আর ডাকা হল না। অবহেলা আর উপেক্ষা সয়ে সয়ে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল অ্যালিস।

এই সময় এক বন্ধুর বাড়ির পার্টিতে মিষ্টার ফার্গুসনের সঙ্গে তার আলাপ হল। আমি যতটা জানি, ঐ জমিজমা আর বাড়ি ছিল অ্যালিসের মার নামে। তিনি মারা গেলে তাঁর উইল অনুসারে

সব কিছুর মালিকানা পেল অ্যালিস। কিন্তু অ্যালিস মেয়েটি হল দারুন লাজুক আর শান্ত স্বভাবের। সে বিনা দ্বিধায় সব কিছু তুলে দিল তার বাবার হাতে। কোনদিন নিজের দাবী নিয়ে বিবাদ করেনি।

এদিকে মিষ্টার রুক্যাসল বেশ আনন্দে মেয়ের সম্পত্তি ভোগ করছিলেন। পাশে ছিল ঐ বৌটি, তিনিও পরম সুখে দিন কাটাচ্ছেন। আমরা সব জানতাম, বুঝতাম তবু প্রতিবাদ করবার মত সাহস আমাদের ছিল না।

কিন্তু রঙ্গমঞ্চে মিষ্টার ফগু‍র্সনের হঠাৎ উপস্থিতি সব কিছু গোলমাল করে দিল। মিস্টার রুক্যাসল বুঝতে পারলেন যে তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে। অ্যালিস যদি তার স্বামীর সাহায্যে আইনের আশ্রয় নেয় তাহলে সব সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে।

বৌয়ের সঙ্গে যুক্তি করে তিনি স্থির করলেন যে অ্যালিসকে ফিরিয়ে আনতে হবে মিষ্টার ফগু‍র্সনের কাছ থেকে। প্রথমে অনুরোধ তারপরে আদেশ, অবশেষে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন চলত অসহায় একটি মেয়ের ওপর। অ্যালিসকে সই দিতে হবে যে তার সমস্ত সম্পত্তি সে স্বেচ্ছায় বাবাকে দান করবে।

অ্যালিস কোন মতেই রাজী হল না। তাকে অমানুষিক কষ্ট দেওয়া হল। ক'মাস বাদে মেয়েটার মাথায় গোলমাল দেখা দিল। শুরু হল তার জীবন সংশয়।

অনেক চেষ্টা করে সে বেঁচে গেল।

কিন্তু যৌবনের প্রথম প্রহরেই তাকে হারাতে হল রূপলাবণ্য। মাথায় চুল নেই, কোটরাগত দুটি শীর্ণ চোখ, দেহের রঙ বিবর্ণ। এ যেন অ্যালিস না তার কঙ্কাল। তবুও মিষ্টার ফগু‍র্সনের প্রেমে এতটুকু ফাটল দেখা দিল না। তিনি ঠিক আগের মতই অ্যালিস ভালোবাসতেন। প্রতিদিন তার কাছে আসতেন, তাকে দিতেন রজা সান্নিধ্য।

—এবার সব বুঝতে পারছি, হোমস বলে, মিষ্টার ফগুর্সনকে কোন রকমে তাড়াতে না পেরে মিষ্টার রুক্যাসল নিজের মেয়েকেই নির্বাসনে পাঠালেন। তাই তো?

—আপনি ঠিকই বলেছেন।

—আর ঐ প্রেমিক পুরুষটিকে দূরে সরিয়ে রাখতে চতুর রুক্যাসল লণ্ডন থেকে আপনাকে নিয়ে এলেন। আপনার দুর্ভাগ্য যে অ্যালিসের সঙ্গে আপনার অদ্ভুত সাদৃশ্য। তাই শুরু হল নকল অ্যালিসের দিন কাটানোর পালা। ঠিক বলছি তো?

—বলে যান।

—তবুও একরোখা ফগুর্সনকে বাধা দেওয়া গেল না। একদিন তিনি হঠাৎ আপনার মুখোমুখি হলেন। দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হল। আপনারা দুজনেই মিস অ্যালিসের জন্যে যথাসাধ্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

—ঠিক বলেছেন। মিস্টার ফগুর্সনের তুলনা হয় না।

—তারপর দুজনে যুক্তি করলেন। যখন এ বাড়িটা খালি হবে, সেই বিরলতম সুযোগে আপনি ফগুর্সনের পাশে এসে দাঁড়াবেন। তাঁকে সাহায্য করবেন যাতে সে অ্যালিসকে নিয়ে পালাতে পারে।

মিসেস টোলার মাথা নাড়লেন।

—আপনার কাজ হবে দুটি। প্রথমে আপনি একটি মই এনে দেবেন। তারপর আপনার স্বামীকে সামলে রাখবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি মিস্টার টোলারের খাবার জলে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সে কিছুক্ষণের জন্য অচেতন হবে।

মিসেস টোলার মাথা নীচু করে স্বীকার করলেন।

এই সময় এক গ্রাম্য ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন মিসেস তার সল। পেছনে টোলার।

অ্যালিস্টার রুক্যাসলকে দীর্ঘদিন অসুস্থতা ভোগ করতে হল। পতি

অনুরাগী স্ত্রীর যত্ন সেবার মাধ্যমে তিনি বেঁচে গেলেন।

মিস্টার ফর্গুসনের সঙ্গে মিস রুক্যাসলের বিয়েটা হয়েই গেল। সাউদাম্পটনের গীর্জাতে ওরা জীবন বাঁধনে আবদ্ধ হল। ভদ্রলোক ময়িশাস দ্বীপে উঁচু পদের চাকরী পেলেন। নববিবাহিতা বধূকে নিয়ে চলে গেলেন দূর দ্বীপে।

কপার বীচেস রহস্য এমন ভাবেই উন্মোচিত হল।

তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে এরপর থেকে মিস ভায়োলেট হান্টারকে যেন ভুলেই গেল হোমস। তাঁর সঙ্গে কোন যোগাযোগ রইল না।

আমি শুনেছিলাম যে ঐ ভদ্রমহিলা ওয়েলসের একটি প্রাইভেট স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হয়ে ভালোই আছে।

যাক তাকে আর গভর্নেস হতে হবে না। আর কোন কপার বীচেস রহস্য তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে না।

## ॥ নয় ॥

এবারে আমি আমার বন্ধু হোমসের সম্পূর্ণ নতুন একটি কেসের কথা শোনাবার জন্যে কলম ধরেছি।

—প্রিয় সখা, ওয়াটসন

শার্লক হোমস বলেছিল,

—দেখো মানুষের মন যা কিছু ভাবতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী সজীব হল বাস্তব ঘটনা! তার কাছে কল্পনা হার মানে বার বার।

ধবো আমরা দুজনে যদি হাতে হাত দিয়ে এই মহানগরীর ওপর

দিয়ে উড়তে পারি, তবে নীচের দিকের ছাদগুলোর তলাতে যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে তাদের দেখতে পাব, অদ্ভুত যত ব্যাপার, যার মধ্যে আছে রহস্যের ছোঁয়া, আছে বীভৎস ষড়যন্ত্র আর কুটিল পরিকল্পনা, ঘটনার পরিণতি, যা চিরদিন ধরে বয়ে চলেছে, যার থেকে অনেক অঘটন ঘটছে প্রতিটি মুহূর্তে, তাহলে এতদিনের পড়া গল্প উপন্যাসকে নেহাৎ বানানো মনে হতে পারে। মনে হবে ওসব গল্প পড়ে কোন লাভ নেই!

হোমসের রসিক মনের পরিচয় পেলাম তার উক্তিতে।

আমরা বসে আছি বেকার স্ট্রীটের অফিস ঘরে। ফায়ারপ্লেসের কাছেই রয়েছে আমাদের দেহ।

আমি তবুও বাধা দেবার চেষ্টা করে বলি—দেখো হোমস, তোমার সব কথা কিন্তু মানতে পারছি না। খবরের কাগজগুলো দেখছ না আজকাল, নেহাত সাদাসিধে মামলার ফল বেরোচ্ছে, পুলিশ রিপোর্টে বাস্তবতার ছোঁয়া আছে, তবে কৌতুহলী হবার মত কিছু নেই।

—বাস্তবতা আনতে হলে কিছু বদলাতে হয়!

হোমস বিজ্ঞের মত বলে।

সে আবার বলে চলে—

পুলিশের রিপোর্টে ওটাই নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের কথা দিয়ে বাস্তবতাকে ওরা সযত্নে এড়িয়ে চলে, প্রাধান্য দেয় ছোটখাটো ব্যাপারগুলোকে। কিন্তু দর্শকের কাছে ঐসব ছোট ব্যাপারগুলোর কোন দাম নেই। তারা জানতে চায় মূল ঘটনা।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তুমি এ কথা ভাবছ কেন আমি বুঝতে পেরেছি। তিনটি মহাদেশের যারাই কোন সমস্যাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তারাই তোমার কাছে ছুটে আসে, বেসরকারী ভাবে তুমি তাদের উপদেশও দাও। তাই তোমার মনে হয়েছে যে যা কিছু ঘটেছে তার সবটাই অস্বাভাবিক। কিন্তু এটা পড়লে বুঝতে পারবে যে সব তাই নয়।

এই বলে আমি তাকে খবরের কাগজটা তুলে দিলাম।

—এসো তোমার বক্তব্যটা পরীক্ষা করে দেখি। প্রথমেই শিরোনাম দেখছ, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অত্যাচার। তার পরের আধ কলম ভর্তি খবব, আমি জানি কি লেখা আছে ওখানে। অন্য কোন মেয়ের প্রতি ভদ্রলোকের অকারন অনুরাগ, হয়ত বা একটু আধটু চরিত্রস্খালন, বেপরোয়া আমোদ প্রমোদ, মদের নেশাতে মাতাল হওয়া, স্ত্রীকে মারা, কালসিটের কালো দাগ, রাত জাগা, সমবেদনা জানাতে কোন সহৃদয়া রমণী, এই আর কি। সবচেয়ে বাজে লোকও এর থেকে খারাপ কিছু ভাবতে পারবে না।

তাহলেই স্বীকার করবে যে ঘটনা তোমার মন্তব্যকে সাহায্য করছে না।

লম্বা বক্তৃতা শেষ করে হোমসকে জব্দ করেছি বলে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি।

তখনই সে কাগজটা নিয়ে বলে, বন্ধু ওয়াটসন, তোমার বিশ্লেষণ ঠিক হলে এই পৃথিবীতে আমি হতাম সবচেয়ে সুখী মানুষ। কিন্তু ভাগ্য তোমার বিপরীত, কথাও মেলেনি।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। হোমস জানল কি করে? এখনো তার কাগজ পড়া শেষ হয় নি।

—এটা হল ডানগস মামলা। আমি ঐ মামলায় সঙ্গে জড়িত ছিলাম। এখানে স্বামী চা ছাড়া কোন কিছুতে নেশা করে না, স্ত্রীকে বাদ দিয়ে আর কোন রমণীর প্রতি তার কণামাত্র আসক্তি নেই, স্বামী তার স্ত্রীকে কোন দিন মারে নি, খুঁজলেও কালসিটের কোন দাগ তুমি পাবে না, মাতাল হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। গল্প লেখকদের কোন ফর্মুলাই মিলছে না। এমন কি সহানুভূতি দেখাতে আসরে হাজির নেই কোন রমণী। এক টিপ নস্যি নিয়ে আবার ভাবতে বসো। বুঝলে ওয়াটসন, এবার তোমার হার হয়েছে।

ভদ্রকিন্তু বিচ্ছেদের কারণটা....

আসতে .বিত পরাজয়ে বিমূঢ় আমি কোনরকমে বলি।

—ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। এর আগে কোন দম্পত্তির মধ্যে এই নিয়ে বিরোধ হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

—কি রকম?

—ঐ ভদ্রলোক প্রতিদিন খাওয়ার শেষে তার নকল দাঁতের পাটি খুলে স্ত্রীকে ছুঁড়ে মারে।

আমাকে বিস্মিত হবার সময় না দিয়ে হোমস নস্যি দানীটা মেলে ধরল। সোনার তৈরী পুরোনো কৌটোর মাঝখানে বসানো মস্ত এক নীলকান্তমণি। মণির চাকচিক্য হোমসের সাধারণ জীবনের পক্ষে বেমানান।

—আহা কোথায় পেলে?

উৎসাহের আতিশয্যে আমি বলি।

—ওহো তোমার সঙ্গে এক মাস দেখা হয় নি, তাই বলতে ভুলেছিলাম, ঐটি এসেছে বোহেমিয়ার রাজার কাছ থেকে। আইরিন অ্যাডলারের কাছ থেকে কাগজগুলো উদ্ধার করবার স্বীকৃতিতে ঐ স্মারকটা পাঠিয়েছেন।

—আর আঙটিটা?

—ওটা দিয়েছে ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবার। কিন্তু কেন দিয়েছে সেটা তোমাকেও বলতে পারছি না বলে আমি আন্তরিক দুঃখিত ওয়াটসন। সময় হলে জানাবো।

—তোমার হাতে আর কোন কেস আছে?

—অবশ্যই। দশ বারোটা হবে। তবে কোনটাই তেমন ভালো নয়। কেসগুলোর গুরুত্ব আছে, আকর্ষন নেই। সত্যি বলতে কি, গুরুত্ব না থাকলেই তীব্র বিশ্লেষণের আনন্দ বাড়ে। বড় ধরণের অপরাধ সাধারণভাবে সরল। মার্সেলিজ থেকে পাঠানো একটা জটিল ঘটনা বাদ দিলে অন্যগুলোতে বিশেষ কিছু নেই। তবে আমার

অনুমান মিথ্যে না হলে একজন ক্লায়েন্ট এদিকেই আসছে। আমরা ভালো কোন কেস পেতে চলেছি। ঐ দেখো— শিরোনাম

চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার পাশে দাঁড়াল হোমস। লণ্ডনের বিবর্ণ পথ, যেখানে শুধু ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। নতুনত্ব নেই যানবাহনে অথবা পথিকে।

আমি হোমসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াই, তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখি যে উল্টোদিকের ফুটপাত দিয়ে হাঁটছে এক স্থূলাকৃতি মহিলা, গলাতে ভারী পশুলোমের স্কার্ফ জড়ানো, মাথায় যে চওড়া ধার টুপীটা সেটাকে ডেভনশায়ারের রাজকুমারীর কায়দাতে বাঁকানো হয়েছে। ওখান দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কোঁকড়ানো লাল পালক। প্রকাণ্ড টুপিটার আড়াল থেকে একটু ভয়ে ভয়ে মেয়েটি তাকাচ্ছে। শরীরটা তার সামনে পিছনে দুলছে আর আঙুলগুলো গ্লাভসের বোতাম নিয়ে খেলছে। হঠাৎ সাঁতার দিতে দিতে তীরে উঠলে যেমন হয় সেইভাবে রাস্তা পার হল মেয়েটি, আমরা ঘণ্টার তীব্র ধ্বনি শুনতে পেলাম।

—ঐ ব্যাপারগুলো আমার ভীষণ চেনা, সিগারেট ফেলে দিয়ে হোমস বলে, ঐ মেয়েটির আচরণ বলে দিয়েছে যে সে কি চাইছে। ফুটপাতে তার বিক্ষিপ্ত হাঁটা মানে মনের মধ্যে ঝড় উঠেছে। মন স্থির করতে পারছে না সে। এর থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি। মেয়েটি বোধহয় প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। জানো তো, পুরুষ আঘাত দিলে মেয়েরা অসহায় হয়ে পড়ে। মেয়েটির রাগের চেয়ে অনেক বেশী তার দুঃখ বা চিন্তা। যাই হোক, সব সন্দেহ মেটাতে সে নিজেই আসছে।

কথা বলতে বলতেই দরজা গেল খুলে। বাড়ীর ছেলেটি জানাল যে মিসেস মেরীয়া মাদারল্যাণ্ড আমাদের সাক্ষাৎপ্রার্থীনী। কালো পোষাক পরা ঐ ছেলেটির পেছনে মিসেসের সুদেহী শরীর, ছোট্ট পাইলট বোটের পেছনে যেন প্রকাণ্ড মালবাহী জাহাজ।

ভদ্রতার জন্যে হোমসের খ্যাতি আছে, সে মহিলাকে ভেতরে আসতে বলল। তারপর দরজা দিল বন্ধ করে। ভদ্রমহিলাকে অভিবাদন করে চেয়ারে বসবার জন্য অনুরোধ জানাল।

উদাসীনতার আচরণে চাপা তীক্ষ্ণ চোখে হোমস মহিলাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

—আপনি তো চোখে কম দেখেন? এত টাইপ করেন কেন?

—প্রথম দিকে খুব অসুবিধে হত, কিন্তু এখন অভ্যেস হয়ে গেছে, টাইপের অক্ষরগুলো না দেখেই বুঝতে পারি—

ওরা দুজন যেন দীর্ঘদিনের পরিচিত, এমন সহজ ভঙ্গিমাতে কথা বলছে।

তারপর হঠাৎ ভদ্রমহিলা চমকে ওঠে। তার মুখে বিস্ময় ও ভয়ের ছোঁয়া লাগে, মিষ্টার হোমস, আপনি কি আমার কথা শুনেছেন? নাহলে এত সব জানলেন কি করে?

—কিছু মনে করবেন না, হাসতে হাসতে বলল হোমস, আমার কাজই হল সব কিছু জানা। আপনাদের চোখে যা থাকে আবছা তাকে দেখাই আমার কাজ। না' হলে আপনি পরামর্শের জন্য আমার কাছে ছুটে আসবেন কেন?

—স্যার, আমি বিশেষ বিপদে পড়ে আপনার শরনাপন্ন হয়েছি। মিসেস এমরেজ আপনার নাম বলেছে। পুলিশ যখন তাঁর হারানো স্বামীকে খুঁজে দিতে পারেনি, যখন সবাই ধরে নিয়েছিল যে ওনার স্বামী মারা গেছেন, তখন আপনি তাকে খুঁজে বের করেন। মিসেস এমরেজের মুখে ঐ ঘটনাটা শুনে অবধি আপনার প্রতি আমার বিশ্বাস বেড়ে গেছে। মিষ্টার হোমস আপনিও কি আমাকে ঐ ভাবে সাহায্য করবেন না?

মহিলার দুটি চোখে সপ্রশ্ন চাউনি। সে আবার বলে, আমার নাম মেরীরা মাদারল্যাণ্ড। আমি বছরে একশ পাউণ্ড আয় করি, তাছাড়া মাসে মাসে টাইপ বাবদ কিছু পাই। মিষ্টার হোসমার

এনজেলের খবর দিতে পারলে পুরো টাকাটাই আপনাকে দিয়ে দেব।

মিস মেরীয়ার কণ্ঠে এমন একটা উৎকণ্ঠা ঝরছিল যে আমি বুঝতে পারলাম ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্ক আছে। হৃদয়ের কোন গভীর পদের বন্ধন। না'হলে সারা বছরের উপার্জন এমন ভাবে উজাড় করে দিতে কেউ রাজী হবে কি?

—বেশ তো, এত তাড়াতাড়ির কি দরকার ছিল?

ছাদের দিকে চোখ তুলে হোমস বলে।

মিস মেরীয়া মাদারল্যাণ্ড আর একবার চমকে ওঠে।

—হ্যাঁ, আমি প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছি। আসলে ব্যাপারটা ঠিক মত না জানা অবধি আমার বিশ্রাম নেই। আমার বাবা মিষ্টার উইনডিব্যাংক, উনি ধরে নিয়েছেন যে মিষ্টার হোসমার এঞ্জেল নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। আমি মানতে চাই না ঐ কথা। আমার বাবা পুলিশে খবর দিনে চান না, উনি আপনরে পরামর্শ নেবেন না। কিছুই না করে শুধু বলছেন, এতে তো কোন ক্ষতি হয় নি আমাদের। আমি বাবার সঙ্গে জোর ঝগড়া করে বেরিয়ে এসেছি।

—আপনার বাবা? মানে? পদবী তো মিলছে না?

—না, আমি ওনাকে বাবা বলি। আসলে উনি আমার থেকে মাত্র পাঁচ বছরের বড়।

—আপনার মা আছেন?

—হ্যাঁ, মা বেঁচে আছেন এবং ভালোই আছেন। আমার বাবার নাম ছিল মিষ্টার হাডসন। উনি মারা যাবার পর আমার মা তাঁর থেকে পনেরো বছরের ছোট ঐ উইনডিবাংককে বিয়ে করেন। আমি খুব খুশী হতে পারি নি। কেন জানি না প্রথম থেকেই মিষ্টার উইনডিব্যাংককে আমার ভালো লাগত না। কেবলই মনে হত লোকটা যেন বড় বেশী চতুর। আমার বোকা মাকে বাগে পেয়ে ঠকিয়ে নেবে।

মিস মেরীয়া একটু থামল। আবার বলল— আমার বাবার ছিল কাঠের ব্যবসা। বাবার মৃত্যুর পরে ঐ ব্যবসার দায়িত্ব নিলেন ফোরম্যান মিস্টার হারডি। উনি মাকে নিয়মিত ভাবে টাকা দিয়ে যেতো। কিন্তু বিয়ের পরে মিস্টার উইনডিব্যাংক ব্যবসার ওপরে নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চাইলেন। উনি ছিলেন মদের সেলসম্যান। উনি ব্যবসাটা বেচে দিলেন। সব মিলিয়ে পাওয়া গেল চার হাজার সাতশো ডলার। আমি জানি যে বাবার সময়ে বিক্রি হলে আরও টাকা মিলত।

অনর্থক ঐ কাহিনী বলবার মধ্যে কি যে কারন আছে সেটা আমার বোধগম্য হল না! তবুও দেখলাম যে হোমস্ বেশ ধৈর্য ধরে শুনছে। হয়তো তার মধ্যে কোন উত্তেজনার গন্ধ পেয়েছে সে।

—আপনার উপার্জনটাও কি ঐ ব্যবসা থেকে?

—না স্যার, ওটা অন্য ব্যাপার। আমার অকল্যাণ্ডের কাকার কাছ থেকে নাওয়া শেয়ারের সুদ বাবদ পেয়েছি। নিউজীলাণ্ডের স্টক। শতকরা সাড়ে চার ভাগ সুদ। স্টকের দাম প্রায় আড়াই হাজার ডলার, তবে আমি শুধু সুদটা পাই।

—আপনার জীবন আমাকে ক্রমেই আগ্রহী করে তুলছে। বছরে অত টাকা আসে সুদ থেকে, তারপর আছে টাইপ থেকে উপার্জন। আপনি নিশ্চয় খুব আমোদ ফুর্তি করেন? করেন না? আমার তো মনে হয় বছরে ষাট পাউণ্ড উপার্জন করলে কোন অবিবাহিতা মহিলা ভালোভাবে চালাতে পারে।

—আমি তার থেকে কম রোজগারেও চালাতে পারি মিস্টার হোমস। কিন্তু আমি বছরে একশো পাউণ্ড করে দিই আমার সৎ বাবাকে। টাইপ থেকে যা পাই তাতেই খরচ চলে যায়। প্রতি পাতায় পাই দু পেনী করে, প্রতিদিন আমি পনেরো থেকে কুড়ি পাতা টাইপ করি।

—আপনার অবস্থাটা পরিস্কার বুঝতে পারছি মিস মেরীরা। ও হল আমার বন্ধু ওয়াটসন, ওর সামনে আপনি সবকিছু বলতে পারেন। এবার অনুগ্রহ করে জানাবেন কি যে মিস্টার হোসমার আপনার কে হন ?

মিস মাদারল্যাণ্ড লজ্জা পেলেন। সে কাঁপা হাতে জ্যাকেটের ধারটা নিয়ে নড়াচড়া করতে থাকেন।

—প্রথম দেখেছিলাম গ্যাস ফিটারদের বলড্যান্সে। বাবা যত-দিন জীবিত ছিলেন ততদিন ওরা প্রতিটি অনুষ্ঠানের টিকিট দিত। বাবার মৃত্যুর পরেও ওরা আমার জন্যে আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছিল। মিস্টার উইনডিব্যাংক চাইতেন না যে আমি কোথাও যাই। এমনকি মার সঙ্গে গেলেও উনি রেগে যেতেন। সেবার আমি যাবার জন্যে জেদ ধরলাম। আমার সৎপিতা সাবধান করে বলেছিলেন যে ঐ পার্টিতে যারা যায় তারা আমার যোগ্য নয়। তবে ভাবুন যে আমার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ওখানে আসতেন। মিস্টার উইনডিব্যাঙ্ক আরও বললেন যে আমার নাকি বলড্যান্সে যাবার মত পোষাক নেই। কিন্তু ঐ বেগুনী রঙের সুন্দর গাউনটা আমি বের করলাম। কিছুতেই আমাকে দমাতে না পেরে উনি কাজের অছিলাতে ফ্রান্স চলে গেলেন। অবশেষে ফোরম্যান মিস্টার হারডির সঙ্গে পার্টিতে গেলাম আমি। একটু থেমে, সলাজ চোখে তাকিয়ে মেরীয়া বলে, ওখানেই হোসনারকে প্রথম দেখি।
হোমস মন্তব্য করে, আপনার সৎ বাবা ফ্রান্স থেকে ফিরে খুব রাগ দেখালেন ?

—উঁহু উনি বেশ ভালো মনেই ব্যাপারটাকে মেনে নিলেন। হন লেন যে মেয়েদের আটকে রেখে লাভ, নেই, ওরা ইচ্ছে মত ঘুরুক্।
—তাহলে ওখানেই ভদ্রলোককে প্রথম দেখলেন ঠকিয়ে তাইতো ?

হোমস যেন ঐ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে চায়। এই তুচ্ছ ব্যাপারে তার আগ্রহ আমাকে অবাক করল।

—হ্যাঁ, স্যার। সে রাতেই আমাদের প্রথম দেখা। আমরা ঠিক মত বাড়ীতে পৌঁছেছি কিনা সেটা জানতে উনি পরের দিন সকালে আমাদের বাড়ীতে আসেন। আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা শুরু হল। তারপরে দু'বার আমরা বেড়াতে গেছি। ইতিমধ্যে মিস্টার উইন-ডিব্যাংক ফিরলেন। মিস্টার হোসমারের আসাও বন্ধ হল।

—কেন ?

—বাবা চাইতেন না যে কোন যুবক আমার কাছে আসে। পারলে উনি সব অতিথির আসাই বন্ধ করতেন। বাবার মত ছিল যে মেয়েরা পরিবারের মধ্যে মেলামেশা করবে, তার বাইরে নয়।

—মিস্টার হোসমার কি আপনার সঙ্গে আর দেখা করেন নি ?

—এক সপ্তাহ বাদে বাবার ফ্রান্সে যাবার কথা ছিল। হোসমার চিঠি দিয়ে জানাল যে আমার সঙ্গে ঐ সময়ে দেখা করবে। আমরা নিয়মিত চিঠি লিখতাম। হোসমার একদিন অন্তর জবাব দিত। আমি সকালের ডাক নিয়ে নিতাম। বাড়ীর কেউ জানতে পারত না।

—তখন কি আপনাদের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল ?

—হ্যাঁ মিস্টার হোমস। আমি জানতাম যে হোসমার লীডেন-হল স্ট্রীটের একটা অফিসে ক্যাশিয়ার।

—কোন্ অফিস ?

—সেটাই তো আমি বলতে পারবো না।

—উনি থাকতেন কোথায় ?

—অফিসের পাশেই।

—ঠিকানাটা বলতে পারবেন ?

—জানি না। লীডেনহল স্ট্রীট ছাড়া কিছু জানি না।

—চিঠিতে কি লিখতেন ?

—ও আমাকে ওর ঠিকানা দিতে বারণ করেছিল। ও বলত যে অফিসের লোকেরা মেয়েলী হাতের লেখা দেখে হাসবে। আমি লিখতাম লীডেনহল পোষ্ট অফিস। ডাক চিঠি নিয়ে যেত। আমি টাইপ করবো বলেছিলাম, তাতেও ও রাজী হয় নি। ও বলেছিল যে আমার হাতের লেখা না দেখলে ভীষণ কষ্ট পাবে ও। মনে হবে যেন টাইপ মেশিনটা দু'জনের মাঝখানে বাধার প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মিস্টার হোমস, এর থেকেই আপনি বুঝতে পারবেন যে ও আমাকে কি ভীষণ ভালোবাসতো।

বলতে বলতে মেরীয়ার কণ্ঠস্বর আবেগরুদ্ধ হয়ে গেল।

—ব্যাপারটা খুবই আকর্ষনীয়। এইসব অল্প তুচ্ছ ব্যাপারগুলোর মধ্যেই রহস্য লুকিয়ে থাকে। আর কোন ঘটনা আপনার মনে পড়ে অথবা আপনার প্রতি হোসমারের প্রবল প্রেমের অন্য কোন নিদর্শন?

একটু ভেবে মেরীয়া বলে—দেখুন মিস্টার হোমস, ও ছিল লাজুক। দিনের বেলা বেরোত না, পাছে কেউ দেখে ফেলে। ও আসত রাতের অন্ধকারে। একা একা থাকত, কথা বলত খুব শান্ত স্বরে। ও বলত যে ছোটবেলাতে গলার অসুখ হয়েছিল, তাই জোরে বলতে পারে না। সব সময় নিখুঁত সাজত, ফিটফাট পোষাক পরত। তবে আমার মত ওর চোখও ছিল ক্ষীণ, তাই রঙ্গীন চশমা ব্যবহার করত।

—বাঃ, এবার বলুন আপনার বাবা ফ্রান্স থেকে আসবার পরে কি ঘটল?

—মিস্টার হোসমার আমাকে বলল যে বাবা ফিরে আসবার আগেই আমাদের বিয়েটা হয়ে যাবে। ও আর দেরী করতে চাইছেনা। আমাকে বাইবেল ছুঁইয়ে শপথ করাল সে যাই ঘটুক কেন আমাদের প্রেম অভেদ্য থাকবে।

আমি ব্যাপারটা মাকে জানাতে মা বলেছিল যে ওটাও হল গভীর প্রেমের প্রতীক। মা ওকে যেন পছন্দ করত, বলতে গেলে

আমার চেয়ে বেশী। ওরা দুজনে মিলে বিয়ের প্রস্তাব তুলল। আমি রাজী হলাম না। বাবা ফেরা অবধি অপেক্ষা করতে চাই-লাম। ওরা বলল যে বাবার কথা ভাবতে হবে না। বাবা এলেই সব জানতে পারবে। মা বলেছিল যে বাবাকে সে মত করাবে।

তবুও লুকিয়ে বিয়ে করতে মন চাইল না। অবশ্য মিস্টার উইনডিব্যাংক আমার চেয়ে বছর কয়েকের বড়, তবু সম্পর্কে বাবা তো। কিন্তু আমি বর্কোতে বাবার অফিসে চিঠি লিখলাম। কেউ জানল না। বিয়ের দিন সকালে চিঠিটা ফেরত এল।

—ফেরত এল?

হ্যাঁ বাবা চিঠি পেলেন না। উনি তখন ইংল্যাণ্ডের দিকে আসছেন।

ভাগ্যটা মন্দ দেখছি।

—চার্চে আমাদের বিয়ে হবার ঠিক হয়েছে। কিংস ক্রসের কাছে সেন্ট জেভিয়ার্স চার্চে খুব গোপনে বিয়ে হবে। তারপর আমরা প্রাতরাশ খাব সেন্ট প্যান ক্রিয়াস হোটেলে। সেটা ছিল শুক্রবার। আমি আর মা চড়েছি হ্যানসম গাড়ীতে, ও উঠল ফোর হুইলারে। আমরা আগে আগে চার্চে পৌঁছে গেলাম। কিছুক্ষণ বাদে ফোর হুইলার গাড়ীটা এল। কিন্তু কেউ নেমে এল না। ড্রাইভার জানাল যে হোসমার গাড়ীতে উঠেছে, তারপর সে আর জানে না।

এ সব হল গত শুক্রবারের ঘটনা। এর মধ্যে তিনটি দিন কেটে গেল কিন্তু এখনো কোন খবর পেলাম না তার।

—আপনার সঙ্গে খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়েছে বলতে পারেন?

—না স্যার, আমি এখনো বিশ্বাস করি যে মিষ্টার এনজেলের মত মানুষ কোনদিন আমাকে ছেড়ে যাবে না। এমন কোন বিপদের সামনে সে পড়েছে যে কথা রাখতে পারে নি, তবে সে অবশ্যই ফিরবে। আমি আশায় আশায় বসে আছি।

একটু চুপ করে সামলে নিয়ে মেরীয়া বলে—বিয়ের দিন সকালে ও

বার বার বলেছিল যে যদি অভাবনীয় কোন কারণে আমাদের বিয়ে না হয় তাহলেও আমি যেন শমনের কথা ভুলে না যাই। বিয়ের দিন সকালে এমন নিরাশার কথা আমাকে ব্যথিত করেছিল। পরে দেখলাম যে ও ঠিকই বলেছে। হয়তো অজানা ঐ বিপদটা সে বঝুতে পেরেছিল।

—ঠিকই বলেছেন। হোসমার জানতেন যে তিনি কোন বিপদে পড়বেন।

—কিন্তু বিপদটা কি না জানা অবধি আমার শান্তি নেই।

—আপনার কোন ধারণা আছে ?

—না।

—আর একটা প্রশ্ন। আপনার মা ব্যাপারটা কি ভাবে নিলেন ?

—উনি রেগে গেলেন। বললেন আমি যেন এই ব্যাপারে আর কোনদিন কোন কথা না বলি।

—বাবা কি বললেন ? ওঁকে সব বলেছিলেন ?

হ্যাঁ। আমার মতো ওঁরও ধারণা কিছু একটা ঘটেছে এবং হোসমার আবার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। উনি বলেছিলেন, আমাকে গির্জার দরজায় এনে ছেড়ে যাওয়ায় লোকটার কি স্বার্থ থাকতে পারে ? যদি ও আমার টাকা ধার করতো কিংবা বিয়ের পরে আমার ষ্টক ওর নামে লিখে দিতাম, তবু একটা যুক্তি থাকতো কিন্তু হোসমার টাকা পয়সার ব্যাপারে খুব স্বাধীন, কখনও আমার কাছ থেকে এক শিলিং ও নেয়নি। কিন্তু কি ঘটে থাকতে পারে ? কেন ও চিঠি দিচ্ছে না ? ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হয়ে যাবো মনে হচ্ছে। রাতে আমি একটুও ঘুমুতে পারিনি।

ছোট্ট একটা রুমাল বার করে মুখে চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মিস মাদারল্যাণ্ড।

—কেসটা সম্বন্ধে আমি খোঁজ খবর নেবো এবং নিঃসন্দেহে নির্দ্দিষ্ট কোন পরিণতিতে পৌঁছোবো। ব্যাপারটা আপনি এখন আমার

ওপরই ছেড়ে দিন। এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। মিস্টার হোসমার এনজেল যেমন আপনার জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তেমনি তিনি আপনার স্মৃতি থেকেও যেন মুছে যান, সে জন্যে চেষ্টা করুন।

—আপনার ধারণা, ওঁর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। আমি তাই ভয় করছি। তাহলে ওঁর কি হয়েছে?

—সে প্রশ্নটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি ওঁর চেহারার একটা সঠিক বর্ণনা চাই এবং ওঁর চিঠিগুলোর মধ্যে যেগুলো আপনি দিতে পারবেন।

—আমি গত শনিবারের ক্রোনিকল্ কাগজে ওঁর সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। স্লিপটা রাখুন। আর এই নিন, ওঁর চারটে চিঠি।

—'ধন্যবাদ। আপনার ঠিকানা?

—১১, লায়নস প্লেস্ ক্যামবার ওয়েল।

—মিষ্টার এনজেলের ঠিকানা তো আপনি জানেন না, বুঝতে পারছি। বাবার অফিসের ঠিকানা বলুন।

—ওয়েস্টহাউস অ্যাণ্ড মারব্যাংক, ফেনচার্চ ষ্টিটের ক্ল্যারেট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান, খুব বড় কোম্পানি।

—ধন্যবাদ। আপনি সব কিছু স্পষ্টভাবে বলেছেন। কাগজপত্র রেখে যান। আমার উপদেশটাও মনে রাখবেন। পুরো ঘটনাটা সীলবন্ধ বইয়ের মত হয়ে থাকুক, এতে যেন আপনার জীবনের ওপরে কোন প্রভাব না পড়ে—

—মিষ্টার হোমস, আপনি খুব দয়ালু, কিন্তু আমি তা পারি না। হোসমারকে এখন ভুলতে পারবো না। ও যখনই ফিরে আসুক, আমি ওর জন্যে অপেক্ষা করবো।

হাস্যকর টুপি এবং গোলগাল মুখ সত্ত্বেও ওর এই সরল বিশ্বাসে এমন কিছু ছিল আমরা যার সম্মান না দিয়ে পারিনি। টেবিলে

কাগজপত্রের ছোট্ট বাণ্ডিলটা রেখে ও চলে গেলো। কথা রইলো, আমরা খবর দিলে ও আবার আসবে।

## ॥ দশ ॥

আঙুলের ডগাগুলো জুড়ে কয়েক মিনিট নিঃশব্দে বসে থাকে শার্লক হোমস, পা দুটো সামনে ছড়ানো, চোখের দৃষ্টি ছাদের দিকে। তারপর চিন্তাভাবনার সময় যে পুরানো, তেলতেলে ও মাটির তৈরী পাইপটা ওর পরামর্শদাতার কাজ করে সেটা ধরিয়ে ও চেয়ারে পিঠ এলিয়ে বসে পুরু নীলমেঘের মত ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে উঠতে থাকে। ওর মুখে অপরিসীম শান্তি।

—খুবই ইন্টারেস্টিং ওই মেয়েটি। ওর ছোট্ট সমস্যার তুলনায় ও নিজে বেশী ইন্টারেস্টিং। সমস্যাটা কিছু নয়। আমার পুরোনো কেসগুলোর সূচী দেখলে সাতাত্তরে অ্যাণ্ডওভারে এবং গত বছরের হেগে একই ধরণের দুটো কেস……আইডিয়াটা পুরোনো, তবে দুটো একটা খুঁটিনাটি ব্যাপার আমার কাছে নতুন। মেয়েটির কাছ থেকে কিন্তু শেখার অনেক আছে।

—মনে হচ্ছে তুমি এর মধ্যে অনেক কিছু দেখছো, যা আমার কাছে অদৃশ্য।

—অদৃশ্য নয়, ওয়াটসন, তুমি লক্ষ্য করোনি। তোমার চোখে পড়ে না। কোথায় তাকাতে হবে, তুমি জানোনা এবং যা গুরুত্বপূর্ণ তা তোমার চোখে পড়ে না। জামার হাতার কি গুরুত্ব আছে, বুড়ো আঙুলের নখ দেখে কি বোঝা যায়, বুটের ভেতরে কতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঝুলে থাকে, তোমাকে আমি কোনদিন বোঝাতে পারলাম না। মেয়েটির চেহারা ও পোষাকে কি দেখলে বলোতো?

—স্লেট রং চওড়া ধার খড়ের টুপিতে লাল পালক গোঁজা।

কালো জ্যাকেটে কালো পুঁথি এবং পোষাকের ধারে কালো জেট গয়না বসানো। পোষাকের রঙ বাদামী কফির চেয়ে ঘন, ঘাড়ে ও হাতায় বেগুনী দাগ। গ্লাভসের রং খয়েরী, ডানহাতের তর্জনীর কাছে ছেঁড়া, বুটজোড়া দেখতে পারি নি। সোনার গোল ছোট ছোট ইয়ারীং। দেখলে মনে হয়, অবস্থা ভালোই, সস্তা, স্বচ্ছন্দ ও সচ্ছল জীবন—

আস্তে হাততালি দিয়ে হেসে উঠল শার্লক হোমস, ওয়াটসন, সত্যি তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে। অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুই তোমার চোখে পড়েনি, তোমার রং দেখার চোখ আছে এবং আমার পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি তুমি বুঝেছো। মাই বয়, আবছা দেখে সাধারণ একটা ধারণা করার পর জোর দিও না, খুঁটিনাটির ওপরে চাপ দাও। প্রথমেই আমি নজর দিই, মেয়েদের জামার হাতার ওপরে। পুরুষদের ট্রাউজারের হাঁটুর কাছটা আগে দেখতে হয়। এই মেয়েটির জামার স্লীভে কালি যার অবশিষ্ট সচরাচর থেকেই যায়। মনিবন্ধের ওপরে ডবল লাইনটা, যেখানে টাইপিষ্টের হাত টেবিলে চাপ দেয়, ওটা সুন্দর ও পরিস্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে। হাতে চালানো সেলাই মেশিনে ঠিক ওই রকম দাগ পড়ে, কিন্তু বাঁহাতে এবং বুড়ো আঙুল থেকে দূরের দিকে। এক্ষেত্রে দাগটা চওড়া অংশেই দেখা যাচ্ছে। মুখের দিকে তাকালে নাকের চাপানো চশমার দাগ দেখা যাচ্ছে। তাই আমি বলেছিলাম, ও টাইপ করে ও চোখে কম দেখে, শুনে ও অবাক হল মনে হয়।

—আমিও অবাক হয়েছি।

—কিন্তু, এটাতো খুবই স্পষ্ট। তারপর ঝুঁকে নীচের দিকে চেয়ে অবাক করে দেখলাম, যদিও দুপায়ের বুট পরস্পরের মতোই, আসলে ভিন্ন জোড়ার দুপাটি জুতো, একটার ডগার কাছে একটু কাজ করা, অন্যটা প্লেন। একটার পাঁচটা বোতামের মধ্যে নীচের দুটো লাগানো, অন্যটার প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম। এখন নিখুঁত পোষাকের কোন তরুণী যদি বাড়ী থেকে বেরোবার সময় দুটি ভিন্ন পাটির দুটি জুতো

পরে আসে, তাও অর্ধেক বোতাম লাগায়, সহজেই বোঝা যায়, সে তাড়াতাড়ি করে চলে এসেছে।

—আর কি বুঝলে ?

—আমি খেয়াল করলাম যে ঘর থেকে আসার সময় জামা-কাপড় সব-পরার পরেও একটা চিঠি লিখেছে, তুমি খেয়াল করেছো ? ওর ডান হাতের গ্লাভস তর্জনীর কাছে ছেঁড়া, কিন্তু গ্লাভস ও আঙুল দুটোতেই বেগুনী কালির দাগ, তুমি লক্ষ্য করোনি। তাড়াতাড়ি লিখতে গিয়ে কলমটা ও কালিতে বেশী ডুবিয়ে ফেলেছে, আজ সকালেই ব্যাপারটা হয়েছে নইলে আঙুলে কালির স্পষ্ট দাগ থাকতো না। খুবই মজার ব্যাপার যদিও নেহাৎ প্রাথমিক। এখন কাজের কথায় আসা যায়। ওয়াটসন, বিজ্ঞাপনে মিস্টার হোসমার এনজেলের চেহারায় বর্ণনা পড়ে শোনাও।

আমি ছাপা স্লিপটা আলোয় ধরি।

নিরুদ্দেশ—১৪ তারিখের সকালে হোসমার এনজেল নামের ভদ্রলোক, ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা, শক্ত সমর্থ চেহারা, রং ফ্যাকাশে, কালো চুল, মাঝখানে সামান্য টাক কালো লম্বা জুলফি, গোঁফ ও রঙীন কাঁচের চশমা, গলার স্বরে সামান্য দোষ আছে। শেষ যখন দেখা যায়, তখন পরনে ছিল কালো ফ্রককোট, সামনের দিকটা সিল্কের কালো ওয়েস্টকোট, সোনার অ্যালবার্ট চেন, ধূসর রঙের—হ্যাভিরস টুইড ট্রাউজার, ইল্যাস্টিক লাগানো বুটের ওপরে বাদামী রঙের সোয়েটার। লীডেনহল স্ট্রিটের কোন অফিসে কাজ করে। কেউ ধরে দিতে পারলে ইত্যাদি ইত্যাদি। থাক চিঠি গুলো খুবই সাধারণ, মিস্টার এনজেল সম্বন্ধে কোন ক্লু নেই, শুধু উনি একবার ব্যালজাক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, অবশ্য একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নিশ্চয়ই তোমার চোখে পড়েছে।

—চিঠিগুলো টাইপ করা।

—শুধু তাই নয়, সইটাও টাইপ করা। নীচে নিখুঁতভাবে টাইপ

করা হোসমার এনজেল কথাগুলো দেখো। তারিখ আছে, কিন্তু ঠিকানা কই, শুধু লীডেনহল স্ট্রীট, যেটা খুব অস্পষ্ট। সইয়ের ব্যাপারটা ইঙ্গিতবহ, সত্যি কথা বলতে কি, এর থেকেই সব ব্যাপারটা বোঝা যায়।

—কি বোঝা যায়?

—এই কেসে এটার গুরুত্ব বুঝলে না?

—যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মামলা হয়, অস্বীকার করবে, বলবে, এটা ওর সই নয়—

—না, সেটা আসল পয়েন্ট নয়। যাই হোক আমি দুটো চিঠি লিখবো। তাহলেই ব্যাপারটা মিটে যাবে। প্রথম চিঠিটা লিখছি শহরের একটা ফার্মে। দ্বিতীয় চিঠিটা লিখছি মিষ্টার উইনডিব্যাংককে, ওঁকে কাল সন্ধ্যা ছটায় দেখা করতে বলে। পুরুষ আত্মীয়দের সঙ্গে কাজের কথা বলাই ভালো। তাহলে ডাক্তার, যতোক্ষণ না এই চিঠি দুটোর উত্তর আসে, আমাদের ছোট্ট সমস্যাটা শেলকে তোলা থাক।

আমার বন্ধুর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও অসাধারণ কর্মশক্তিতে বিশ্বাস করার মতো এতো যুক্তি আমি অতীতে খুঁজে পেয়েছি, আমি এক্ষেত্রে ধরে নিলাম, সমস্যাটা ও যেরকম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ও সহজভাবে নিয়েছে। তার নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণ আছে। একবারই আমি ওকে ব্যর্থ হতে দেখেছি। বোহেমিয়ার রাজা ও আইরিন অ্যাড্‌লারের ফটোর কেসে, কিন্তু সাইন অফ ফোরের অদ্ভুত ব্যাপারটা এবং ষ্টাডি ইন স্কারলেট সংক্রান্ত অসাধারণ পরিস্থিতিগুলো যখন মনে আসে, আমার মনে হয়, ও ছাড়াতে পারবে না, এমন রহস্যের জাল সত্যিই জটিল। ও কালো মাটির পাইপ মুখে বসেছিল।

ওকে ছেড়ে যাবার সময় আমি নিশ্চিত হয়েই গেলাম যে কাল সে দেখবো, মিস মেরী মাদারল্যাণ্ডের নিরুদ্দেশ ভাবী স্বামীর সম্বন্ধে সব কিছু ক্লু ওর হাতে।

হাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ কেস ছিল, তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম,

পরের দিন সমস্ত সময় কাটলো রোগীর বিছানার ধারে। ছটা নাগাদ ছাড়া পেলাম ও হ্যানসমে চড়ে বেকার স্ট্রীটে এলাম। আমার ভয় লাগছিলো, হয়তো এই ছোট রহস্যটা সমাধানে সাহায্য করার পক্ষে আমি বেশী দেরীই করে ফেলেছি।

ওখানে পৌঁছে দেখি, হোমসের দীর্ঘ রোগা আধো ঘুমন্ত শরীর আর্মচেয়ারে হেলানো। বোতল ও টেষ্টটিউবের সারি এবং হাই-ড্রোক্লোরিব অ্যাসিডের তীক্ষ্ণ পরিচ্ছন্ন গন্ধ বলে দিচ্ছে, সারাদিন ও কেমিক্যাল টেষ্ট করে কাটিয়েছে।

—সমাধান খুঁজে পেলে ?

—হ্যাঁ। ওটা ব্যারিটার বাইসালফাইট।

—না, রহস্যের কথা বলছি।

—ও, সেইটা ? আমি তো যে সল্টটা টেষ্ট করছিলাম, সেটার কথাই ভাবছি। কালকের ব্যাপারটায় কোন রহস্যই নেই তবে কিছু কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার ইন্টারেষ্টিং। অসুবিধে হলো, এমন কোন আইন নেই, যাতে লোকটাকে শাস্তি দেওয়া যায়।

—লোকটা তাহলে কে ? কেনই বা মিস মাদারল্যাণ্ডকে ছেড়ে গেল ?

প্রশ্নটা আমার মুখ থেকে বেরিয়েছে মাত্র, হোমস এখনও জবাব দেবার জন্যে ঠোঁট খোলে নি, প্যাসেজে ভারী পায়ের শব্দ ও দরজায় করাঘাতের শব্দ শুনলাম।

—মিস সাদারল্যাণ্ডের সৎ বাবা মিস্টার জেমস উইনডিব্যাংক, হোমস জানালো আজ সন্ধ্যে ছটায় আসবেন বলে চিঠি লিখে জানিয়ে-ছেন। ভেতরে আসুন।

ভেতরে ঢুকলো শক্ত সমর্থ দোহারা চেহারার পুরুষ, বয়স তিরিশের কোটায়, গোঁফদাড়ি নিখুঁত কামানো, ফ্যাকাশে রং ভাব-লেশহীন, যেন কিছু একটা অভিযোগ করার ধান্দায় আছে, ধূসর

চোখ দুটো অদ্ভুত তীক্ষ্ণ ও গভীর। প্রশ্নবোধক চোখে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বাউ করে কাছের চেয়ারে বসে লোকটা।

—গুড ইভনিং, মিস্টার উইনডিব্যাংক, হোমস বলে।

—টাইপ করা চিঠিটা বোধ হয় আপনার, চিঠিতে আপনি সন্ধ্যে ছটায় আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন।

—হ্যাঁ, স্যার। আমার একটু দেরী হয়ে গেলো। অন্যের চাকরী করি, জানেনই তো। সামান্য ব্যাপারটার জন্যে মিস মাদারল্যাণ্ড আপনাকে কষ্ট দিয়েছেন বলে দুঃখিত। ব্যক্তিগত জীবনের নোংরা ব্যাপার বাইরের লোককে জানতে দেওয়া আমার পছন্দ নয়। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বে ও এখানে আসে। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, ও সহজে উত্তেজিত হয়, খুবই আবেগ প্রবণ ধরণের মেয়ে এবং কোন ব্যাপারে একবার মন স্থির করলে কিছুতেই সামলানো যায় না। অবশ্য ও আপনার কাছে এসেছে বলে আমি বিশেষ কিছু মনে করছিনা, কারণ আপনি তো সরকারী ভাবে পুলিশের লোক নন। তবে পরিবারিক কোন দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার লোক জানুক, এটা আমার মনঃপূত নয়। তাছাড়া অকারণে খরচাও হবে, কেননা কি ভাবে আপনি এই হোসমার এনজেলকে খুঁজে বার করবেন?

—মিস্টার হোসমার এনজেলকে আমি খুঁজে বার করতে পারবো, এরকম বিশ্বাস করার পক্ষে আমার যথেষ্ট কারণ আছে।

চমকে ওঠে মিস্টার উইনডিব্যাংক, ওর হাত থেকে দস্তানা দুটো পড়ে যায়।

শুনে আনন্দ পেলাম,

তিনি বললেন।

—একটা অদ্ভুত ব্যাপার হলো প্রত্যেক মানুষের হস্তাক্ষর যেমন আলাদা তেমনি প্রত্যেকটি টাইপরাইটারেরও কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। একেবারে নতুন নাহলে দুটো টাইপরাইটারে ঠিক একরকম লেখা

টাইপ হবে না। কতকগুলো অক্ষরের টাইপ অন্যান্যগুলোর থেকে বেশী ক্ষয়ে যাবে, কতকগুলো ক্ষয়ে আবার শুধু একদিকে যাবে। যেমন ধরুণ, মিস্টার উইনডিব্যাংক, আপনার এই চিঠিতে 'ই' অক্ষরটা একটু ঘসা এবং আর অক্ষরটার নীচের দিকটা খুব স্পষ্ট নয়। এ ছাড়াও চৌদ্দটা বৈশিষ্ট্য আছে, তবে এই দুটোই সবচেয়ে সহজে নজরে আসে।

—আমরা অফিসের চিঠিপত্র এই মেশিনে টাইপ করি । নিঃসন্দেহে মেশিনটা ব্যবহারে কিছুটা ক্ষয়ে গেছে।

আমাদের অতিথি ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখে হোমসের দিকে তাকিয়ে বলে।

—মিষ্টার উইনডিব্যাংক, এবার আমি আপনাকে একটা খুব ইন্টারেষ্টিং ব্যাপার দেখাবো। আমার মনে হয়, টাইপরাইটার ও ক্রাইমের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে আমার একটি ছোট প্রবন্ধ লেখা উচিত। এই বিষয়টা সম্বন্ধে আমার কিছুটা আগ্রহ আছে। নিরুদ্দেশে মিষ্টার হোসমার এঞ্জেলের চারটে চিঠি আমার কাছে আছে। টাইপ করা চিঠি। প্রত্যেকক্ষেত্রে শুধু যে ই' অক্ষরটা খাসা এবং আর অক্ষরটার নীচের দিকটা অস্পষ্ট, তাই নয়, আপনি যদি আমার ম্যাগনিফাইং লেন্স দিয়ে দিয়ে দেখেন, যে চৌদ্দটা বৈশিষ্ট্যের কথা একটু আগে বলেছি, তাদের প্রত্যেকটি আপনার নজরে আসবে।

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে হ্যাট নিতে যায় মিষ্টার উইনডিব্যাংক।

—মিষ্টার হোমস, এসব উদ্ভট কথাবার্তা শুনে নষ্ট করবার মতো সময় আমার নেই । যদি লোকটিকে ধরতে পারেন, ধরুন এবং তখন আমাকে খবর দেবেন।

এগিয়ে গিয়ে দরজায় চাবী এঁটে হোমস বলে, নিশ্চয়ই। আমি তাহলে আপনাকে জানাচ্ছি, আমি লোকটাকে ধরেছি।

—কি? কোথায়?

মিষ্টার উইনডিব্যাংকের ঠোঁটদুটো পর্যন্ত ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে,

যেন একটা ইঁদুর কলে ধরা পড়েছে।

—ওহ, কোন লাভ নেই, পালাবার কোন উপায় নেই, মিস্টার উইনডিব্যাংক। ব্যাপারটা এতো স্পষ্ট যে আমার পক্ষে এই সমস্যার সমাধান অসম্ভব বলে আপনি আমাকে অপমান করেছেন। এবার বসুন, খোলাখুলি কথা বলা যাক।

ভুরুরওপরে ঘামের ফোঁটা, আতঙ্কিত মুখে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে উইনডিব্যাংক।

এই ব্যাপারে.... .... কোন কিছু করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না।

—আমারও আশংকা, আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস্টার উইনডিব্যাংক। কাজটা নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। এবার ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছিল, আমি বলে যাচ্ছি। ভুল বললে আপনি সংশোধন করে দেবেন।

লোকটা মাথা নীচু করে চেয়ারে বসে থাকে। হোমস পকেটে হাত রেখে আনমনে বলতে থাকে, এই লোকটা টাকার জন্যে ওর থেকে অনেক বেশী বয়সের এক মহিলাকে বিয়ে করেছে। সৎ মেয়ে যতো-দিন এদের কাছে থাকবে, টাকাটা ওদেরই ভোগে আসবে। ওদের মতো অবস্থার লোকের পক্ষে টাকাটা অনেক এবং এই আয়টা বন্ধ হলে ওদের অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটবে। সুতরাং আয়টা যেন বন্ধ না হয়, তার চেষ্টা করে দেখা যাক। মেয়েটি ভালো, অমায়িক স্বভাবের, স্নেহশীলা, ওর নানা ব্যক্তিগত গুণ এবং নিজস্ব সামান্য আয়ের দরুন বেশীদিন আইবুড়ো থাকার কথা নয়। যদি মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায়, উইনডিব্যাংকের আয় বছরে একশো পাউণ্ড কমে যাবে। এটা কি করে বন্ধ করা যায়? মেয়েকে ঘরে রাখা যাক। সম বয়সী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ। কিন্তু কিছুদিন পরে উইনডিব্যাংক দেখলো, চিরদিন এভাবে চলবে না। মেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, নিজের অধিকার নিয়ে দাবী তুলছে এবং শেষ পর্যন্ত বলে বসলো, সে বলডান্সে যাবেই যাবে। তার চতুর সৎবাবা এবার কি করবে? যে আইডিয়াটা সে বার করলো, তার জন্যে তার বুদ্ধির

তারিফ করতে হয়, তবে হৃদয়ের নয়। স্ত্রীর সমর্থন ও সাহায্য নিয়ে সে ছদ্মবেশে সাজলো, ওই তীক্ষ্ণ চোখ দুটো রঙীন কাচের চশমায় ঢাকলো, মুখে গোঁফ ও জুলফি লাগালো. ওই স্পষ্ট কণ্ঠস্বরের বদলে ফিসফিস করে চাপা গলায় কথা বলতে লাগলো। মেয়েটির চোখের দৃষ্টি যেহেতু কম, সে নিরাপদেই মিস্টার হোসমার এনজেলের ভূমিকায় দেখা দিলো এবং অন্য প্রেমিকদের দূরে রাখার জন্যে নিজেই সৎ মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে লাগলো।

—প্রথমে ব্যাপারটা ঠাট্টাই ছিলো,
আমাদের অতিথি ভাঙা গলায় বলে,
মেয়ে যে এতো অভিভূত হয়ে যাবে, আমরা ভাবিনি।

—খুব সম্ভব তাই। যাই হোক, তরুণী নিঃসন্দেহে অভিভূত হয়ে পড়লো এবং তার সৎ বাবা যেহেতু ফ্রান্সে, বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ তার মনে কখনোই জাগে নি! ভদ্রলোকের প্রেমনিবেদনে সে খুশী হলো এবং তার মা ভদ্রলোকের সম্বন্ধে প্রশংসায় সোচ্চার হওয়ায় তার আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। তারপর মিস্টার এনজেল ওদের বাড়ীতে আসা যাওয়া শুরু করলো, কেননা সত্যিকারের ফলপ্রসূ হতে হলে প্ল্যানটা শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। দেখাশোনা এনগেজমেণ্ট, যাতে মেয়েটি অন্য কারো দিকে আকৃষ্ট না হয়। প্রবঞ্চনাটা চিরস্থায়ী হতে পারে না। ফ্রান্সে বার বার যাওয়ার ভান করাটা নানাভাবে অসুবিধাজনক, সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা এমন একটা নাটকীয় পরিণতিতে নিয়ে যেতে হবে যেন অন্ততঃ কিছুদিন তরুণী কোন সম্ভাব্য প্রেমিকের দিকে তাকাতেও না চায়। তাই বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করানো হল এবং অশুভ কিছু ঘটতে পারে বলে ইঙ্গিতে বলা হলো বিয়ের দিন সকালে। জেমস উইনডিব্যাংক চায়, মিস মাদারল্যাণ্ড যেন হোসমার এনজেলের প্রতি অনুরক্ত থাকে এবং এনজেলের পরিণতি সম্বন্ধে এমন অনিশ্চিত হয়ে থাকে যাতে আগামী অনেক বছর ধরে অন্য পুরুষের প্রেম নিবেদনে সে কান না দেয়।

গির্জার দরজা অবধি সে মেয়েটিকে নিয়ে এলো এবং যেহেতু আর বেশী যাবার তার উপায় নেই, ফোর হুইলারের এক দরজা দিয়ে ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পুরোনো কায়দায় সহজেই অদৃশ্য হয়ে গেল হোসমার এনজেল। মিষ্টার উইনডিব্যাংক ওরফে মিষ্টার এনজেল, ঘটনার ধারা এই রকম ভাবে ঘটেছিল বলেই আমার ধারণা।

কথা বলতে বলতে নিজের মর্যাদাবোধ যেন ফিরে পেল হোমস। তার আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। সে চেয়ার থেকে উঠে বিদ্রূপ ভরা চোখে তাকাল।

—আপনার কথার সত্যতা আমি স্বীকার করছি না। কিন্তু আপনি এটুকু বুঝতে পারছেন যে আইনটা আপনিই ভাঙছেন। আমি কোন অপরাধ করি নি আর আপনি দরজা বন্ধ করে বেআইনীভাবে আমাকে আটকে রেখেছেন।

রেগে গিয়ে বলে উইনডিব্যাংক।

চাবি দিয়ে দরজাটা খুলে দিল হোমস। বলল—তুমি ঠিকই জানো, আইন তোমাকে ধরবে না। কিন্তু তোমার চেয়ে শয়তান কেউ নেই। যদি মেরিয়ার কোন ভাই বা বন্ধু থাকতো সে তোমাকে চাবুক পেটাতো।

উইনডিব্যাংকের শক্ত মুখে তাচ্ছিল্য দেখে যেন ক্ষেপে গেল হোমস, বলল—এটা আমার দায়িত্ব, হাতের মুঠোর মধ্যে চাবুকটা আছে, আমি তোমাকে মেরে শেষ করবো।

তাড়াতাড়ি চাবুকটা তুলে নিল হোমস। কিন্তু ততক্ষণে পালিয়েছে উইনডিব্যাংক, সিঁড়িতে তার দ্রুত পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে ও দরজা খোলার আওয়াজ হতেই আমরা জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম যে ও প্রচণ্ড জোরে ছুটছে।

—শয়তান।

অস্ফুটে হোমস বলে।

তাকে এত রাগতে আগে কখনো দেখিনি।

—লোকটা একের পর এক অপরাধ করতে করতে শেষে খুনী হয়ে উঠবে।

হোমসের মন্তব্য।

—এবার কেসটার কথা শোনো।

.স বলে। আমি উৎসাহী হলাম।

—তোমার যুক্তিগুলো বুঝিয়ে বলোতো।

—ওয়াটসন, প্রথম থেকেই আমি জানতাম যে মিস্টার হোসমারের অদ্ভুত আচরণের অন্তরালে কোন কারণ আছে। এটাও ধরা গেল যে ঐ লুকোচুরি খেলাতে লাভ করেছে মিস্টার উইনডিব্যাংক। আর একটা ব্যাপার আমার চোখে আঙুল দিল, উইনডিব্যাংক আর এনজেলকে কখনো একই সময়ে দেখা যায়নি। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

তাছাড়া হোসমারের চেহারাটা একবার ভাবো। তার চোখে রঙীন চশমা, অদ্ভুত ফিসফিসে গলার শব্দ, আর চওড়া ঝুলপি। এ সবই ছদ্মবেশের অংশ।

আরও দেখো লোকটা চিঠি দিত টাইপ করে, এমন কি সইটাও করত না। তাছাড়া কোন ঠিকানা পর্যন্ত দেয়নি। তার থেকে মনে হতে পারে যে তার হাতের লেখা মেরিয়ার খুব চেনা। হাতের লেখা দেখলে মেরিয়া তাকে চিনে ফেলতে পারবে। তাই এত সাবধানতা তার।

—তুমি কি করে সিদ্ধান্ত নিলে?

প্রথম সন্দেহ থেকে সোজা সিদ্ধান্ত নিতে হল। উইনডিব্যাংকের ফার্মের নাম আমি জানি। আমি তার বিজ্ঞাপন থেকে ছদ্মবেশের অংশগুলো বাদ দিলাম। যেমন ঐ জুলফি, চোখের রঙীন চশমা গলার স্বর ইত্যাদি। বাকী বর্ণনাটুকু অবিকৃত রেখে অফিসে চিঠি দিলাম। জানতে চাইলাম যে ঐ চেহারার কেউ চাকরী

করে কিনা। যেমন ভেবেছিলাম তেমন উত্তর এল। ফেনচার্চ হাউসের ওয়েস্ট হাউস এতাবৎ মারব্যাংক জানাল যে ঐ রকম চেহারার লোকটির নাম জেমস উইনডিংব্যাংক। তারপর আমি টাইপরাইটারের চোদ্দটা সাদৃশ্য বের করলাম। এমনভাবে পুরো ঘটনাটি আমার জানা হল। মানুষ অর্থের জন্যে কত নীচ হতে পারে এ ঘটনা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

হোমস থামল।

—তুমি কি মিস মেরিয়া মাদারল্যাণ্ডকে সব জানাবে?

আমি উৎসাহী হয়ে প্রশ্ন তুলি।

--আমি বললে কি ও বিশ্বাস করবে? ওয়াটসন, তার চেয়ে নীরব থাকাই ভালো। মেরীয়া তার প্রিয়তমের প্রতীক্ষা করুক। তুমি তো ঐ পারসিক প্রবাদটা জানো, বাঘিনীর কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নেওয়া আর রমণীর মন থেকে কাল্পনিক বিশ্বাসকে তুলে নেওয়া একই ব্যাপার। বলেছিলেন কবি হাফিজ। কাজেই আমাদের নিস্তব্ধ থাকতে হবে।

এই বলে হোমস তার কথা শেষ করল।

আমি বাইরে তাকালাম। অনেক দিনের কুয়াশা যেন ভেঙে গেছে আজ।

বাইরে নামছে একটি মধুর রাত। বেকার স্ট্রীটের ঘরে বসে আমরা অনাগত কোন রহস্যের জন্যে উন্মুখ হয়ে বসে আছি।

## ।। এগারো ।।

শার্লক হোমসের বাড়ীর কর্ত্রী মিসেস হাডসনকে দেখে মনে হবে উনি যেন সারাজীবন দারুন বেদনা সহ্য করেছেন।

উনি শার্লক হোমসের বেহিসেবী জীবনযাপনের অনিয়মগুলো মুখ বুজে সহ্য করেন। তার যখন তখন সঙ্গীত চর্চা, ঘরের দরজাতে বুলেট ছোঁড়া অথবা বিরক্তিকর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তাকে লণ্ডন শহরের সবচেয়ে বিপদজনক ভাড়াটেতে পরিণত করেছে।

তবে ভাড়াদেবার ব্যাপারে হোমস দারুন সচেতন। আমি বাজী ফেলে বলতে পারি যে এমন নিয়মিত ভাড়া মিসেস হাডসন আর কারো কাছ থেকে পাবেন না।

ভদ্রমহিলা শার্লককে বেশ স্নেহের চোখে দেখতেন। তাই বোধ হয় তার সমস্ত খামখেয়ালকে ক্ষমা করে যেতেন।

আমার বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় বছরে হঠাৎ একদিন উনি আমার কাছে এলেন! আমার হতভাগ্য বন্ধুটির জীবন সঙ্কট নিয়ে কিছু বলবেন।

—ডাক্তার ওয়াটসন, ও মরতে বসেছে, তিনি বললেন গত তিন দিন ধরে দারুন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আজ সকালে আমি দেখলাম যে ওর চোখে বেদনার ছাপ। আপনি তাড়াতাড়ি চলুন, আমি জানি না। ওকে কি অবস্থায় দেখবো।

আমি দারুন ভয় পেলাম, কেননা আমি তার অসুস্থতার কোন সংবাদ পাইনি। আমি ছুটে গিয়ে আমার কোট আর টুপী পরে বের হলাম। চলতে চলতে পুরো কাহিনীতে মনোনিবেশ করলাম।

—আমি সামান্য কিছু বলতে পারবো। রোটারহিথের নদীর ধারে একটি কেস নিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসে গত বুধবার থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই ক'দিন কিছু খায়নি।

—হায় ভগবান। আপনি এখনো কোন ডাক্তারকে ডাকেন নি কেন?

—সে ডাকতে দিচ্ছে না। আপনি তো জানেন যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ সে করেনা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ও বোধহয় আর বাঁচবে না।

সত্যি অবস্থাটা তার শোচনীয়। নভেম্বরের বিবর্ণ কুয়াশাভরা ঐ দিনটিতে তাকে দেখলাম মৃত্যুর পাণ্ডুর রঙে ভরা। যেন এক ঝলক বরফ ঠাণ্ডা উত্তেজনা আমাকে ছুঁয়ে গেল। চোখে ভয়াবহ অসুস্থ-চিহ্ন, ঠোঁটে বেদনার তীব্র ছাপ। স্বর তার যেন ভাঙা আর ফ্যাস ফ্যাসে। আমাকে দেখে সে নড়তে পারল না, কিন্তু তার চোখে সাড়া দিল।

—ওয়াটসন, সত্যি বিপদের সামনে পড়েছি।

কাঁপা গলাতে হোমস বলে।

—প্রিয় বন্ধু!

আমি তার কাছে গিয়ে বলি।

—আঃ, সরে যাও, ওয়াটসন সরে যাও

চীৎকার করে হোমস বলে।

আমি অবাক হয়ে পিছিয়ে এলাম।

—আমাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করলে আমি তোমাকে ঘর থেকে বের করে দিতে বাধ্য হব।

—কিন্তু কেন হোমস?

—আমার ইচ্ছে। সেটাই তো যথেষ্ট।

মিসেস হাডসন ঠিকই বলেছিলেন। এমন দৃঢ় তাকে আগে কখনো দেখিনি।

—ওয়াটসন, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। আমার কুলীদের ভয়ঙ্কর রোগ হয়েছে। সুমাত্রা থেকে এটি এসেছে। দারুণ ছোঁয়াচে রোগ। শুধুমাত্র ছোঁয়া পেলে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে। তাই আমার একান্ত অনুরোধ যে আমার দেহ স্পর্শ করো না।

—হায় হোমস, তুমি কি ভাবছ যে এসব বলে আমাকে রুখতে পারবে?

আমি এগোবার চেষ্টা করি। ওর দেহে দৃঢ়তা ফুটেছে।

—হোমস!

আমি আর্তনাদ করে উঠি, তুমি আমাকে একটু দেখতে দাও। তুমি এখন অসুস্থ। তুমি না চাইলেও ডাক্তার হিসেবে আমার কর্তব্য হল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

—তাহলে শুনে রাখো যে ডাক্তার হিসেবে তোমার উপর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই আমার।

হোমসের কথার সত্যতা আমাকে বিদ্ধ করল।

—তাহলে আমি আর কাউকে ডেকে আনছি। স্যার জোসেফ মেক অথবা নেমরোস ফিপারকে খবর পাঠাই।

—ওয়াটসন, তুমি কি ভাবছো যে আমি কোনদিন সেরে উঠবো? তুমি কালো ফরমোসা রোগের নাম শুনেছো?

আমি মাথা নাড়ি।

—তুমি জানো না যে প্রাচ্য দেশে কতরকম বিদঘুটে অসুখ আছে।

—তাহলে আমি ঐ বিষয়ের সবচেয়ে ভালো ডাক্তার আইনস্ট্রিকে ডেকে আনছি।

আমি পা বাড়াই দরজার দিকে। সেই মুহূর্তে হোমস বাঘের মত ক্ষিপ্রতায় ছুটে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি মনে মনে দারুন আঘাত পেলাম।

—হোমস তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেলে?

—উঁহু, আমি তোমাকে সন্ধ্যে ছ'টার আগে যেতে দিতে পারছিনা বলে দুঃখিত। দুটো ঘণ্টা তুমি কি অপেক্ষা করবে ওয়াটসন?

—আমার কিছু বলার নেই হোমস।

আমি রাগত স্বরে বললাম।

চারদিকে তাকালাম, ছড়ানো আছে তার সব কিছু, অপরাধীদের ছবি, তামাকের পাইপ, সিরিঞ্জ, পেন কাটবার ছুরি আর কার্তুজ। একধারে রয়েছে তার প্রিয় ঐ হাতীর দাঁতের ছোট্ট বাক্সটি। আমি উঠে গিয়ে ওটাতে হাত দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে—

কে যেন তীব্র শব্দে চেঁচিয়ে ওঠে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম যে হোমস। তার চোখে কি ভয়াবহ দৃষ্টি।

—ওয়াটসন, ওটা রেখে দাও। এখুনি। তুমি তো জানো যে আমি আমার জিনিসে কারও হাত দেওয়া পছন্দ করি না।

হোমসের রাগ ও তার বাড়াবাড়ি আমাকে ব্যথিত করল। এত বছরে সে কোনদিন এমন ব্যবহার করেনি। আমি নিঃশব্দে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ বাদে সে হঠাৎ বলে—ওয়াটসন, তোমার পকেটে খুচরো আছে?

—হ্যাঁ।

—রুপোর টাকা?

—একটা হবে।

—হাফ ক্রাউন কতগুলো হবে?

—পাঁচটি।

—আহ, বড়ো কম! বড়ো কম! তুমি ওগুলোকে তোমার বড়ি পকেটে রেখে দাও। বাকী টাকা তোমার প্যান্টের বাঁ পকেটে রাখো। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

ওর আচরণে পাগলামীর ছাপ। সে কেঁদে ওঠে।

—ওয়াটসন তুমি এবার গ্যাস জ্বালাতে পারো। আর ১৩

নম্বর লোয়ার বারকে স্ট্রীট থেকে মিষ্টার স্মিথকে ডেকে আনতে পার।

—ঐ নামে কোন ডাক্তার লণ্ডনে আছে বলে আমার জানা নেই।

—ওয়াটসন, তুমি কি জানো যে ঐ ভদ্রলোক হলেন খামারের মালিক। উনি সুমাত্রা দ্বীপে বহু বছর কাটিয়ে বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে আছেন। ওনার বাগানে এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার মনে হয় যে এই রোগের ব্যাপারে ঐ ভদ্রলোকের চেয়ে জ্ঞানী আর কেউ নেই।

হোমসের কথার মধ্যে তার তীব্র যাতনার ছাপ পড়েছে কোনরকমে মুখ নাড়ছে সে, তবুও তার বক্তব্য থেকে দূরে সরছে না।

সে বলে—তুমি ওনাকে বল যে আমাকে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে এসেছো। ওয়াটসন, আমি কি ভুল বকছি?

—তুমি মিষ্টার স্মিথকে আনতে বলছো?

—ঠিক বলেছো। আসলে আমার জীবন এখন ঐ মানুষটির ওপরে নির্ভর করছে।

—আমি ওনাকে গাড়ীতে করে নিয়ে আসছি।

—না ওয়াটসন না, সে জানে যে আমাকে তুমি হয়তো আর দেখতে পাবে না। ওয়াটসন, আমার মনে হচ্ছে সব যেন অন্ধকার হয়ে আসছে।

অত বড় প্রতিভার এই পরিণতি দেখে দারুন মর্মাহত হলাম।

আমি ঐ অবস্থায় তাকে রেখে বাইরে আসি।

—হোমস কেমন আছেন স্যার?

ঘন কুয়াশার মধ্যে কে যেন বলে। আমি দেখলাম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর মরটন। সাধারণ টুইড তার পরণে।

—দারুন অসুস্থ।

আমি বললাম।

—আমি শুনেছি।

সে চলে গেল। আমি গাড়ীতে উঠে বসলাম।

নটিং হিল আর কেনসিংটনের মধ্যে সাজানো বাড়ীর সারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোয়ার বারকে স্ট্রীট। নির্দিষ্ট ঠিকানাতে পৌঁছে গেলাম।

—কারভারটন স্মিথ ভেতরে আছেন। আপনার কার্ড দেখি।

আমার সামান্য নাম ও পদবী হয়তো স্মিথকে খুশী করতে পারবে না। আধখোলা দরজার আড়াল থেকে ভাসা ভাসা সংলাপ শুনতে পেলাম।

—লোকটা কে? কি চায়? ষ্টেপলস, আমি তোমাকে কতবার বলেছি যে পড়বার সময় আমাকে বিরক্ত করবে না। ওকে বলে দাও যে আমি এখন বাড়ীতে নেই। সকালে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে। আমার কাজে কোন বাধা পড়ুক, আমি চাই না।

আমার মনে পড়ল যে হোমস বিছানাতে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। আমি ঘরে ঢুকে গেলাম।

আগুনের পাশ থেকে দুরন্ত রাগ নিয়ে একটি মানুষ উঠে দাঁড়ালো। আমি ঘন হলুদ মুখ দেখতে পেলাম, দৃঢ় চিবুক, দুটি রাগী চোখ আমার দিকে তাকালো। মাথার খুলিটা বিরাট, কিন্তু তার তুলনায় লোকটার চেহারা খুব বড়ো নয়। ঘাড়ের কাছে এমনভাবে বেঁকে আছে যে আমার বুঝতে কষ্ট হল না ঐ লোকটি শৈশবে রিকেটে ভুগেছে।

—এটা কি হল?

সে উচুস্বরে চীৎকার করে ওঠে।

—আমি দুঃখিত, কিন্তু ব্যাপারটাতে দেরী করা যাবে না। শার্লক হোমস—

—তুমি কি হোমসের কাছ থেকে আসছো?

—আমি এখুনি তার কাছে ছিলাম।

—হোমস কেমন আছে ?

—সে দারুন অসুস্থ।

লোকটি নিমেষে থেমে গেল। ম্যান্টলপীসের ওধারে বসানো আয়না দিয়ে আমি দেখতে পেলাম যে তার মুখে ব্যঙ্গ ভরা হাসির ছোঁয়া।

—ওটা শুনে আমি দুঃখিত, সে বলে, হোমসের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ব্যবসার ব্যাপারে। সে হল শখের গোয়েন্দা যেমন আমি শখের ডাক্তার। তার কারবার অপরাধীদের নিয়ে, আর আমি মেতে থাকি বীজানু নিয়ে। এখানে অনেক কারাগার আছে, টেবিলে বসানো এক সারি জারের দিকে আঙুল তুলে বলে, ঐ খানে সাজানো আছে পৃথিবীব জঘন্যতম খুনেদের জীবন।

—হোমস তোমাকে এখুনি যেতে বলেছে। সে একমাত্র তোমার ওপরে আস্থাশীল।

লোকটা যেন চমকে ওঠে, তার হাত থেকে পাইপটা পড়ে যায়।

—কেন ? হোমস কেন ভাবছে যে আমি তার অসুখ সারাতে পারবো ?

—কেননা ওর অসুখটা এসেছে প্রাচ্য দেশ থেকে।

—পূর্ব দেশ থেকে এসেছে এ ব্যাপারে সে কি নিশ্চিত ?

—অবশ্যই। কেননা আগে বেশ কিছুদিন চীনা নাবিকদের সংস্পর্শে থাকতে হয়েছিল।

মিষ্টার স্মিথকে ধীরভাবে পাইপ ধরাতে দেখা গেল।

—ও কতোদিন ধরে অসুস্থ ?

—প্রায় তিন দিন হবে।

—ভুল বকছে কি ?

—মাঝে মাঝে !

—ঠিক আছে। আমাকে যেতেই হবে। ডাক্তার ওয়াটসন,

আমি কিন্তু কোনদিনই আমার কাজ ফেলে কোথাও যাইনি। তবে এক্ষেত্রে ব্যাপারটা দারুণ দরকারী। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

হোমসের কথা মনে পড়ল আমার। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, আমার একটা কাজ আছে।

---আমি একাই যাবো। আমাকে ঠিকানাটা বল। আধঘণ্টার মধ্যে আমি পৌঁছোবই।

ভাঙা হৃদয় নিয়ে হোমসের শোবার ঘরে প্রবেশ করলাম। আমার মনে হয়েছিল যে আমার অবর্তমানে সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটা ঘটে গেছে। দেখলাম ঐ অবসরে যেন একটু ভালো হয়েছে সে। তার চেহারাতে রুক্ষতার ভাব থাকলেও এখন আর ভুল বকছে না।

স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে সে বলে—ওয়াটসন, ওর সঙ্গে দেখা হল?

—হ্যাঁ, সে আসছে।

—বাঃ, ওয়াটসন, দারুন করেছো।

—সে আমার সঙ্গে ফিরতে চায়।

—এটা কখনোই হতে পারে না ওয়াটসন। এটা অসম্ভব। সে কি জিজ্ঞাসা করেছে যে আমি কোথা থেকে বীজাণু এনেছি?

—আমি তাকে বলেছি যে তুমি কিছুদিন চীনা নাবিকদের সঙ্গে ছিলে?

—চমৎকার ওয়াটসন, চমৎকার। দোহাই তোমাকে, এবার তুমি দৃশ্য থেকে বিদায় নাও।

—আমি ওর মতামত শুনে যেতে চাই, হোমস!

—অবশ্যই। কিন্তু তার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবার কোন দরকার নেই। তুমি পেছনের ঘরে চলে যাও।

—হোমস!

—আর কোন উপায় নেই ওয়াটসন। তুমি সব কিছু শুনবে কিন্তু কোন কথা বলবে না। আর যাই ঘটুক না কেন তুমি নিজেকে প্রকাশ করবে না। এটা তুমি শপথ নিয়ে বল। যাও, ওর পায়ের শব্দ

শোনা যাচ্ছে।

আমি পেছনের ঘরে ঢুকে পড়ি। লোকটির পায়ের ধ্বনি শুনতে পেলাম। তারপরে হোমসের দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। অনেকটা সময় কেটে গেলে লোকটি বলে—হোমস! তুমি কি আমার কথা শুনতে পারবে?

—তুমি এসেছো মিস্টার স্মিথ? আমি ভাবতে পারি নি।

মৃদু হাসি শোনা গেল।

—আমি এসেছি হোমস। আগুনের কয়লা।

—আমি জানি, আমি তোমার জ্ঞানের ওপর আস্থা রাখি।

—তুমি কি রোগটাকে সনাক্ত করতে পেরেছো?

—হ্যাঁ, হোমস বলে।

—ঠিক আছে। মনে রেখো যে হতভাগ্য ভিকটর চতুর্থ দিনে মারা গিয়েছিল। সে ছিল তরুণ ছেলে। তুমি বুঝতে পারছো?

—আমি সব বুঝতে পেরেছি স্মিথ। আমাকে একটু জল দেবে? তারপর সে বলে,

অতীতটাকে ভুলে যাওয়াই ভালো। আমি প্রতিজ্ঞা ভাঙবো না। আমাকে সারিয়ে তোলো, আমি সব ভুলে যাবো।

—কি ভুলবে?

—ভিকটরের মৃত্যুর ঘটনাটা। তুমি তো বললে যে ওটা ভুমি করেছো। আমি ভুলে যেতে চাই।

—তুমি মনে রাখতে পারো বা ভুলে যেতে পারো। আমার কিছু যায় আসে না। তোমাকে আমি সাক্ষীর কাটগড়াতে তুলবো না। আমার ভাইপো কি ভাবে মারা গেছে সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। আমরা কি তার মৃত্যু নিয়ে কথা বলতে এসেছি?

—ঠিক আছে।

—তোমার যে লোকটি আমার কাছে এসেছিল, আমি নামটা ভুলে গেছি, সে বলল যে তুমি প্রাচ্য দেশের অসুখ সঙ্গে এনেছো।

তুমি নাকি চীনা নাবিকদের সঙ্গে মিশেছিলে ?

—হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে।

—হোমস, নিজেকে বড় চতুর মনে করো, তাই না ? তুমি কি জানো যে তোমার চেয়েও চালাক কেউ আছে ?

—হতে পারে, তবু বলছি, আমাকে সাহায্য করো।

—হ্যাঁ, তোমার পাশে আমি দাঁড়াবো। কুলীদের ঐ রোগ বড় সাংঘাতিক। রোগটা ধরবার মুখে অস্বাভাবিক কোন ঘটনা কি ঘটেছিল ?

—না, কিছুই না।

—ভালো করে ভেবে বলো।

—আমি চিন্তা করতে পারছি না।

—তোমাকে মনে করাই। পোষ্টে কিছু পেয়েছিলে ?

—পোষ্টে ?

—একটি বাক্স ?

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে আমার।

—হোমস, শোনো।

তার কণ্ঠস্বরে মৃতার্ত মানুষকে সাহায্য দানের নীরব প্রতিশ্রুতি। গোপন গহ্বর থেকে আমি শুনতে পেলাম।

—তুমি কি একটা হাতীর দাঁতের বাক্স পেয়েছিলে ? বুধবার ওটা এসেছিল। তুমি খুলেছিলে ? মনে পড়ছে ?

—হাাঁ, আমি খুলেছিলাম। ওর মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ স্প্রিং ছিল। একটু তামাসা বোধহয়—

—না, কোন মজা নয়। তুমি বোকা তোমার হাতেই তুলে দিলাম বিষ। অবশ্য যদি তুমি আমার পথে এসে না দাঁড়াতে তাহলে তোমাকে আঘাত দেবার কোন ইচ্ছে ছিল না আমার।

—আমার মনে আছে, হোমস বলে, ঐ স্প্রীং এ ছিল রক্ত। বাক্সটা টেবিলে আছে।

—ওটা আমার পকেটে পুরে নিয়ে যেতে চাই। কোন চিহ্ন আমি রাখবো না। মৃত্যুর আগে তুমি জেনে যাও যে আমি তোমাকে হত্যা করেছি। ভিক্টরের ভাগ্য সম্পর্কে বড়ো বেশী জেনে ফেলেছিলে, এখন তার দুর্ভাগ্যকে মেনে নাও। তোমার শেষ মুহূর্তের আর দেরী নেই হোমস। ভয় নেই, আমি এখানে বসে তোমাকে মরতে দেখবো।

হোমসের শব্দ যেন দুর্বোধ্য ফিসফিসানিতে পরিণত হয়েছে।

—ওটা কি? স্মিথ বলে—গ্যাসটা জ্বলছে কেন? ছায়া পড়েছে। আমি শিখাটাকে বাড়িয়ে দিই।

ঘরটা পার হয়ে সে আলোটাকে উজ্জ্বল করে দিল, বলল, তোমার আর একটু সেবা করতে পারি?

—একটি দেশলাই আর একটা সিগারেট।

হোমসকে তার স্বভাবসিদ্ধ গলাতে বলতে শুনে আমি আনন্দে অধীর হয়ে যাই, এক মুহূর্ত আগে শোনা ঐ ভাঙা গলার হাহাকার নয়, এ যেন হোমসের চিরচেনা শব্দ।

আমি বুঝতে পারছি যে স্মিথ বেশ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

—তোমার কথার মানে কি? এটা কি করে সম্ভব?

—বলতে পারো নিখুঁত অভিনয়। গত তিন দিনে আমি কিছুই খাই নি বা পান করি নি। তবে তামাক টেনেছি প্রচুর। কে যেন ঘরে ঢুকছে, তাই না?

দেশলাই ধরাবার শব্দ শুনতে পেলাম।

ইনস্পেক্টর মরটনকে ঢুকতে দেখা গেল।

—ইন্সপেক্টর, এই হল অপরাধী।

—ভিকটরকে হত্যা করবার জন্যে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।

ইন্সপেক্টর বলে।

—এবং শার্লক হোমসকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে হত্যা করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, হোমস বলে, খুঁজলে কোটের পকেটে একটা

হাতীর দাঁতের বাক্স পাবে। ওটাই হবে অপরাধ প্রমাণের প্রধান অস্ত্র।

হোমসের কথা শেষ হতে না হতেই একটা আর্তনাদ শোনা গেল, তার আগে কি যেন ঝলসে ওঠে॥

—তুমি মিছিমিছি নিজেকে আহত করছো স্মিথ। স্থিরভাবে দাঁড়াও

হোমস গম্ভীর ভাবে বলে। তারপর আমার নাম ধরে ডাকল।

আমি লুকোনো ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ইন্সপেক্টর মরটন স্মিথকে নিয়ে চলে গেছে।

—আমি খুব দুঃখিত ওয়াটসন, তোমার কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছি। তোমার জন্যেই বেচারী ভিকটরের হত্যা রহস্য জানা গেল।

—কিন্তু তোমার ঐ অসুখটা কি একেবারে বানানো?

—সেটা কি বলে দিতে হবে?

—তোমার চেহারাতে আমি যে বিবর্ণতা দেখেছি সেটা?

—ওয়াটসন, তিন দিনের উপবাস মানুষকে দুর্বল করে। তাছাড়া আমার কপালে ছিল ভ্যাসলিন, এক চোখে ব্যালাডোনা, ঠোঁটে ছিল মোমের গুঁড়ো। সব মিলিয়ে অসুস্থতা ঢেকে রেখেছে। তাছাড়া আমার ভুল বকাগুলো একেবারে বানানো।

—কিন্তু আমাকে তুমি কাছে আসতে দাও নি কেন?

—ওয়াটসন, তোমার ডাক্তারী বিদ্যাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমার কাছে এলে তুমি কি চালবাজীটা ধরে ফেলতে পারতে না? তাপমাত্রা বাড়েনি, হৃদস্পন্দন ঠিক আছে, তবুও আমি অসুস্থ, এটা কি তুমি মেনে নিতে? আর আমার আসল অবস্থাটা জেনে নিলে তুমি স্মিথকে ওভাবে ডেকে আনতে কি?

হোমসের চাতুরীতে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

—কিন্তু ঐ বাক্সটা?

ওটা আমার হাতে পড়ে নি। আমার সব কিছুই আমি আগে পরীক্ষা করে নিই। তুমি তো জানো ওয়াটসন, গত ক'বছর ধরে সাবধানী হয়েছি। যাই, মিসেস হাডসনকে বলে আসি, উনি চিন্তা করছেন।

হোমস বেরিয়ে গেল। আমি বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

## ॥ বারো ॥

একদিন হোমস হঠাৎ আমাকে তার একটা পুরোনো গল্প বলতে শুরু করে। সময়টা হল শেষ মার্চের এক ঝোড়ো সন্ধ্যা। শীত যাই যাই করছে। হোমস বলে---

তোমাকে নতুন গল্প শোনাই। যে কেসটা আমার কাছে লেখা আছে এক শিল্পীর খাম খেয়ালী হিসেবে। তবে যদি কাল সকালে তোমার কোন কাজ না থাকে তুমি আমার সঙ্গে এক জায়গায় বেড়াতে যেতে পার। জায়গাটা হল সারের উ-এলবিতে!

এমনভাবে সেদিনের কথা শেষ হয়। পরের দিন আমরা পৌছে গেলাম উ-এলবির ম্যাক গ্রোভারের জমিদারীতে। একটি সুন্দর সাজানো বাগানের মধ্যে বাড়ীটি।

—ওয়াটসন, তুমি মাটির তলার মদের ভাড়ারটি পরীক্ষা কর। আমি ঘরগুলো দেখে আসি। তবে মনে হচ্ছে এখন এখানে কেউ নেই।

তার কথামত আমি প্রাসাদের নীচে নেমে এসে বিরাট গ্যালারীতে দাঁড়ালাম। ওখানে রয়েছে অসংখ্য মদের বোতল।

হঠাৎ আমার কানে ভেসে এল হোমসের চীৎকার, ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তেজনার ছাপ!

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওপরে দৌড় দিলাম। হল ঘরটি পেরিয়ে,

একটা শক্ত ছড়ি হাতে নিয়ে, আমি হোমসের কাছে পৌঁছে যাই। তাকে একা চিন্তিত মনে পায়চারি করতে দেখলাম।

—ওয়াটসন। এই কাজগুলো সম্পর্কে তোমার কি মত?

হোমস তার দীর্ঘ বাহু তুলে ঘরের চার দিকে ইঙ্গিত করল।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কেননা ঘরের মধ্যে সাজানো আছে ম্যাক গ্রোভারের বিমূর্ত শিল্প সংগ্রহ।

—অপরাধ! চেঁচিয়ে উঠল সে, উত্তেজনায় তার আঙুল কাঁপছে, ভ্যাণ্ডালিজম!

—তার মানে?

—তার মানে, সুন্দর শিল্প নষ্ট করা। ওয়াটসন, এক সময়ে কিছু লোক সমস্ত বই আর শিল্প নষ্ট করেছিল, তাদের বলা হত ভ্যাণ্ডাল। কিন্তু আমি ভাবতে পারছি না যে এত বেরসিক কে হতে পারে!

এবার আমি তার কথার মানে বুঝতে পারি। তাকিয়ে দেখলাম প্রতিটি ক্যানভাসকে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।

—হোমস! আমি কোনমতে বলি, তুমি এখন কি করতে চাও?

—কি করতে চাই? হোমস বলে, বর্বর লোকটাকে আমি পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেবই।

এক মুহূর্ত বাদে হোমসকে দেখা গেল একমনে পরীক্ষা করতে। ওরিয়েন্টাল কার্পেটের ওপর সে ঝুঁকে বসে আছে। তারপর ছুটে গেল জানলার দিকে, খিলখোলা দেখে হতাশ হল সে।

—ওয়াটসন, তুমি এখন নীচে যাও, আমাকে বেশ কিছুক্ষণ এখানে থাকতে হবে।

একঘণ্টা বাদে আমি ফিরে এসে দেখি যে হোমস একটা ইজি চেয়ারে বসে গভীর ভাবে চিন্তা করছে।

—ওয়াটসন, লোকটার চেহারা আমার চোখে ধরা পড়েছে, ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে হোমস বলে, এই অপরাধীর উচ্চতা সাধারণ।

সে জন্মেছে স্পেনে, ল্যাটিনে কথা বলে, তার শারীরিক গঠন খুব ভালো, এছাড়া আমি জোর গলায় বলতে পারি যে আর মাথায় একটুও চুল নেই।

—হোমস, তোমার কথায় আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। তুমি কি ঠাট্টা করছ?

—না ওয়াটসন, একটু পরে তুমি সব জানতে পারবে। এই বলে সে উঠে গিয়ে ক্যানভাসগুলোর সামনে অস্থির ভাবে পায়চারী করতে লাগল। আচরণের মধ্যে অসাধারণ মনঃ সংযোগের পরিচয় রয়েছে। হঠাৎ সে বলে, এখানে আমাদের আর কিছু করার নেই। আমরা বেকার স্ট্রীটে ফিরতে পারি।

ফেরবার পথে সারা রাস্তা হোমস কোন কথা বলেনি। অফিসে ফিরে এসে সে মন্তব্য করে, শুধু একটি তথ্য আমার চাই। লোকটি ন্যাটা নাকি তার ডান হাত চলে?

—কিন্তু হোমস, এটা কি করে জানবে?

—জানতে পারবো তাকে পুরোপুরি নকল করে। একটা পুরোনো ক্যানভাস খুঁজে আনতে হবে।

আমি একটুকরো পুরোনো তেরপল বার করে ফেললাম। এখন রং দরকার।

—আসল তেল রংয়ের কোন দরকার নেই। তুমি যদি মিসেস এসেক্স এর কাছ থেকে কাপবোর্ডটা নিয়ে আসতে পার তা হলেই হবে।

আমি কিছু টমাটো সস; এক বোতল মাষ্টার্ড, কিছু কাপড়ে দেবার নীল, ডিমের সাদা অংশ, চাটনি ও সস নিয়ে এলাম।

—চমৎকার, হোমস বলে, এবারে আমি আমার ডানহাত দিয়ে ক্যানভাসের ওপরে নিষ্ঠুরভাবে রং করব। তারপর বাঁ হাতে একই কাজ করব। দুটো ফলাফল দেখে নিশ্চয়ই কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে।

হোমস নানা প্রান্ত থেকে ক্যানভাসটি আক্রমণ করল। প্রথমে ডানহাতে তারপর বাঁ হাতে। হাতদুটো ড্রেসিংগাউনে মুছে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার সৃষ্টির দিকে।

—লোকটা খ্যাটা নয়। তবে আমার মনে হয় তুমি কৃষ্টির গ্যালারীতে গিয়ে মিস্টার ব্রেইজিসের মতামত নিয়ে এস।

আমি বেড়িয়ে গেলাম। হোমস তখন নিবিষ্ট মনে বই পড়ছিল কিছুবাদে গ্যালারী থেকে ফিরে জানালাম—মিস্টার ব্রেইজিস বাইরে গেছেন। আমি ক্যানভাসটা বাইরে রেখে এসেছি।

ঠিক আছে, হোমস বলে, তারপর সে নিজেকে ডুবিয়ে দেয় বইয়ের মধ্যে।

যখন আমি শুভরাত বলে বাইরে এলাম তখনও সে বই নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

পরদিন সকালে দুঃখ ভরা মনে এলাম। প্রাতঃরাশের টেবিলে বসে থাকা হোমসের হাসি আমাকে অনেক আনন্দ দিল।

—কি? এখনো রেগে আছ নাকি? এস ম্যাকগ্রোভারের জমিদারীর দিকে যেতে যেতে এই দারুণ কেসটা তোমাকে শোনাবো।

—কিন্তু হোমস, অপরাধীকে ধরাই কি উচিত নয়?

হোমসের মুখে ঘনিয়ে আসে মেঘ, সে বলে, অনেক দেরী হয়ে গেছে। সে আমাদের আইনের বাইরে চলে গেছে। তবে জোর গলাতে আমি বলতে পারি যে সে আর একটিও ছবি নষ্ট করতে পারবে না।

আমাদের গাড়ী ছুটেছে গ্রেট নর্থরোর্ড ধরে। তোমার মনে আছে ওয়াটসন, লোকটার সম্পর্কে আমি কয়েকটা মন্তব্য করেছিলাম, তুমি খুব অবাক হয়েছিলে, এবারে আমি সব বলছি। লোকটা ছিল অ্যাথলেট, কেননা সে ব্রাস বা ছুরি ব্যবহার করে নি, দূর থেকে রংগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। চিত্রকলার ভাষার যাকে বলা হয় ওভার টস বা স্লপ, তার কোন চিন্তা নেই। এ থেকে আমি তার উচ্চতা বার করি।

যে মনোভাব অক্ষম মানুষের মনের জ্বালা মেটাতে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, সেই মনোভাব আসে ল্যাটিন থেকে। তার রঙের নির্বাচন বলেছিল সে স্পেন দেশের লোক। কেননা তার ব্যবহৃত রঙে লাল ও কমলা রঙের আধিক্য।

—কিন্তু হোমস অপরাধী তো সাধারণ লোক হতে পারে?

হোমস মাথা নাড়ে, বলে, না তা নয়। সাধারণ ভ্যাণ্ডালরা শুধু নষ্ট করে, গড়তে পারে না।

আমি তার যুক্তির কাছে হেরে গেলাম। হোমস বলে, তার প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে তার রঙকরার মধ্যে। অল্প সময়েব মধ্যে এতগুলো পেনটিংকে যে রং করতে পারে তার শক্তি কতখানি তা সহজেই অনুমেয়।

—বন্ধু হোমস, কি ভাবে তুমি জানলে যে লোকটির মাথায় চুল নেই।

—খুবই সাধারণ বন্ধু। এই অবস্থায় তার মত মানুষ রাগে দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়ে ফেলত, কিন্তু অনেক খুঁজেও আমি ওরিয়েন্টাল কার্পেটে একটুকরো চুল দেখতে পাইনি। এই সব দেখে আমি জানতে পেরেছি যে লোকটি একজন ব্যর্থ চিত্রকর। তার নাম মাদ্রো দিজনী। সে এখন রোমে চলে গেছে।

—কিন্তু হোমস, তোমার প্রমাণগুলো সবই তাৎক্ষনিক নয় কি?

—এস ওয়াটসন, আমরা গ্যালারী থেকে শুরু করি।

গ্যালারীতে গিয়ে আমরা নীল ও গোলাপী ডট দেওয়া ক্যানভাসটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

—ওয়াটসন এই ক্যানভাস হল আমার শেষ প্রমান।

—তার মানে?

ওয়াটসন, এই ডটগুলো দেখ। তারপর এই বইটা পড়।

আমি বইটা পড়লাম, লেখা আছে, শিল্পী মাদ্রো দিজনীকে তার নীল আর গোলাপী ডটের সাহায্যে তাড়াতাড়ি সনাক্ত করা যায়।

পরদিন সকালে প্রাতঃ রাশের টেবিলে আমাদের দেখা হল।

হোমস বলে—দেখছ ওয়াটসন, মিস্টার ব্রিইঞ্জিস তিনশো গিনি দিচ্ছেন ঐ ক্যানভাসটার জন্যে। এ থেকে তুমি বুঝতে পারবে যে শিল্পী হিসেবে আমার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। কিন্তু আমি তো শিল্পী হতে চাই না।

এই বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে হোমস।

এই হল শার্লক হোমস। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। যাকে আমি দেখেছি রহস্যের পর রহস্য আবরণ ছিঁড়ে ফেলতে। যে কোন কঠিন সমস্যাকে সে আপন চাতুরীতে সমাধান করে।

শার্লক হোমস সম্রাট তার অন্বেষণে, তার কোন তুলনা নেই।

---